## চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানব মুক্তির ধর্ম

মহর্ষি মহামানস

# মানবধর্মই মহাধর্ম

মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম~ মানবধর্মের পথ ধরে মন-বিকাশমূলক শিক্ষাসহ আত্মবিকাশ যোগ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি অর্জনের একমাত্র পথ বা ধর্মই হলো মহাধর্ম। বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপ হলো মহাধর্ম।

## মুখপত্র

চতুর্দিকে মানবকেন্দ্রিক যত অশান্তি, যত সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশ ভয়ানক রূপ ধারণ করতে চলেছে, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ হলো— জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। আর, এর একমাত্র সমাধান হলো— সার্বিকভাবে সঠিক মনোবিকাশ শিক্ষার অনুশীলন।

অন্যায়-অপরাধ মুক্ত~ শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত~ সুন্দর পৃথিবী গোড়ে তুলতে চাইলে, সবার আগে স্কুল-কলেজ এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে দিকে দিকে~ মানুষ গড়ার কর্মশালা গড়ে তুলতে হবে। মানুষ গড়ার কর্মশালা হলো মনোবিকাশের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

একমাত্র, সার্বিকভাবে মনোবিকাশের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানব বিকাশ সম্ভব হবে। আর, প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে তবেই মানুষের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হবে। সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানবজাতির অধিকাংশ সমস্যার মূল কারণ হলো~ যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব, এবং তজ্জন্য মিথ্যা অহংকার ও অন্ধবিশ্বাস। তলিয়ে ভাবার ও বোঝার অক্ষমতা। সেইসঙ্গে রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে অনীহা।

হাজার হাজার বছর ধরে আরোপিত ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেই শিখিয়েছে, খোলা মনে~ যুক্তিপথ ধোরে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন কোরতে শেখায় নি।

এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো~ বিজ্ঞান ভিত্তিক মনোবিকাশ শিক্ষার প্রবর্তন। আর সেই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘকালের গবেষণা ও প্রচেষ্টায় প্রস্তুত হয়েছে~ মহামনন~ নামে সঠিক মনোবিকাশের এক অতুলনীয়~ অত্যাবশ্যক শিক্ষাক্রম। নতুন ও আগামী প্রজন্মের শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত গোড়ে তুলতে~ চতুর্দিকে মহামনন কেন্দ্র গড়ে তুলুন।

এই ধর্মের প্রচলিত নাম বা ডাকনাম 'মহাধর্ম' হলেও এর সম্পূর্ণ নাম হলো~ মহামানস ধর্ম।

## ভূমিকা

যুগসন্ধিক্ষণের এই চরম সঙ্কটকালে, প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে একালের মহান দার্শনিক, বহুমুখি প্রতিভাবান ও প্রজ্ঞাবান ঋষি বিজ্ঞানী~ মহর্ষি মহামানস ~ সমগ্র মানবজাতিকে দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে এক মহা আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন।

যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক এবং মানবকল্যাণে আত্মনিয়োজিত~ মহর্ষি মহামানস -- সারা পৃথিবীব্যাপী মানবকেন্দ্রীক অশান্তি হানাহানি রক্তপাত ও দারিদ্র্যসহ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে, 'মহামনন' নামে আত্মবিকাশ যোগের পথে প্রকৃত মানব মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতেই 'মহাধর্ম' নামে মনোবিকাশ তথা মানব বিকাশমূলক একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সুনিশ্চিত পথ ও পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে মানবজীবনে আমূল শুভ পরিবর্তন আসবে বলে তিনি দাবি করেন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাঁর এই মানববিকাশ মূলক কার্যক্রম এবং তাঁর মানব মুক্তির মহান মতবাদ ক্রমশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এবং বহু মানুষ ক্রমশ তার ভক্ত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আত্মবিকাশ লাভের জন্য 'মহাধর্ম' গ্রহণ করে 'মহামনন' আত্মবিকাশ যোগ যোগ অনুশীলন করতে শুরু করেছেন।

মহর্ষি মহামানসের মানব মুক্তির বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ' এর মূল কথা হলো:

সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা~ অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির মূল কারণ হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব, আর মানসিক অসুস্থতা। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-সন্ত্রাস, সবই তার থেকেই জন্ম নিয়েছে। এর একমাত্র সমাধান হলো— সার্বিকভাবে আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও অনুশীলন।

মহর্ষি বলেন, একমাত্র সঠিক আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস সত্যিকারের মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে 'মহামনন' নামে বিশেষ আত্ম-ধ্যান প্রশিক্ষণ সহ অপরিহার্য মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা অর্থাৎ যথেষ্ট বিকশিত মানুষ তৈরির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন! এবং সেইসঙ্গে তিনি 'মানবধর্মই মহাধর্ম' নামে মানব বিকাশ মূলক এক আধ্যাত্মিক নবজাগরণের সূচনা করেছেন। যা আত্মপ্রকাশ করেছে এই বাংলার মাটিতেই।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি সর্বত্র একালের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ'-এর 'মহামনন' নামক আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান হবে।

প্রথমে তিনি এই বাংলাতেই
আত্মবিকাশ মূলক শিক্ষা ও আত্ম-ধ্যান প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশ্বমানের যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে অভিলাষী হয়েছেন। মানব বিকাশের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে মহর্ষি সকল সচেতন মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সেই সঙ্গে তিনি সরকারের কাছেও আবেদন রাখছেন, আগামী প্রজন্মকে আগামী দিনের ভয়ানক কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে, তাদেরকে সুস্থ, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ, যথেষ্ট বিকশিত মানুষ করে তুলতে সরকার যেন প্রতিটি স্কুলে তাঁর এই মনোবিকাশ মূলক শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন।

মহর্ষি তাঁর অল্প বয়সেই, সত্যের সন্ধানে সারা দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, এতো সমস্যার মূল কারণ হলো তাদের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর থেকে মুক্তি দিতে পারলেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান হবে। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে একটি চমৎকার মানববিকাশের শিক্ষা প্রণালী গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয়--- 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম। এর পরেই তিনি হিমালয় থেকে নেমে এসে যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক এবং নিজস্ব মতবাদ-- 'মহাবাদ' ভিত্তিক মানববিকাশের শিক্ষা দান শুরু করে দেন।

মন-বিকাশের মধ্য দিয়ে মানববিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে তিনি বেশকিছু গ্রন্থ লিখেছেন। অ্যামাজন সহ অন্যান্য ওয়েবসাইটে তার গ্রন্থ পাওয়া যাবে। ইন্টারনেটে সার্চ করলে, মানববিকাশের উপর তার বহু রচনা, পডকাস্ট এবং ভিডিও পাওয়া যাবে। ২০২১ তে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স জার্নালে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তার গবেষণা ও আবিষ্কার প্রকাশিত হয়েছে।
এছাড়া তিনি প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষকে 'মহামনন ধ্যান' প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন।

সুমেরু রে ওরফে মহর্ষি মহামানস এর নিকট মনবিকাশের শিক্ষা গ্রহণ ও ধ্যান এর প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ উপকৃত হয়ে চলেছে। তারা ক্রমশ সুস্থ ও শান্তি পূর্ণ, এবং জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। মানুষ তাদের শরীর ও মন সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যবিধি, জলবায়ু, সমাজ ও সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। মানবিক হয়ে উঠেছে। মানব কেন্দ্রীক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছে তারা।

মহর্ষি মহামানস প্রচারের আলো থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকে, একান্তে একনিষ্ঠভাবে মানব বিকাশের জন্য কাজ করে চলেছেন। ক্রমশই তার ছাত্র ও শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমশ বেশ কিছু মিডিয়া তার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে তিনি ছাত্রদের লেখাপড়া এবং তাদের বিকাশের জন্য স্টাডি-স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। এছাড়াও তিনি সাইকোথেরাপী ও হিপ্নোথেরাপীর মাধ্যমে মনোরোগের সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি শেখাচ্ছেন।

একমাত্র মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্বশান্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। 'মহাবাদ' নামে একালের এই মহান মতবাদের প্রবক্তা মহর্ষি মহামানস বলেন, যথেষ্ট মনোবিকাশের অভাবেই সারা দেশ তথা পৃথিবী জুড়ে এত অশান্তি, সমস্যা ও সঙ্কট, এত খুনোখুনি ও রক্তপাত ঘটে চলেছে।

মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, একমাত্র তখনই অধিকাংশ মানবকেন্দ্রিক সমস্যা ও সংকটের সমাধান সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি হিমালয়ে দীর্ঘকালের সাধনা, গবেষণা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'মহামনন আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম' নামে একটি মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এবং সেইসঙ্গে তিনি একটি বিশ্বমানের মনোবিকাশ সহ ধ্যান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। একালের মহা প্রজ্ঞাবান ঋষি মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ মহর্ষি মহামানস এই বাংলাতেই 'মহামনন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত জমি-বাড়ি, অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য পাওয়ার জন্য মহৎ হৃদয়ের দাতার অনুসন্ধান করছেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে অন্যায়, অপরাধ, নিপীড়ন, ধর্মে ধর্মে হানাহানি, অন্ধবিশ্বাস সহ নানা অপসংস্কৃতি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এর থেকে মুক্তি পেতে এবং প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, আধ্যাত্মিক বিপ্লবই একমাত্র পথ। মানববিকাশ একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে যদি সর্বত্র সঠিক মন-বিকাশমূলক শিক্ষা চালু করা যায়। তাই স্কুলস্তর  থেকেই এই শিক্ষা চালু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সচেতন মনের বিকাশ এবং অবচেতন মনের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের উপযোগী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মানববিকাশ ঘটাতে হবে। মানুষের অধিকাংশ সমস্যা~ দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হওয়ার এটাই একমাত্র পথ। এই পথেই অধিকাংশ মানবকেন্দ্রিক সমস্যা ও সংকটের সমাধান সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি  দীর্ঘকালের সাধনা, গবেষণা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'মহামনন আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম' নামে একটি মন-বিকাশমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এবং সেইসঙ্গে তিনি একটি বিশ্বমানের মনোবিকাশ সহ ধ্যান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। একালের মহা প্রজ্ঞাবান ঋষি মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ, এবং বহুমুখী প্রতিভাবান শিবকল্প মহাজ্ঞানী~ মহর্ষি মহামানস 'মহামনন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত জমি-বাড়ি, অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য পাওয়ার জন্য মহৎ হৃদয়ের দাতার অনুসন্ধান করছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে অন্যায়, অপরাধ, নিপীড়ন, ধর্মে ধর্মে হানাহানি, অন্ধবিশ্বাস সহ নানা অপসংস্কৃতি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এর থেকে মুক্তি পেতে এবং প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বিপ্লবই একমাত্র পথ। মানববিকাশ একমাত্র তখনই অর্জিত হবে যখন সর্বত্র সঠিক মনো বিকাশমূলক শিক্ষা চালু করা হবে। তাই স্কুলস্তর  থেকেই এই শিক্ষা চালু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষ আজ মর্মান্তিক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। এই রকম কঠিন পরিস্থিতি থেকে মানুষকে মুক্তির পথ  দেখিয়েছেন মহর্ষি মহামানস।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে~ যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক  মনোবিকাশের পথ ধরে মানব মুক্তির পথপ্রদর্শক~  মহর্ষি মহামানস-কে আজ আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে। তিনি কোনো সন্ন্যাসী বা সাধুবাবা নন। তিনি একালের একজন জ্ঞান-তপস্বী আধ্যাত্মিক নেতা, একজন মহান ঋষি। তিনি বহুগুণাধার প্রজ্ঞাবান পুরুষ। তাঁর কাছ থেকে আমাদের জানার শেষ নেই। আজকে আমরা তাঁর দর্শন ও কর্মধারা সম্পর্কে কিছু জানবো।

সূচনা

যুগসন্ধিক্ষণের এই চরম সঙ্কটকালে, এই বাংলার মাটিতে মহর্ষি মহামানসের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ' -এর ভিত্তিতে 'মহাধর্ম' নামে একটি নতুন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে। যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক~ মহর্ষি মহামানস একালের একজন মহান ভারতীয় ঋষি এই ধর্মের প্রবর্তক। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাঁর এই মানববিকাশ মূলক ধর্ম এবং তাঁর মানব মুক্তির মহান মতবাদ ক্রমশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

মহর্ষি মহামানস বলেন, চতুর্দিকে মানবকেন্দ্রিক যত অশান্তি, যত সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশ ভয়ানক রূপ ধারণ করতে চলেছে, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ হলো— মানুষের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং তজ্জনিত অন্ধবিশ্বাস। আর সেইসঙ্গে রয়েছে শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর একমাত্র সমাধান হলো— সার্বিকভাবে মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও অনুশীলন ভিত্তিক মানবধর্ম~ মহাধর্ম -এর অনুশীলন।

মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য প্রচলিত একাডেমিক (স্কুল-কলেজের) শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট নয়। তা' যদি হতো তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী মানবকেন্দ্রীক এতো সমস্যা-- এতো অশান্তি ও সঙ্কট সৃষ্টিই হতোনা। আজকের এই কঠিন বিপর্যয়ের একমাত্র সমাধান করতে পারে মহর্ষি মহামানস প্রদর্শিত বিশুদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলন।

এই উদ্দেশ্যেই পরমগুরু~ মহর্ষি মহামানস সত্যিকারের মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে 'মহামনন' নামে ধ্যান প্রশিক্ষণ সহ অপরিহার্য মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা বা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ তৈরির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন!

এর পাশাপাশি তিনি প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস মুক্ত, আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ধর্মের প্র্যাকটিস বা অনুশীলন পর্বই হলো 'মহামনন'।

মহর্ষি মহামানস প্রবর্তিত 'মহাধর্ম' ও 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম হলো প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক বিপ্লব!

যুগ অবসান কালের এই চরম সঙ্কট থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে, সময়ের চাহিদা মতোই 'মহাধর্ম' নামে মানুষের মৌলিক ধর্ম আবির্ভূত হয়েছে। 'মহাধর্ম' হলো যুগান্তকারী এক বৈপ্লবিক আধ্যাত্মিক আন্দোলন।

এই ধর্ম অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক~ মিথ্যাশ্রিত~ প্রবঞ্চনা মূলক প্রচলিত ধর্মের মতো কোনো ধর্ম নয়। এই ধর্ম~ আত্মবিকাশ যোগের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি অর্জনের ধর্ম।

'মহাধর্ম' হলো প্রকৃত অর্থে মানবধর্ম অর্থাৎ মানুষের মন-বিকাশমূলক স্বাভাবিক ধর্ম। মানব বিকাশের ধর্ম। মানব ধর্মই সনাতন ধর্ম। বিমূর্ত মানব ধর্মই আত্মপ্রকাশ করেছে 'মহাধর্ম' রূপে।

সামনে আরও গভীর সঙ্কট। এখনো অল্প সময় আছে। অন্ধ-বিশ্বাসের অন্ধকার ঘেরাটোপ থেকে বেড়িয়ে এসে, কল্পনার মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে, স্বধর্ম~ মানবধর্ম পালন করতে হবে আমাদের, এবং একমাত্র এই পথেএ যথেষ্ট

বিকাশ লাভ সম্ভব হবে। নতুন প্রজন্ম এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। 'মহাধর্ম মিশন' -এর সক্রিয় সদস্য হোন।

বিশদভাবে জানতে হলে, এবং মহাধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী হলে, গুগল সার্চ করুন~ মহাধর্ম: মানবধর্মই মহাধর্ম।

প্রতিদিন সারা পৃথিবী জুড়ে অত্যন্ত মর্মাহতকর মনুষ্যকৃত যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, এবং মানুষের যে বিকৃত— বিকারগ্রস্ত— উন্মাদপ্রায় রূপ আমরা প্রতিনিয়ত অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করে চলেছি, প্রচলিত ধর্ম— রাজনীতি— প্রশাসন প্রভৃতি প্রচলিত কোনো ব্যবস্থা বা সিস্টেম-ই তার প্রতিকারে সক্ষম নয়।

এই ঘোর সঙ্কটে, আগামী সর্বনাশা পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে— মহর্ষি মহামানস একমাত্র সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। এখনও সময় আছে, আমরা যদি এখনও সেই পথ অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলেই শেষ রক্ষা হবে। ধন্যবাদ।

প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে আমরা আরো কিছু জানবো।

প্রশ্ন: মহাধর্ম নামে আপনার প্রবর্তিত এই ধর্মের মূল বিষয়বস্তু কী?

উত্তর: এই ধর্ম হলো আসলে মানবধর্ম। প্রকৃত অর্থে মানুষ গড়ার ধর্ম। তুমি একজন মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছো, তাই পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠাই তোমার জীবনের মৌলিক ধর্ম ও প্রধান ধর্ম। যেহেতু আমরা মানুষ হয়ে ওঠার স্বাভাবিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়েছি, সেই কারণেই আমাদের এতো দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা, এতো অশান্তি, দারিদ্র্য এতো সমস্যা। আর তাই আমাদেরকে মানববিকাশের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সময়ের চাহিদা মতোই আবির্ভূত হয়েছে মহাধর্ম নামে এই মানববিকাশ মূলক ধর্ম। মানবধর্মই মহাধর্ম।

প্রশ্ন; প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম পালনের মধ্যে থাকে ঈশ্বরের উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কিছু নিয়ম-নীতি, ধর্মাচার প্রভৃতি। এই ধর্ম পালন করতে~ মানুষকে কী করতে হবে?

উত্তর: 'মহামনন' নামে আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষাক্রম হলো মহাধর্মের ধর্মানুশীলন। নিজেকে জানা, নিজের শরীর ও মনকে জানা, মানবজীবনের লক্ষ্যকে জানার সাথেসাথে এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা, তারপর নিজের মনের বিকাশ সাধনের জন্য বিশেষ কিছু যোগ পদ্ধতি অনুশীলন করা, এই নিয়েই মহাধর্ম বা মহামনন অনুশীলন।
যেকোনো ধর্মের মানুষ ইচ্ছা করলে, তাদের নিজ নিজ ধর্মে থেকেও এই অনুশীলনের মাধ্যমে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারবেন।

প্রশ্ন: ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জেনেছি, প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে আপনি এক মহা আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। এর মূল বিষয়টিকে কি একটু সহজ করে বলবেন?

উত্তর: শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা~ অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির মূল কারণ হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব এবং মানসিক অসুস্থতা। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার, হিংসা-বিদ্বেষ-সন্ত্রাস সবই তার থেকেই জন্ম নিয়েছে।
প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি সর্বত্র সঠিক মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, তখন অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান হবে।

এই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় 'মহামনন' নামে একটি মনোবিকাশ মূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রস্তুত হয়েছে। সর্বত্র এই শিক্ষা এবং এর অনুশীলন চালু করতে পারলে, অদূর ভবিষ্যতে মানববিকাশ বাস্তবায়িত হবে।

প্রশ্ন: স্রষ্টা বা ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কোনো ধর্মের কথা আমরা ভাবতেও পারি না। মহাধর্ম নামে আপনার প্রবর্তিত ধর্মে শুনেছি এইরকম কোনো কিছু নেই। তাহলে আপনার কাছে ধর্ম কথাটার তাৎপর্য কী?

উত্তর: যাকে ধারণ ক'রে, যা অনুশীলন ক'রে যথেষ্ট সুস্থ ও বিকশিত মনের মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধশালী মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে তা-ই হলো ধর্ম।
যা আমাদেরকে বিকাশ পথ থেকে বিচ্যুত ক'রে, বিপথগামী ক'রে, দীনহীন অন্ধবিশ্বাসী স্তাবকে পরিণত ক'রে তোলে, আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল না ক'রে পরনির্ভরশীল ক'রে তোলে, তা কখনোই মানুষের ধর্ম হতে পারে না।

মানববিকাশের অর্থাৎ মনোবিকাশের স্বাভাবিক পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণেই হাজার হাজার বছর পেরিয়ে এসেও মানুষ এখনো যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। আর তার জন্যেই মানুষের এতো দুঃখ কষ্ট দুর্দশা, এতো অশান্তি, এতো সমস্যা।

কেন এতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছি আমরা? আমাদের বিকাশের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা কোথায়? খুঁজে দেখার সময় এসেছে আজ।
যুগসন্ধিক্ষণের এই গভীর সঙ্কটকালে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে উন্নত আলোকোজ্জ্বল জীবনের সন্ধান দিতেই, মুক্তিসূর্য রূপে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের প্রকৃত ধর্ম~ মহাধর্ম। একে সাদরে গ্রহণ করতে হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। 'মহাধর্ম' প্রচলিত ধর্মের মতো কোনো ধর্ম নয়। বিকাশ লাভ ও সুস্থতা লাভের জন্য আত্মবিকাশ যোগ অনুশীলন করাই হলো এই ধর্ম পালন করা।

প্রশ্ন:   আপনি মানব মুক্তির জন্য সর্বত্র  মন-বিকাশমূলক শিক্ষার প্রচলন ঘটাতে বলেছেন। এই মানব মুক্তির কথা আমরা এর আগে শুনেছি কমিউনিজম এর মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কি মনে করেন, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ মানবমুক্তি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়?

উত্তর:  মানবমুক্তি বলতে প্রকৃত অর্থে বোঝায়, অজ্ঞানতা, অন্ধত্ব, চেতনার অভাব থেকে, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি। মানুষের অধিকাংশ বন্ধনের মূলে রয়েছে, যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব। তাই এইসব বন্ধন থেকে মানুষকে চিরতরে মুক্ত করতে হলে, তাকে মনোবিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে  অজ্ঞানতা জনিত অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে সবার আগে। বাইরের বন্ধন আসল বন্ধন নয়।  অন্তরের বন্দী দশা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারলে তবেই প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিস্টেম বা ব্যবস্থা মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করতে পারবে না।

এসম্পর্কে আমার 'মহাবাদ' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন:  অন্যান্য ধর্মগুরু ও আধ্যাত্মিক গুরুদের সঙ্গে আপনার কথা ও লেখায় অনেক অমিল দেখতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের কারণ কী?

উত্তর:  আমার সঙ্গে অন্যান্য ধর্মগুরু ও আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও পার্থক্য অনেক। আমি প্রচলিত ধর্মের ভিতরেও যেমন সত্যের সন্ধান করেছি তেমনি আবার সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে ধর্মের বাইরে থেকেও সত্যের সন্ধান করেছি। এখন আমি প্রচলিত ধর্মের বাইরে বা ঊর্ধ্বেও বলতে পারেন।

ধর্মের অন্ধকার ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে প্রকৃত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ওনাদের সঙ্গে আমার মত ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটেছে এই কারণেই।

প্রশ্ন : অনেকেই বলে থাকেন, তাদের ধর্মই নাকি শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও মানবধর্ম। অর্থাৎ যথেষ্ট বিকশিত মানুষ গড়ার ধর্ম। বাস্তব সত্য কি তাই?

উত্তর : তা-ই যদি হোতো, তাহলে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ সেই সব ধর্মের অধীনে থাকা সত্ত্বেও, ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ এবং ধর্ম পালন বা অনুশীলন করা সত্ত্বেও মানুষের আজ কেন এতো দুর্দশা? চারিদিকে কেন এতো হানাহানি রক্তপাত, হিংসা বিদ্বেষ, প্রতারণা মূলক ঘটনা?

আসলে, অন্ধবিশ্বাসের পথ আর মানববিকাশ বা মনোবিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। জ্ঞান ও চেতনা বিকাশের পথে প্রধান বাধাই হলো অন্ধবিশ্বাস। প্রচলিত ধর্ম মানুষকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে শেখায়, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেনা। বরং জ্ঞান ও সত্যের নামে মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তাই ওপথে কোনো দিনই মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি সম্ভব হতে পারে না।

### ।। মানবধর্মই মহাধর্ম।।

বিমূর্ত মানব ধর্মের মূর্ত রূপ হলো মহাধর্ম। মহাধর্ম হলো আসলে মানব ধর্ম। আমাদের মূলগত প্রাথমিক ধর্ম। আত্মবিকাশ তথা মানব বিকাশের জন্য অনুশীলনীয় ধর্ম। শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভের নিশ্চিত উপায়।

মহাধর্মের সারকথা হলো~ তোমার একটি সচেতন মন আছে বলেই~ তুমি মানুষ। তবে তোমার এই সচেতন মনটি এখনও যথেষ্ট বিকশিত নয়। তুমি অধিক অংশে অবচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছো, তাই তোমার এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা। যথেষ্ট বিকশিত একজন মানুষ হয়ে উঠতে~ তোমার এই সচেতন মনটির বিকাশ ঘটানো আবোশ্যক। আর এটাই তোমার প্রাথমিক ধর্ম।

প্রচলিত ধর্ম তোমার এই সচেতন মনের বিকাশ ঘটাতে চায়না। তুমি সজাগ ও সচেতন হয়ে গেলে, তখন আর মিথ্যাশ্রয়ী ঐ সব বুজরুকি দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখা যাবেনা। তাই প্রচলিত ধর্ম চায়~ তুমি অজ্ঞান অন্ধবিশ্বাসী হয়েই থাকো চিরকাল।

তুমি একজন মানুষ রূপে জন্ম গ্রহন করেছ, তাই তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো~ পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। জীবনের লক্ষ্য সহ নিজেকে এবং এই জাগতিক ব্যবস্থাকে জানতে, সর্বদা সজাগ সচেতন থাকতে চেষ্টা করো। নিজেকে প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন বিকশিত মানুষ করে তুলতে উদ্যোগী হও।

জন্মসূত্রে বা ইচ্ছা ক্রমে তুমি যে প্রচলিত ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত হওনা কেনো, তোমার প্রথম পরিচয়~ তুমি একজন মানুষ। একজন মানুষ হিসাবে~ তোমার প্রধান ও মৌলিক ধর্মই হলো~ মানবধর্ম। আর এই মানব ধর্মই মহাধর্ম। সর্বাঙ্গীন সুস্থতা সহ মানব মনের বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠাই যার মূল কথা।

আমরা এখানে এসেছি~ এক শিক্ষা মূলক ভ্রমনে। ক্রমশ উচ্চ থেকে আরো উচ্চ চেতনা লাভই এই মানব জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এখানে আমরা জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে যত বেশি চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবো, তত বেশি লাভবান হব। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে~ এখান থেকে চলে যাবার সময়~ কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না, একমাত্র চেতনা ব্যতীত।

সর্বপ্রথম আমাদের বুঝতে হবে~ এই মহাধর্ম আসলে কী। মহাধর্ম হলো~ আত্মবিকাশের ধর্ম~ মানবধর্ম, আমাদের স্বাভাবিক ও মৌলিক ধর্ম। মানুষ গড়ার ধর্ম। এই ধর্ম প্রচলিত কোনো ধর্ম বা রিলিজিয়নের সাথে তুলনীয় নয়। কাল্পনিক ঈশ্বর ও অন্ধবিশ্বাস এই ধর্মের মূল ভিত্তি নয়। এর ভিত্তি হলো~ যুক্তি বিজ্ঞান ও প্রকৃত অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। মহাধর্ম প্রচলিত ধর্মগুলি থেকে সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন।

সঠিক আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম~ মহামনন -এর পথ ধরে প্রকৃত আত্ম উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন ঘটানোই হলো আমাদের প্রধান লক্ষ্য, আর এই হলো আমাদের প্রাথমিক বা মূলগত ধর্ম। 'মহামনন' হলো মহাধর্মের ব্যবহারিক দিক। চিরন্তন মানব ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মহাধর্ম-কে আপাতদৃষ্টিতে একটি নতুন ধর্ম মনে হলেও, এটা কোনো নতুন ধর্ম নয়। এ হলো আমাদের চিরন্তন ধর্ম। আমাদের অজ্ঞানতার কারণে যা এতকাল ছিল অন্তরালে। আত্মবিস্মৃত মানুষ~ আমরা আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্যকে বিস্মৃত হোয়ে~ মোহ আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে~ একটা ঘোরের মধ্যে বাস করছি।

যে ধর্ম অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি সজাগ সচেতন ভাবে দ্রুত পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হতে পারে, তাই হলো মহাধর্ম।

ব্যক্তি মানুষের বিকাশের মধ্য দিয়েই দেশের এবং মানব জাতির বিকাশ সম্ভব। আর সেই উদ্দেশেই মহাধর্ম নামে এই মহান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একে সফল করে তুলতে তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও এবং সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করো। তুমি তোমার এলাকাতেই মহাধর্ম কার্যোক্রম শুরু করতে পার। শুধু প্রয়োজন~ আত্ম নিবেদন, মহা উদ্যোগ, সাংগঠনিক ক্ষমতা আর উপযুক্ত স্থান।

তোমার জীবনের প্রাথমিক চাহিদা~ শরীর ও মনের সুস্থতা, শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিকাশলাভ করতে, মহাধর্ম তথা মানবধর্ম অনুশীলন করো। মহাধর্ম ক্রমশ এক মহা বৈপ্লবিক উত্তাল তরঙ্গে পরিণত হতে চলেছে। মানব জীবনে আমূল শুভ পরিবর্তন আসতে চলেছে~ মহাধর্মের পথ ধরে। একে ত্বরান্বিত কোরে তুলতে তুমিও শরিক হও।

সংক্ষেপে, মহাধর্ম ও মহা বিশ্বোরূপ ঈশ্বর: এই ধর্মে~ মহা বিশ্বরূপ শরীর এবং তার মধ্যে অবস্থিত মহাবিশ্ব মোন নিয়েই ঈশ্বর অস্তিত্ব। আমরা তাকে বলি, বিশ্বমোন বা বিশ্বাত্মা। বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

## ধর্ম আসলে কী ও কেনো

যেমন জলের ধর্ম~ আগুনের ধর্ম, তেমনই জীবের ক্ষেত্রে ধর্ম হলো~ তার সহজ আচরণ বা স্বভাব ধর্ম। মানুষের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। মানুষ তার স্বভাবধর্ম সহজ আচরণের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ক্রমশ জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও চেতনা লাভের মধ্য দিয়ে~ মনো বিকাশের পথ ধোরে এগিয়ে গিয়ে~ একসময় মানবত্ব লাভ করে। পূর্ণ বিকশিত মনের মানুষ হয়ে ওঠে। মানব মনের বিকাশ পথ ধরে এগিয়ে চলাই হলো~ মানব ধর্ম।

ধর্ম মানে অন্ধ বিশ্বাসে~ কাল্পনিক কোনো কিছুর পিছনে অথবা কোন কিছু লাভের পিছনে ছুটে চলা নয়। ধর্ম মানে অজ্ঞান অন্ধের মতো কোনকিছু মেনে চলা, কোনো আচার আচরণ করা, কাল্পনিক ঈশ্বরের উপাসনা করা, অথবা কারো কোনো দুরভিসন্ধিমূলক নির্দেশ পালন করা নয়। ধর্ম নামে এইরূপ কোনো ব্যবস্থা যদি মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, অথবা আরোপ করা হয়, তা ধর্ম নয়, অধর্ম।

এই প্রসঙ্গে আরোপিত ধর্মের কথা এসেই যায়। এক্ষেত্রে আরোপিত ধর্ম হলো তাই~ যাকে বা যে ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও ধারণ ক'রে একজন মানুষ স্বচ্ছন্দে এবং দ্রুততার সঙ্গে সুস্থতা লাভসহ মানব মনের তথা চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে মানবত্ব লাভে সক্ষম হোতে পারে, তা-ই হলো মানুষের প্রকৃত ধর্ম। আরোপিত মানোব ধর্ম।

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে~ তাদেরকে কোনো ধর্ম গ্রহণ ও তা ধারণ পালন কোরতে হয়না। তা তাদের মধ্যে স্বভাবতই কার্যকর থাকে। তাহলে~ মানুষের ক্ষেত্রে নতুন কোরে ধর্ম গ্রহণ ও পালনের কথা আসছে কেন? আসছে এই কারণে~ মানুষের ক্ষেত্রে মানব ধর্ম তার সহজ ও স্বভাব ধর্ম হলেও, অভিসন্ধি মূলক ভাবে তার উপরে অন্য বা অন্যান্য কৃত্রিম ধর্ম, অন্ধবিশ্বাস মূলক ধর্ম আরোপিত হওয়া অথবা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে, সে তার আত্মবিকাশ মূলক সহজ ও স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে~ বিপথগামী হয়ে পড়েছে। এখন, তাকে তার স্ব-ধর্মে অর্থাৎ মানব ধর্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে, মানবধর্ম ভিত্তিক একটি নতুন ধর্মের একান্ত প্রয়োজন। এই নতুন ধর্মই হলো~ মহাধর্ম।

মানুষ কথাটার মধ্যে রয়েছে, মন ও হুঁশ। হুঁশ যুক্ত মন অর্থাৎ সচেতন মন। আমাদের মধ্যে রয়েছে দুটি মন, একটি হলো~ সচেতন মন বা মানব-চেতন মন, আর অপরটি হলো~ অবচেতন মন বা যুক্তি বিচার বিহীন অন্ধ আবেগ প্রবণ~ প্রাক মানব চেতন মন। এই সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটা অবধি আমরা অধিক অংশে অবচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকি। সচেতন মনের বিকাশ ঘটলে~ তবেই আমরা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠবো।

মানব জীবনের অধিকাংশ সমস্যা~ তার মূল কারণ ও প্রকৃত সমাধান।

সমস্ত অমানবিক~ ধ্বংসাত্মক~ নিষ্ঠুর কার্যকলাপের জন্য দায়ী হলো মানুষের অজ্ঞানতা বা জ্ঞানের স্বল্পতা, আর অসুস্থতা, অস্বাভাবিকতা বা বিকৃত মানসিকতা। সারা পৃথিবীব্যাপী প্রতিনিয়ত হিংসা বিদ্বেষ, নিপীড়ন নির্যাতন অত্যাচার নিষ্ঠুরতা, ধর্ষন, প্রতারণা, হত্যা~ ধ্বংস প্রভৃতি অসংখ্য অমানবিক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে। এ সবের জন্য একমাত্র দায়ী হলো~ মানুষের যথেষ্ট চেতনা রহিত অজ্ঞান ও অসুস্থ মন।

প্রচলিত ধর্মগুলির সাথে মহাধর্মকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। মহাধর্ম হলো আমাদের প্রাথমিক ধর্ম ও প্রাকৃতিক ধর্ম— মৌলিক ধর্ম— মানব ধর্ম। সর্বাঙ্গীন সুস্থতাসহ মন-বিকাশের পথে এগিয়ে চলাই এই ধর্মের মূল কথা।

আমরা অধিক অংশেই অন্ধ আবেগ প্রবণ অবচেতন মনের দ্বারা চালিত হই বলেই~ আমাদের এত দুঃখ কষ্ট দুর্দশা। আমাদের সচেতন মন এখনও পর্যন্ত তেমন বিকশিত নয়। সচেতন মনের বিকাশ ঘটানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। যার সচেতন মন যতো বেশি বিকশিত, সে ততটাই বিকশিত মনের মানুষ। যে যতো বেশি বিকশিত~ সে তত বেশি জীবনকে উপভোগ করতে সক্ষম। এগিয়ে যেতে সক্ষম।

একেতো আমরা বেশিরভাগ সময়েই অবচেতন মনের অন্ধ বিশ্বাস~ অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে থাকি, তার সাথে যদি আবার যুক্ত হয় অসুস্থতা, অসুস্থ মানসিকতা, তখন সোনায় সোহাগার মতো~ আমাদের ভিতরটা একেবারে নরকে পরিণত হয়ে ওঠে। জীবন দুর্বিসহ বিষময় হয়ে ওঠে তখন। ক্রোধ অসহিষ্ণুতা হিংসা-বিদ্বেষ নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের মন।

যার যা আছে সে অপরকে তা-ই দিতে পারে। যার অন্তরে সুখ আছে~ শান্তি আছে, সে অপরাপর মানুষকে তা শেয়ার করতে সক্ষম। যার অন্তর বিষে পরিপূর্ণ সে বিষই উদ্গিরণ করতে পারে। অমৃত সে দেবে কোথা থেকে!

অন্তরকে বিষ মুক্ত~ সুস্থ করে তুলে, জ্ঞানের আলোকে আলোকীত হয়ে উঠতে পারলেই দিব্য সুন্দর জীবন লাভ করতে পারবো আমরা। এটাই তো মানব জীবনের একান্ত কাম্য হওয়ার কথা। কিন্তু অসুস্থ মনের কাছে তা কাম্যো নাও হতে পারে। তার কাছে আত্ম- ধ্বংসাত্মক পথই শ্রেয় মনে হতে পারে। সে শুধু নিজেকেই ধ্বংস করে

না, সমাজ সংসার জগতটাকেও ধ্বংস করতে চায় সে! তার মনোভাব হলো~ আমি শুধু একাই কষ্ট পাবো কেনো! সবাইকে কষ্ট দিতে পারলেই তার সাময়ীক ও অলীক সুখ অনুভূত হয়।

মানব ধর্মের মূর্ত রূপ~ মহাধর্মের সাথে কারো বিরোধ থাকার কথা নয়, একমাত্র অজ্ঞান অন্ধ অসুস্থ মন ছাড়া।

এখন, যারা তুলনামূলকভাবে সুস্থ আছে, যারা এখনও জীবনকে ভালবাসে, একজন প্রকৃত মানুষের মতো বাঁচতে চায়, তারা ভালভাবে বাঁচার জন্য, এই মূলগত সমস্যার সমাধানের জন্য, অনেক পথ অনুসন্ধান করছে, —অনেক কিছুই চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিক যা করণীয়, তা না করার ফলে~ সমস্যার সমাধান হচ্ছেনা এতটুকুও।

এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, আত্ম বিকাশ ও মানব বিকাশমূলক ধর্ম~ মহাধর্ম। সমস্যাকে ভালোভাবে তলিয়ে বুঝতে শেখায় এই ধর্ম, সমস্যার মূলে নিয়ে গিয়ে তার সমাধানের পথ দেখায় এই ধর্ম। এমনকি, সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সরাসরি সাহায্যও করে এই ধর্ম। এখন, একে গ্রহন করা~ কি ত্যাগ করা~ ব্যক্তি বিশেষের নিজের নিজের জ্ঞান চেতনা, বিচার বুদ্ধি, পছন্দ অপছন্দ সহ তার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

প্রসঙ্গত জানাই~ এই ধর্ম মূলতঃ অন্ধ-বিশ্বাস মুক্ত, জ্ঞান-পথের পথিকদের জন্য। এই ধর্ম গ্রহন করতে ও অনুশীলন করতে, পূর্বের আচরিত ধর্ম ত্যাগ না করলেও চলবে। অর্থাৎ তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ না করেও এই ধর্ম অনুশীলনের মধ্য দিয়ে লাভবান হোতে পারবে।

বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে, গুগল সার্চ করুন এবং এই ওয়েবসাইটে আসুন~
https://mahadharma.wix.com/website

এই ধর্মের মূলে রয়েছে, যুক্তি সম্মত অধ্যাত্মবাদ ও একালের শ্রেষ্ঠ মতবাদের একমাত্র গ্রন্থ~ মহাবাদ। মহাধর্ম অনুসরণ ও অনুশীলন করতে গিয়ে~ মহাবাদ-এর সমস্ত দর্শন ও মতবাদ তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে~ গ্রহন করতে হবে, এমন নয়। যার যতটুকু ভালো লাগবে সে ততটুকুই গ্রহন করলে। এখানে মন-বিকাশই হলো মূল কথা। অন্ধের মতো অনুসরণ মোটেও কাম্য নয়।

## মানবধর্ম আসলে কী

পৃথিবীর মুক্ত পাঠশালায়, এই জাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, পূর্বসূরিদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার দ্বারা সজাগ সচেতন, যুক্তিপ্রিয় ও সত্যপ্রেমী হয়ে~ ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিঘ্ন প্রতিকূলতার মধ্যো দিয়ে, কর্ম ও ভোগের মধ্য দিয়ে, জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে~ স্বতস্ফূর্তভাবে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে~ ক্রমশ মনোবিকাশ তথা চেতনা বিকাশের পথে এগিয়ে চলাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, মৌলিক ধর্ম। আর, এই হলো মানবধর্ম।

আমরা সবাই এই একই পথের পথিক, ক্রমশ বিকাশমান চেতনার পথে। তবু আজ, কেউ চলেছে জ্ঞাতে, আর কেউ অজ্ঞাতে। কেউ পিছিয়ে~ আর কেউ এগিয়ে। কেউ অতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর কেউ দ্রুত গতিতে। কেউ মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে, চেতন আলোক বিহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অজ্ঞানতা জনিত অন্ধত্বের কারণে হোঁচট খেতে খেতে, অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রনা ও অসুস্থতার মধ্য দিয়ে কোনোক্রমে এই পথ অতিক্রম কোরে চলেছে। আর কেউ মানব ধর্মের চেতন-আলোকে উজ্বল পথে~ স্বচ্ছন্দে জ্ঞানানন্দে স্ফূর্তিতে পূর্ণ

বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, এই একই পথ ধরে। কেউ মানবধর্ম সম্পর্কেই সজাগ নয়, ওয়াকিবহাল নয়, আর কেউ সজাগ সচেতনভাবে 'মানবধর্মো পালন করে চলেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এমন অসামঞ্জস্য~ এমন পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ কী? আর, মানোব ধর্মের স্বাভাবিক ছন্দোময় মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত হয়ে, এমন দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ারই বা কারণ কী?

এর অন্যতম কারণ হলো, মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিম ধর্ম।

একটাই জগত, পথও একটাই, শুধু জ্ঞান ও চেতনার পার্থক্যের জন্য এক একজনের~ এক এক দশা, এবং এই পথ ও জগত~ এক এক জনের কাছে~ এক এক প্রকারে উপলব্ধ হয়। শুধু তাই নয়, জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে এই পথ~ এই জগতকেই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনাময় নরক (প্রচলিত অর্থে) করে তোলে কেউ কেউ।

এরজন্য অনেকাংশে দায়ী কুটিল স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা পরিচালিত অন্ধ-বিশ্বাস ভিত্তিক প্রচলিত ধর্ম। ধর্ম~ যাকে ধারণ ও পালন কোরে আমাদের মনোবিকাশ বা মানব বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা, উল্টে সেই ধর্মই যদি আমাদের বিপথগামী নিম্নোগামী কোরে তোলে, তো সেই মিথ্যার বেসাতিকে কি ধর্ম বলা যাবে?

একশ্রেণীর কুচক্রী অমানুষ, তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, মানুষকে তাদের সৃষ্ট কাল্পনিক ঈশ্বর ভিত্তিক ধর্ম নামে অধর্মের খাঁচাকলে পুরে, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অন্ধ-বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, মানুষকে তার স্বাভাবিক বিকাশমুখী মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত কোরে, তার অধঃপতন ঘটিয়েছে।

এই অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন অন্ধত্বজাত অশান্তি থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দে সানন্দে এগিয়ে যেতে চাইলে, জ্ঞান ও চেতনা বিকাশের পথে অগ্রসর হোতে হবে আমাদের, মানব ধর্ম ভিত্তিক আত্ম-বিকাশ মূলক ধর্ম~ মহাধর্মো এর পথ ধোরে। মানোব ধর্মোকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতেই আবির্ভূত হয়েছে~ মহাধর্ম। বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপই হলো~ মহাধর্ম।

যাকে ধারণ কোরে মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে পারে, অপরকে বাঁচাতে পারে এবং আত্ম বিকাশের পথে নিজে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে অপরকেও অগ্রসর হোতে সাহায্য কোরতে পারে, তাই হলো মানবধর্ম। আর এই মানব ধর্মই হলো মহাধর্ম। বিমূর্ত মানব ধর্মের মূর্ত রূপই হলো~ মহাধর্ম।

এখন, অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে আলাদা করে মানব ধর্ম ভিত্তিক এই 'মহাধর্ম' গ্রহণ ও অনুশীলন করার প্রয়োজন কী। প্রয়োজন এই জন্য---, আমরা হাজার হাজার বছর পেরিয়ে এলেও, এখনো আমাদের যথেষ্ট মনোবিকাশ ঘটতে পারেনি। আমরা অতীতে যে তিমির ছিলাম, আজও সেই তিমিরেই পড়ে আছি। আমাদের চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকদের চিহ্নিত কোরতে হবে প্রথমে। এরা হলো--- প্রচলিত ধর্ম, রাজতন্ত্র (বর্তমানে রাজনীতি), আর বৈশ্যতন্ত্র (ব্যবসা- বাণিজ্য ব্যবস্থা, বর্তমানে কর্পোরেট)। এরা চিরকালই আমাদেরকে এদের প্রয়োজনানুসারে মুর্খ বানিয়ে রাখতে সদাতৎপর। মানুষের মনোবিকাশ এদের কাম্য নয়। মানুষ বেশি সচেতন হয়ে উঠলে এদের সর্বনাশ। এদের কারসাজিতেই, আজ আমাদের যতটা মনোবিকাশ ঘটার কথা, তা' ঘটা সম্ভব হয়নি।

'মহাধর্ম' হলো একটি অতি উৎকৃষ্ট বিশেষ (প্র্যাকটিকাল ও থিওরিটিক্যাল) শিক্ষা ব্যবস্থা। যার দ্বারা বিভিন্ন প্রতিকূলতা দূর কোরে দ্রুত মনোবিকাশ ঘটানো সম্ভব। মানুষকে সুস্থ ও সচেতন করে তোলা এবং পূর্ণবিকশিত

মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে আমাদেরকে এগিয়ে দেওয়াই 'মহাধর্ম' -এর কাজ। যেটা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রচলিত ধর্মের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। আশা করছি, 'মহাধর্ম আসলে কি, এবং এর কি উদ্দেশ্য, তোমাদেরকে মোটামুটি বোঝাতে পেরেছি।

মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া, অর্থাৎ মানবধর্মের স্বাভাবিক মানববিকাশমুখী পথ থেকে সরে এসে বিপথগামী হওয়ার কথা আগেই বলেছি। এবার বলবো, মানবত্ব লাভের কথা।

পশু যেমন পশুধর্ম বা পাশব ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, মানুষও তেমনি মানবধর্ম নিয়েই জন্মগ্রহণ কোরে থাকে। তবে, পশুর ক্ষেত্রে পশুধর্ম আর পশুত্ব প্রায় সমর্থক হলেও, মানুষের ক্ষেত্রে তা' নয়। পশুকে পশুত্ব অর্জন করতে হয়না। মানুষকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) মানবত্ব অর্জন করতে হয়। মানবধর্মের পথ ধরেই মানবত্ব লাভ করে থাকে সে।

পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে উঠলে, তবেই একজন ব্যক্তি পূর্ণ মানবত্ব লাভ কোরে থাকে। মানব মনের (সচেতন মনের) যথেষ্ট বিকাশ ঘটলে তবেই মানবত্ব লাভ হয়। মানব মনের যথেষ্ট বিকাশ (লাভ) আর মানবত্ব (লাভ) এখানে সমার্থক।

মানুষের প্রতি দয়া-প্রেম-ক্ষমা, সহানুভূতি ---সহযোগিতা প্রভৃতি গুণগুলি মানবত্ব বা মানবতার একটা অংশ মাত্র। মানবত্ব লাভ হলে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগুলির বিকাশ ঘটে থাকে। তখন আর শিক্ষার মাধ্যমে তা' আরোপ করার প্রয়োজন হয়না।

ব্যক্তির চেতনা ও সুস্থতার ন্যূনাধিক্যের কারণে তাঁর স্বভাব ধর্ম~ মানবধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা দিতে পারে। বিকাশ পথে কেউ কিছুটা এগিয়ে~ কেউ পিছিয়ে থাকতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে পরম্পরাগতভাবে উপযুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে এবং কুশিক্ষার প্রভাবে বিপথগামীতার কারণে, কারও কারও মধ্যে অসুস্থতা জনিত বিকার-বিকৃতি, এমনকি পশুবৎ আচরণ পরিলক্ষিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এদেরকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

কেউ একজন বলতেই পারে, মনোবিকাশ বা মানববিকাশ পরে হবে, আগে অন্নের ব্যবস্থা করুন। পেটে খিদে থাকলে কোনো বিকাশই হবেনা।

কথাটাকে মান্যতা দিয়েই বলি, মানুষের যথেষ্ট মনোবিকাশ তথা মানববিকাশ না ঘটার কারণেই কিন্তু আজ এতো খাদ্যের অভাব। আর এই খাদ্যের অভাব মিটে গেলেই যে মানুষ মনোবিকাশে উদ্যোগী হবে, তেমন মোটেও নয়।

যখনই পেট ভর্তি হয়ে যাবে, মানুষ তখনই আনন্দ- স্ফূর্তি আর অন্ধবিশ্বাস নিয়ে মশগুল হয়ে পড়বে। বিকাশের কথা ভেবে দেখার মতো সময়ই থাকবে না তার। এভাবেই চলে আসছে এযাবৎকাল। বরং আধপেটা খেয়েই মানুষ কিছুটা হলেও উন্নতির কথা ভাবতে পারে।

একটু তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে দেখবেন, শুধু খাদ্যই নয়, মানুষের অধিকাংশ অভাব অনটন, অশান্তি, হতাশা, দুর্দশা, সমস্যা ও সঙ্কটের মূল কারণই হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব। মনোবিকাশ মূলক প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

পৃথিবীতে খাদ্যাভাব নিয়ে, মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার জন্য বহু মানুষ এবং বহু প্রতিষ্ঠান এমনকি বহু রাষ্ট্র রয়েছে। কিন্তু সব সমস্যার মূল কারণ চেতনার অভাব দূরীকরণে কেউ নেই।

তবে চেতনার নামে ধর্মীয় প্রতারণার দেখা পাওয়া যাবে যত্রতত্র। সমস্যার প্রকৃত সমাধানে একমাত্র মহর্ষি মহামানস ব্যতীত আর কাউকেই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত। বরং ভুখা মানুষগুলোকে খেপিয়ে তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত মানুষের অভাব দেখা যাবে না। অভাব আছে শুধু নিঃস্বার্থভাবে আসল কাজের মানুষের। যা করলে মানুষের অধিকাংশ অভাব অভিযোগ দূর হয়ে যাবে, সে নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। আসলে প্রতারণামূলক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শিক্ষা মানুষের মাথাটাকে এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে সেই মাথার পক্ষে আর স্বাধীনভাবে তলিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতাই নেই।

একটি শিশু আত্ম-বিকাশমুখি মানবধর্ম নিয়েই জন্ম গ্রহণ ক'রে থাকে। অজ্ঞান অন্ধবিশ্বাসী ও স্বার্থান্বেষী সমাজ-সংসার তার সেই প্রাকৃতিক স্বভাবধর্মকে চাপা দিয়ে রেখে, কোনো একটি কৃত্রিম ধর্ম তার উপর আরোপ ক'রে, তাকে জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে, বিপথগামী ক'রে তোলে। পরবর্তীতে সেই আরোপিত ধর্মের অন্ধকার ঘেরাটোপে আবদ্ধ মানুষটির কাছে সেই কৃত্রিম ধর্মই তার একমাত্র ধর্ম হয়ে ওঠে।

## মনোবিকাশের গোড়ার কথা

প্রকৃত মানববিকাশসহ আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী মহাবৈপ্লবিক উত্তাল ঢেউ ক্রমশই ধেয়ে আসছে!

আজ আমি আপনাকে এমন একটা যুগান্তকারী মহাবৈপ্লবিক উদ্যোগের কথা বলব যা শুনলে আপনি সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন! তবে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। তাহলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে।

একটু সজাগ দৃষ্টিতে আপনার চারিপাশে চোখ রাখলেই দেখতে পারবেন, সারা পৃথিবী জুড়ে সমগ্র মানবজাতি এক ভয়াবহ সঙ্কট এবং মারাত্মক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে! যত দিন যাচ্ছে, এই দুর্দশা ও দুর্ভোগের তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ' পর্যন্ত, সারা পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য মানুষ যে অনাচার, দুর্নীতি, নিপীড়ন, ধর্ষণ, প্রতারণা, সহিংসতা, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের শিকার হয়ে চলেছে, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কোনো শক্তিশালী ব্যবস্থা বা কোনো সংস্থাই মানবজাতির এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই সমস্ত অমানবিক কাজকে থামাতে পারেনি আজও।

আসলে, বেশিরভাগ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যার মূল কারণ হলো~ যথেষ্ট চেতনা ও জ্ঞানের অভাব। অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধ-ভক্তি, কুসংস্কার এবং মানসিক অসুস্থতা।

মানববিকাশের জন্য চারিদিকে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে অনেক পরিকল্পনা, অনেক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও, মূল সমস্যা এবং তার সঠিক সমাধান এদের কাছে এখনো অধরাই রয়ে গেছে। আর সেই কারণেই মানববিকাশের কোনো পরিকল্পনা এবং কোনো উদ্যোগই আজ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

এর একমাত্র সমাধান হলো, প্রতিটি স্কুলে এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঠিক উপায়ে যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে এবং সেইসঙ্গে সত্যিকারের মনোবিকাশের জন্য একটি বেসিক ম্যানমেকিং অর্থাৎ মানুষ গড়ার বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।

একই সঙ্গে, যথেষ্ট যুক্তিবাদী ও মানসিকভাবে উন্নত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বিকাশের মান অনুযায়ী বিশেষ শংসাপত্র প্রদান করতে হবে। যদি এই শংসাপত্রগুলি কর্মক্ষেত্রে বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়, তবে মনোবিকাশের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা যদি মন সম্পর্কে জানতে এবং মনের বিকাশ ঘটানোর পদ্ধতি শিখতে এবং অনুশীলন করতে থাকে, তাহলেই ধীরে ধীরে তারা অন্ধ-ভক্তি ও অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং মনোদূষণ এমনকি মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

একই সময়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধপ্রবণ মনের শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত ক'রে এবং তাদের আচরণগত ত্রুটিগুলি তদন্ত ক'রে যদি উপযুক্ত শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তবেই শুভ পরিবর্তন আসবে। সত্যিকারের মনোবিকাশ শরীর এবং মনের সুস্থতা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল বিভাগ থাকবে শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যেই।

এছাড়াও, বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যেও সত্যিকারের মনোবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ক'রে, মন-বিকাশের শিক্ষা এবং নিয়মিত অনুশীলনের ফলে লাভ ও সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা ক'রে তাদের এই মনোবিকাশমূলক শিক্ষণ এবং অনুশীলন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করতে হবে।

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, কেনো আজও এতো অন্ধকার, মানুষের মন কেনো এখনো সেই আদিম অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে!?
এর উত্তর দিয়েছেন মহর্ষি মহামানস:
হাজার হাজার বছর ধরে ধর্ম, রাজতন্ত্র (বর্তমানে রাজনীতি), ও বৈশ্যতন্ত্র (ট্রেড সিস্টেম বা কর্পোরেট সিস্টেম) একত্রে মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে, তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। মানুষ আজন্ম ধর্মসহ এদের তৈরি অন্ধবিশ্বাসের ঘেরাটোপের মধ্যে অবস্থান ক'রে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে তাদের কাছে এই অন্ধকারটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এখান থেকে বেড়িয়ে আসার কথা সে ভাবতেই পারে না। এখান থেকে মুক্ত হওয়ার কথা শুনলেই সে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
সর্বত্রব্যাপী এক মানববিকাশ মূলক মহা বৈপ্লবিক আন্দোলন সংঘটিত হলে, একমাত্র তবেই মানুষ অনেকাংশে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে পারবে।

প্রকৃত মানববিকাশ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একজন ভারতীয় ঋষির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে এক মহাবৈপ্লবিক কার্যক্রম। যার নাম হলো~ 'মহামনন'।
‘মহামনন’ হলো প্রকৃত মানব বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় মনোবিকাশমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা।

এই মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে তুলতে, 'মহামনন' নামে মন-বিকাশের পাঠ্যক্রমটি তৈরি করা হয়েছে। 'মহামনন' হলো মন-বিকাশের শিক্ষার একটি দুর্দান্ত - অতুলনীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি, যা সত্যিকারের মানববিকাশ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা। মানুষ গড়ার শিক্ষাক্রম। এই মনোবিকাশের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারলে, তবেই পৃথিবী অধিকাংশ সমস্যা, সঙ্কট ও

দূষণ থেকে মুক্ত হয়ে তার স্বরূপে বিরাজমান হতে পারবে। এখন একে স্বাগত জানাতে হবে, একে সাদরে গ্রহণ করতে হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই।

'মহামনন' হলো সত্যিকারের শিক্ষা যা আমাদেরকে সরাসরি যথেষ্ট বিকশিত মনের উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করে। সত্যিকারের শিক্ষা হলো তা-ই যা ধীরে ধীরে আমাদের যথেষ্ট সচেতন ও জ্ঞানী করে তোলে। অজ্ঞানতা জনিত অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি আমাদেরকে বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম করে তোলে। সুতরাং প্রকৃত মানব উন্নয়নের জন্য আমাদের সত্যিকারের শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আমরা মনে করি, মানবজাতি অথবা কোনো একটি জাতি বা রাষ্ট্রের বিকাশ কেবলমাত্র তার প্রতিটি ব্যক্তির মনোবিকাশের মাধ্যমেই সম্ভব। এছাড়াও আমরা মনে করি, শুধু প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক একাডেমিক (স্কুল - কলেজ ইত্যাদি) শিক্ষা মানুষের সত্যিকারের বিকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য আমাদের এমন একটি মানব উন্নয়নমূলক শিক্ষা প্রয়োজন যা আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিকাশিত মানুষ হতে সহায়তা করতে পারে।

প্রতিটি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন, মনুষ্য সৃষ্ট অধিকাংশ সমস্যা, মানব সমাজের অধিকাংশ অশান্তি ও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পিছনে রয়েছে  জ্ঞান, চেতনা এবং মানসিক সুস্থতার অভাব। এবং মনোবিকাশমূলক শিক্ষার অভাব। সুতরাং আজকের এই চরম সঙ্কটকালে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, 'মহামনন' মন-বিকাশ শিক্ষা বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের বৈজ্ঞানিক উপায়। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও চেতনার অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারণ।

দারিদ্র্যের মূল কারণ হ'ল অন্ধত্ব, কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাস যা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সাথে জ্ঞানহীনতা এবং নিম্নচেতনার ফলে ঘটে।
শুধু দারিদ্র্য থেকেই মুক্তি নয়, মানবাধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন বেশিরভাগ মানুষেরই পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং চেতনা থাকবে। এছাড়াও, জ্ঞান ও চেতনার ঘাটতিই অধিকাংশ মানব-সৃষ্ট সমস্যা, অসুস্থতা এবং নানা ধরনের অমানবিক ঘটনাগুলির জন্য দায়ী।

দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র উপায় হলো সমস্ত দেশে মহর্ষি মহামানস দ্বারা পরিচালিত  'মহামনন'  মন-বিকাশ পাঠ্যক্রমটি ব্যাপকভাবে চালু করা। এবং একই সাথে, আমরা যদি সকলের মধ্যে 'মানবধর্ম'  প্রতিষ্ঠা করতে পারি তবেই দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

এমন নয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেই, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেই তখন মানুষের মনেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবন সাময়িকভাবে আরামদায়ক হতে পারে, মানব সম্পদ এবং মানব সভ্যতার উন্নতি ঘটতে পারে, প্রচলিত শিক্ষায় মানুষ উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে, তবে তা' মানুষের মনের বিকাশ ঘটাতে পারবে না। আর সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটলে মানুষ তাদের সমস্ত সম্পদ হারাবে এবং আবার দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হবে।

মানব বিকাশ বলতে, প্রকৃত অর্থে মানুষের মনের বিকাশ বোঝায়। চেতনার বিকাশ বা সচেতন মনের বিকাশ বোঝায়। মানুষের মন যদি বিকশিত না হয়,  যতই তাকে গ্ল্যামারাস দেখাক না কেন, তার মন সেই অজ্ঞানতার অন্ধকারেই থেকে যাবে।

মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে ধর্মীয় বাধা, অন্ধত্ব, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার যা অজ্ঞতা থেকে এসেছে, এগুলি সরিয়ে দিয়ে, আমরা যদি মানুষকে সত্যিকারের মন-বিকাশের বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি, যদি আমরা তাদের মন-বিকাশমূলক ব্যবহারিক পদ্ধতিতে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিতে পারি, কেবলমাত্র তবেই মানুষের বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

মানুষের (মনের) বিকাশ যদি না ঘটে তবে অন্য সমস্ত বিকাশ বানরের গলায় মুক্তো-মালার মতোই হবে। এবং যদি মানুষের (মনের) বিকাশ ঘটে, তখন অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির বিকাশও অব্যাহত থাকবে।

এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মন থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাসকে সরিয়ে দেয় এবং মানুষকে সচেতন ক'রে তোলার পাশাপাশি জীবনের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলে।

অনেকেই জানতে আগ্রহী, কিভাবে এই মনোবিকাশমূলক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে মানুষ লাভবান হয়ে থাকে। কি-কি বিষয় নিয়ে এই মনোবিকাশের শিক্ষাক্রম।

সংক্ষেপে, এই শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি লাভ করে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীগণ নিজের মন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে এবং নিজের মনকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তারপর তাদের মনকে শিক্ষিত করে তোলা হয় বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে। মনোদূষণ এবং মানসিক অসুস্থতা থাকলে, সেই দূষণ ও অসুস্থতা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এরপর অবচেতন মনকে উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামিং করা হয়, প্রয়োজনে রি-প্রোগ্রামিং করা হয়ে থাকে। তারপর বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে ধীরে ধীরে সচেতন মনের বিকাশ ঘটানোর কাজ চলতে থাকে। এই সবকিছু নিয়েই 'মহামনন' মনোবিকাশ শিক্ষাক্রম।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য, 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক মানববিকাশমূলক যে নতুন ধর্মটি আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই ধর্মের ধর্মাচারণ বা ধর্ম-কর্ম হলো এই 'মহামনন'।

মনোবিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানববিকাশের এই কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে, গুগল সার্চ করুন: MahaManan, MahaDharma

## অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এর নাম শুনে নাক কুঁচকালে হবে না। মহর্ষি মহামানস -এর আধ্যাত্মিকতা হলো অন্ধবিশ্বাস মুক্ত যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক প্রচলিত ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা নয়।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মূল বিষয় হলো নিজেকে জানা, নিজের শরীর ও মনকে জানা। এই 'আমি' -কে জানা। নিজেকে বা আমি-কে সঠিকভাবে জানতে হলে, এই 'আমি' যার অংশ, সেই মহাবিশ্বকে তথা মহাজাগতিক ব্যবস্থাকে জানতে হবে সঠিকভাবে। জানতে হবে সৃষ্টিতত্ত্ব তাহলেই জানা যাবে এই 'আমি'-র সৃষ্টি রহস্য।

মুক্তমন নিয়ে যুক্তির পথ ধরে শিকড়ের সন্ধান করাই হলো আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষ্য। এই পথ ধরে একনিষ্ঠ ভাবে অগ্রসর হতে থাকলে, মহাজাগতিক রহস্য তোমার কাছে একটু একটু করে ক্রমেই উন্মোচিত হতে থাকবে। এখানে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

## আধ্যাত্মিকতা

'অধ্যাত্ম' কথাটির অর্থ হলো--- আত্ম বা মন বিষয়ক। 'আত্মা আর 'মন' সমার্থক। সে মানব শরীর সম্পন্ন-ই হোক অথবা অশরীরী মন-ই হোক, মানবমন অথবা আরও উচ্চচেতন মন, অথবা ঈশ্বর মন, যা-ই হোক না কেন, একটি সচেতনতা সত্তা, যে অনুভব করতে সক্ষম চিন্তা করতে সক্ষম, সে-ই হলো মন।

অনেকেই প্রচলিত ধর্মাচারণকেই 'আধ্যাত্মিকতা' বলে, মনে করে থাকেন। কিন্তু তা' প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নয়। অন্ধবিশ্বাস--- অন্ধ-অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে, সজাগ-সচেতনভাবে খোলা মনে যুক্তিপথ ধরে আত্ম-জ্ঞান-- আত্ম-উপলব্ধি-- আত্মবিকাশ লাভের জন্য অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

আমরা মূলত আধ্যাত্বিক অস্তিত্ব। বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর মন থেকে সৃষ্টি হওয়া, বিশ্বাত্মার মানস সন্তান স্বরূপ--- ভার্চুয়াল অস্তিত্ব (সৃষ্টিতত্ব দ্রষ্টব্য)। মন থেকেই উৎপত্তি এবং প্রধানত মন সম্পন্ন অস্তিত্ব। আমাদের সমস্ত (মানসিক) কার্যকলাপই আধ্যাত্মিকতা। আমাদের সমস্ত কাজকর্মের পিছনেও রয়েছে আধ্যাত্মিকতা।প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মানসিকতা আর আধ্যাত্মিকতা প্রায় সমার্থক। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে, মানসিকতা বা মানসিক সক্রিয়তা থেকে আধ্যাত্মিকতা কথাটি অনেক বেশি অর্থবহ। আধ্যাত্মিকতা--- প্রধানত আত্মজিজ্ঞাসা, আত্ম-অন্বেষণ, আত্ম-উপলব্ধি, আত্মবিকাশ এই সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আমরা যা কিছুই করিনা কেন, যা-ই ভাবিনা কেন, সবকিছুর পেছনেই--- আমাদের জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতসারে কাজ করছে--- সেই আদি প্রশ্ন--- আদি উদ্দেশ্য। 'এটা চাই' --- 'ওটা চাই' বলে, কতো কিছুর পিছনেই না ছুটে মরছি আমরা। কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত--- সন্তুষ্ট হতে পারছি না। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যা চাই--- সেই অমূল্য রতন--- 'আত্মজ্ঞান' যতক্ষণ পর্যন্ত না লাভ করছি, ততক্ষণ এই চাওয়া আর ছোটার পালা চলতেই থাকবে।

আত্মজিজ্ঞাসা--- আত্ম-অন্বেষণ হলো আধ্যাত্মিকতার প্রথম কথা। আমি কে--- আমি কেন--- আমি কোথা হতে এসেছি, এবং কোথায় আমার গন্তব্য, এই মহাবিশ্ব-সৃষ্টির শুরু কোথায় এবং এর অন্তিম লক্ষ্য-ই বা কী---? এই নিয়েই আধ্যাত্মিক জগত। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আর প্রচলিত বা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা এক জিনিস নয়। 'কে আমি---?' এই হলো প্রকৃত অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ। এবং তার অন্তিম লক্ষ্য হলো--- 'একত্ব'। চেতনার ক্রমবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে গেলে, স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশ অশরীরী আত্মা, উচ্চ থেকে উচ্চতর চেতন স্তরের সত্তা বা আত্মা, দেব-চেতন আত্মা, ---ক্রমে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বরাত্মার সাক্ষাৎ ঘটবে এই পথে। বিকশিত হতে থাকবে একে একে ক্রমোচ্চ চেতন-স্তরের মনগুলি (বিকাশমান মনোপদ্মের ডায়াগ্রাম দ্রষ্টব্য)।

যদিও মন বা আত্মা-ই অধ্যাত্ম জগতের প্রধান কেন্দ্র, তবুও মনের মধ্যে--- আমিত্ববোধকারী যে সত্তা বা অংশটি রয়েছে, সেই 'আমি' বা 'অহম' আকারধারী অংশটিই হলো আধ্যাত্মিকতার মূল কর্তা। আত্মসচেতন তথা 'আমি' সম্পর্কে সজাগ-সচেতন সেই অংশটি, যে চিন্তা করে--- অনুভব করে, এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে 'মন' ও 'চেতনা' সম্পর্কিত অন্যান্য প্রবন্ধ গুলি পড়তে হবে।

নিজের স্বরূপ--- নিজের প্রকৃত রূপ বা অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছাই হলো আধ্যাত্মিকতা। ক্রমশ ব্যক্তি 'আমি' থেকে মহা 'আমি', অতঃপর আদি 'আমি' সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐকান্তিকভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠাই হলো প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

মনে রাখতে হবে, বর্তমানে আমাদের সক্রিয় মন (সচেতন ও অবচেতন মন) দুটি-ই সমগ্র মন নয়। সমগ্র মনটি হলো অনেকটা বিকাশমান পদ্মফুলের মতো। সেখানে রয়েছে অনেকগুলি অংশ এবং অনেকগুলি মনোবিকাশের ধাপ বা পর্যায়। অনেকগুলি মনোস্তর সম্বলিত এই মনোপদ্ম--- বিকাশের বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, একের পর এক, ধাপে ধাপে (মনো) বিকাশ ঘটে থাকে তার।

অস্ফূট চেতন-স্তরের মন থেকে, ক্রমশ কীট-চেতন-মন, তারপর সরিসৃপ-চেতন-মন বিকশিত হয় ক্রমে ক্রমে। মনোরূপ পদ্মের বিকাশমান পাঁপড়িগুলির পরবর্তী বিকাশ পর্যায় হলো--- পশু-চেতন- মনোস্তর। তারপরে বিকশিত হয়--- প্রাক মানব-চেতন- মন, এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে বর্তমান মানব-চেতন বা সচেতন মনের বিকাশ ঘটে। ক্রমশ অতিচেতন বা মহামানব-চেতন, ক্রমে দেব-চেতন, মহাদেব-চেতন প্রভৃতি স্তর গুলির বিকাশ ঘটতে থাকে একের পর এক। বোঝায় সুবিধার জন্য পূর্বোক্ত কয়েকটি নামে বিভিন্ন চেতনস্তরের মনের উল্লেখ করা হলেও, এর মধ্যেও রয়েছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু মনোস্তর। আরো বিশদভাবে জানতে 'মহাবাদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শেষ পর্যায়টি হলো ঈশ্বর-চেতন মনোস্তর--- বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর মন। যদিও অন্তিমে আরও একটি পর্যায় আছে। যখন মনো-পদ্মের সমস্ত পাঁপড়িগুলি ঝরে গিয়ে--- থাকে শুধু বীজ সমন্বিত অবশিষ্ট অংশটি (পুনরায় সৃষ্টির জন্য) ---সেই হল আদি-চেতন-মন (সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলা হয় ব্রহ্ম) বা পরমাত্মা।

যে এই বহির্জগৎ সহ তার মন ও তার অন্তর্জগৎ সম্পর্কে সচেতন---অবগত, এবং সেই সাথে বিশ্বাত্মা--- মহা বিশ্বমন সম্পর্কেও সচেতন, সেই হল যথেষ্ট অধ্যাত্ম সচেতন মানুষ।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস নির্ভর নয়। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা অলৌকিকতার পিছনে ছোটা নয়। অনেক মানুষই মনে করে, ঈশ্বরের পূজা--- উপাসনা--- প্রার্থনা এবং যাবতীয় ধর্মীয় কার্যকলাপই হলো আধ্যাত্মিকতা। অনেকে মনে করে, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা--- অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য সুলুক-সন্ধান জানা এবং সেই পথে সাধন করাই হলো আধ্যাত্মিকতা।

মানব-চেতন বা সচেতন মনের কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নেই, আছে যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ বিজ্ঞান-মনস্কতা। অবচেতন মনের কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকলেও তা' অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নয়। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হলো--- সচেতন মন বা মানব-চেতন মনের পরবর্তী ক্রমোচ্চ চেতন-স্তরের মন গুলি। যারা মানব চেতনা মনের যথেষ্ট বিকাশের পর থেকে, একে একে ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে। কারো মধ্যে পরবর্তী উচ্চ চেতন মনের কিঞ্চিৎ বিকাশ বা স্ফূরণ ঘটতে দেখা গেলে, বুঝতে হবে তা ব্যতিক্রমী ঘটনা। এ' হলো, পরবর্তী সময়ে বিকাশযোগ্য মনটি তার অস্তিত্বের সংকেত পাঠাচ্ছে। এখন, আগের কাজ আগে করতে হবে। মানব মনের বিকাশ না ঘটিয়ে, পরবর্তী উচ্চ চেতন মনের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়।

বস্তুত, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আর প্রচলিত--- তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা অনেকাংশেই ভিন্ন। এবং প্রচলিত আধ্যাত্মিকতার পথে চলা, আসলে ভুল পথে চলা। এই কারণেই, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক মানব বিকাশমূলক মৌলিক ধর্মের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। যে ধর্ম মানুষকে শিশু-চেতন স্তরে আবদ্ধ না রেখে, মিথ্যার পিছনে না ছুটিয়ে, সরাসরি মানব-মনের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে, এবং মানুষের কাছে প্রকৃত সত্যকে উন্মোচিত

করে--- সেই সত্যে পৌঁছানোর পথ প্রদর্শন করবে। আমাদের সেই চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে তুলতে, সময়ের প্রয়োজনে---'মহাধর্ম' মানবধর্মের সূচনা হয়েছে আজ। জয়, মানব ধর্ম--- মহাধর্ম-এর জয়।

## প্রকাশকের নিবেদন

একটি অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম— প্রকৃত মানব-বিকাশের জন্য।

আজ আপনাদেরকে মানবধর্ম ভিত্তিক আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক তথা মানববিকাশ মূলক যুগান্তকারী একটি নতুন ধর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছি। যুগসন্ধিকালের এই তীব্র সংকটাবস্থায়, মনুষ্যকৃত অধিকাংশ জটিল সমস্যার মূল— অজ্ঞানতা-অন্ধত্বকে দূর করে, আমাদের আত্মবিকাশমুখি মৌলিক ধর্ম— মানবধর্মকে পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, সময়ের চাহিদামতোই, আত্মপ্রকাশ করেছে একটি নতুন ধর্ম। ধর্মটির নাম — মহাধর্ম।

## বিমূর্ত মানব ধর্মের মূর্ত রূপই হলো 'মহাধর্ম'

একটি আলোকোজ্জ্বল নতুন যুগ আনয়নকারী মহা বৈপ্লবিক ধর্ম হলো 'মহাধর্ম'। বাস্তবিক মানব বিকাশের এক অতুলনীয় ধর্ম।

জ্ঞান পথের 'মানবধর্ম' ভিত্তিক এই ধর্ম মানুষের আদি অকৃত্রিম মৌলিক ধর্ম। অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত এই ধর্ম কোনো প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই ধর্মে ঈশ্বর উপাসনা, প্রার্থনা, এবং প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠানের মতো কোনরকম ধর্মকর্ম বা ধর্মানুষ্ঠান নেই, আছে মানবজীবনের মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে মনবিকাশের অনুশীলন।

মহাধর্ম এর মন-বিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এর  পথ ধরেই প্রকৃত মানববিকাশ এবং শান্তি স্থাপনা সম্ভব হবে।

এই মহান বৈপ্লবিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হোন। নিজের এলাকায় সংগঠন গড়ে তুলুন এবং নিয়মিতভাবে আত্ম-বিকাশ চর্চা শুরু করুন।

এই ধর্ম প্রচলিত ধর্মগুলির মতো অন্ধবিশ্বাস এবং ঈশ্বরারাধনা ভিত্তিক ধর্ম নয়। 'মহাধর্ম' হলো বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপ— প্রকৃত মানব বিকাশমূলক ধর্ম। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে, সচেতনতার আলোকে জগতকে আলোকময় করে তুলতেই মানবধর্ম— মহাধর্ম-এর আবির্ভাব। ইন্টারনেট তথা সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধর্মমত প্রায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আত্মবিকাশকামী যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তক অনেক মানুষই ক্রমশ এই ধর্মের ভক্ত ও অনুসরণকারী হয়ে উঠেছেন। এই ধর্মের প্রবক্তা হলেন— মহর্ষি মহামানস।

মানব ধর্ম— হলো মানুষের প্রকৃত ধর্ম— আদি ধর্ম। আত্ম-বিকাশের ধর্ম। আমরা সেই মানবধর্মকে ভুলে গিয়ে, নানারূপ ধর্ম ও অধর্ম নিয়ে অজ্ঞান-অন্ধের মতো মোহাচ্ছন্ন হয়ে মেতে আছি। চারিদিকে একটু সচেতন দৃষ্টিতে তাকালেই দেখা যাবে— দিনকে দিন ক্রমশ ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। আজকের এই ঘোর সঙ্কটকালে— এই সর্বনাশা করুণ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে, অবিলম্বে মানবধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে, মানবধর্ম অনুশীলন করতে হবে আমাদের। প্রতিটি মানুষের প্রধান কর্তব্য হলো প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা। পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য অনুশীলণীয় ধর্মই হলো— 'মহাধর্ম'।

মানবধর্ম মানে শুধু সৎ ও সহৃদয়— সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠাই নয়, মানবধর্ম হলো পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য অবশ্য পালনীয় ধর্ম। একজন বিকশিত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সৎ ও সহৃদয়— সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন। মানবধর্ম অনুশীলনের মধ্যদিয়েই প্রকৃত মানব-বিকাশ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। মানবজীবনে এক শুভ-পরিবর্তন আসছে মানবধর্ম— মহাধর্ম-এর পথ ধরে।

মহাধর্ম হলো— মানবধর্ম ভিত্তিক অন্ধ-বিশ্বাসমুক্ত মানব-বিকাশমূলক অধ্যাত্মিক-বিজ্ঞান অনুসারী যুগোপযোগী ধর্ম। মহাধর্ম হল— এ'কালের মহা বৈপ্লবিক উত্তাল তরঙ্গ— প্রকৃত মানব বিকাশের জন্য। এ'হলো অত্যুৎকৃষ্ট (সুস্থ—শান্তিপূর্ণ ও যথেষ্ট বিকশিত) জীবন লাভের শ্রেষ্ঠ পথ। মহাধর্ম গ্রহন করতে, এবং দিকে দিকে সংগঠন গড়ে তুলতে, মুক্তমনের সত্যপ্রেমী যুক্তিবাদী আত্ম-বিকাশকামী জ্ঞানপথের উদ্যোগী মানুষদের আহ্বান জানাই।

চতুর্দিকে মানবকেন্দ্রিক যত অশান্তি, যত সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশ ভয়ানক রূপ ধারণ করতে চলেছে, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ হলো— জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। আর, এর একমাত্র সমাধান হলো— সার্বিকভাবে 'মহাধর্ম' অনুশীলন।

শরীর ও মনের সুস্থতাসহ মনোবিকাশ এবং সার্বিক উন্নতি লাভের জন্য ‘মহাধর্ম' গ্রহন করুন, এবং আত্ম-বিকাশ-যোগ অনুশীলন করুন। পূর্বের ধর্ম ত্যাগ না করেও মানবধর্ম— ‘মহাধর্ম গ্রহণ করা যাবে। এই ধর্ম প্রচলিত ধর্মের মতো নয়। মানুষকে সচেতন ও সুস্থ করে তোলাই এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

মানবধর্ম অনুশীলনের মধ্যদিয়েই প্রকৃত মানব-বিকাশ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। মানবজীবনে এক শুভ পরিবর্তন আসছে— মহাধর্ম-এর পথ ধরে।

প্রতিদিন সারা পৃথিবী জুড়ে অত্যন্ত মর্মাহতকর মনুষ্যকৃত যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, এবং মানুষের যে বিকৃত— বিকারগ্রস্ত— উন্মাদপ্রায় রূপ আমরা অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ ক'রে চলেছি, ধর্ম—রাজনীতি—প্রশাসন প্রভৃতি প্রচলিত কোনো ব্যবস্থা/ সিস্টেম-ই তার প্রতিকারে সক্ষম নয়।

আজকের এই ঘোর সঙ্কটকালে— এই ঘোর দুর্দিনে, আগামী সর্বনাশা পরিণতি থেকে— একমাত্র আধ্যাত্মিক বিপ্লবই আমাদের রক্ষা করতে সক্ষম। তবে আশার কথা, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার এক প্রবল ঢেউ নেপথ্যে বর্ধিত হয়ে চলেছে। এবং তা' শীঘ্রই ধাবিত হয়ে আসছে। অবিলম্বে তাকে স্বাগত জানাতে হবে— আমাদের নিজেদের স্বার্থেই।

যথার্থ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে—, যথেষ্ট চেতনার অভাব এবং স্বল্প-জ্ঞান বা অজ্ঞানতাই অধিকাংশ দুঃখ-কষ্ট এবং সমস্যার প্রধান কারণ। একমাত্র, প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের শিক্ষাসহ প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে গঠিত যথার্থ ও সার্বিক আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের অনুশীলনের মধ্য দিয়েই এর সামাধান

সম্ভব। ব্যক্তি এককের বিকাশের মধ্য দিয়েই দেশের এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশ সম্ভব। আর সেই উদ্দেশ্যেই— মহাধর্ম।

মহর্ষি মহামানস-এর মহান মতবাদ— 'মহাবাদ'-ই এনেছে সেই প্রকৃত ও যুক্তিসম্মত অধ্যাত্মবাদের জোয়ার। আধুনিককালের মহাঋষি— সদগুরু মহা মানবপ্রেমিক— মহামানস-এর প্রকৃত জ্ঞান-দর্শন এবং তাঁর মহা আত্মবিকাশ পথের পথনির্দেশ-ই আমাদের প্রকৃত মুক্তির পথ। অজ্ঞানতা-অন্ধত্ব থেকে উদ্ভূত এই চরম সংকট থেকে নিশ্চিত উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এখনও সময় আছে, আমরা যদি এখনও সেই পথ অবলম্বন ক'রে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলেই শেষ রক্ষা হবে।

এখানে যাকিছু বলছি, সবই তাঁর কথা— তাঁর উপদেশ থেকে নেওয়া। শুধু তাই নয়, মহর্ষি মহামানসের 'মহাবাদ' গ্রন্থ থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে এবং ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বিভিন্ন রচনাগুলি একত্রিত করেই এই গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছে।

'মহাধর্ম' আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী ভিখারি হতে শেখায় না। সজাগ-সচেতন স্বাবলম্বী হতে শেখায়। 'মহাধর্ম' আমাদেরকে অজ্ঞান-অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে শেখায় না, বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে শেখায়।

নিজেদের তথা মানবজাতির প্রকৃত উন্নয়নে, এই মহাকর্মযজ্ঞে শরিক হোন। মহাধর্ম-এর মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার আলো চতুর্দিকে যত বেশি প্রসারিত হবে, মনের অন্ধকার— অজ্ঞান-অন্ধত্ব ততই দূর হয়ে যাবে। আমরা ততই শান্তি-সুস্থতা, আত্মবিকাশ লাভ করতে পারবো। আরও উন্নত, আরও ভালো জীবন লাভ করতে পারবো আমরা। এই মানববিকাশমূলক মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে,সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুণ এবং আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। ধন্যবাদ।

## মানব ধর্মই মহাধর্ম
### সম্পাদকের কথা

শুরুতেই, কবির একটা বাণী মনে পড়ে গেল। 'জন্মিলে মরিতে হবে— অমর কে কোথা কবে'। শুধু উদ্ভিদ আর জীব জগতেই নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই, মায় মহাবিশ্ব পর্যন্ত, যার জন্ম হয়েছে— তার মৃত্যু হবে। যার শুরু আছে— তার শেষ আছে। সৃষ্টি হলেই একসময় তার ধ্বংস অনিবার্য।

ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই এককথা। প্রচলিত সমস্ত ধর্মগুলি এক এক সময়— এক একজন বা কয়েকজনের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আবার পূর্বনির্ধারিত ভাবেই যখন যার শেষ হবার— শেষ হয়ে যাবে।

আচ্ছা? —একবারও কি আপনাদের মনে হয়না, আপনারা যে— যে ধর্ম অনুসরণ করে চলেছেন, সেই সেই ধর্মের স্রষ্টা যে বা যাঁরা— তাঁদের ধর্ম কি ছিলো?! তাঁদের পিতা— প্রপিতার ধর্ম কি ছিলো? তাঁদের পূর্বাদিপূর্ব মানুষদের ধর্ম কি ছিলো?!

একবারও কি প্রশ্ন জাগেনা? শিকড়ের সন্ধানে একবারও কি চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়না আপনাদের মনোজগতে?

হ্যাঁ, তখনো ধর্ম ছিলো। আমরা আমাদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তা' অনুসরণ করে এসেছি। তা' হলো— আত্ম-বিকাশমূলক ধর্ম— মানব ধর্ম। মানুষ সৃষ্টির সাথেসাথেই ঈশ্বর (বিশ্বাত্মা) তথা জাগতিক ব্যবস্থাই এই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। যতদিন মানবজাতি থাকবে— মানবধর্মও থাকবে ততদিন।

এই সাধারণ কথাটা আমাদের অবোধ মন কিছুতেই বুঝতে পারেনা, বুঝতে চায়না! আরে! ঈশ্বর সৃষ্ট ধর্ম —এত প্রকারের — এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হবে কেন?! বিভিন্ন চেতন-স্তরের জন্য বিভিন্ন ধর্ম হলে, তাও একটা কথা ছিলো। ঈশ্বর সৃষ্ট ধর্ম তো সর্বত্র একই হবে! এক এক জায়গায় এক এক রকমের হবেনা। আর, তা' হবে আত্ম-বিকাশ মূলক —মানব-উন্নয়ন মূলক ধর্ম।

একবারও কি কখনো প্রশ্ন জেগেছে মনে— যে ঈশ্বরকে নিয়ে আমরা এতো মাতামাতি করি, এতো যার উপাসনা করি— যার কাছে দিন-রাত প্রার্থনা করি—, সেই ঈশ্বরের ধর্ম কী?

ঈশ্বরের ধর্মও সেই আত্ম-বিকাশের ধর্ম— 'মহাধর্ম'। মানুষের ক্ষেত্রে তাকেই আমরা বলি, মানরধর্ম। মানব চেতন-স্তরে এই মানব ধর্মই— মহাধর্ম। আত্ম-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়— বিভিন্ন স্তর আছে। প্রতিটি স্তরের ধর্মের মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন, শৈশবের ধর্ম, কৈশোরের ধর্ম, যৌবনের ধর্ম প্রভৃতি। আত্ম-বিকাশ জীবন তথা মহাজীবনের মূল কথা হলেও, প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে মাত্রাগত ও আচরণগত পার্থক্য রয়েছে।

আমরা— কীট-চেতন-স্তর, পশু-চেতন-স্তর, আদিম-মানব-চেতন-স্তর প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এসে এখন মানব-চেতন-স্তরে উন্নীত হয়েছি। যে পর্যায়ের যে ধর্ম— যে কাজ, তা' শেষ করতে না পারলে, আমরা ঊর্ধতন স্তরে পৌঁছাতে পারবো না। নিম্ন-চেতন-স্তরগুলোতে আছে— দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা —শোক-সমস্যা-হতাশা! যত উচ্চ-চেতন-স্তরে উন্নীত হব, ততই এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি ঘটবে আমাদের।

এইভাবে, ধাপে ধাপে আমরা দেব-চেতন—, মহাদেব-চেতন-স্তর, ক্রমে ঈশ্বর-চেতন-স্তরে উপনীত হবো। বাঘের বাচ্চাতো বাঘই হবে! ঈশ্বরের সন্তান ধাপে ধাপে একসময় ঈশ্বর হয়ে উঠবে! আমাদের জীবনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এটাই। পূর্ণ বিকাশলাভ। এই লক্ষ্য কারো কারো কাছে স্পষ্ট, কারো কারো কাছে নয়। আগামী স্তরগুলিতে পৌঁছাতে হলে, আমাদেরকে পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে হবে সবার আগে। তার জন্য করণীয় যা, —তা-ই হলো মানবধর্ম। এই মানবধর্মই— 'মহাধর্ম'।

হাজার হাজার বছর পূর্বে, যখন অধিকাংশ মানুষের চেতনা ছিলো খুবই কম, তখনকার দিনের অপেক্ষাকৃত উন্নত চেতন-স্তরের কিছু মানুষ— সেই সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং তখনকার মানুষের বোধশক্তি— চেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি সাপেক্ষে— তখনকার মানুষের প্রয়োজন বোধ করে, তাদেরকে সমাজবদ্ধ এবং উন্নত করে তুলতে, সৎ ও সুস্থ করে তোলার উদ্দেশে, বিভিন্ন জন — বিভিন্ন স্থানে ( তাঁদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে) তখনকার কালোপযোগী বিভিন্ন ধর্মের জন্ম দিয়ে ছিলেন। যা তখনকার সময়ের প্রেক্ষাপটে হয়তো সঠিক ছিলো। পরবর্তীকালে, সেই ধর্ম— কিছু স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের কবলে পড়ে— সে নিজেই হয়েছে ধর্মচ্যুত।

তারপর কেটে গেছে বহু সময়। বিজ্ঞানের পথ ধরে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে আমাদের জীবনে। ক্রমশই গতি বেড়েছে। গরুরগাড়ি থেকে মোটরগাড়ি, তারপর একে একে গতি বাড়তে বাড়তে ইন্টারনেটের যুগে রকেটের গতি এসে গেছে আজ মানব জীবনে। আমাদের একটা বড় অংশের চেতনাও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক, বিশেষতঃ

নতুন প্রজন্মের। কিন্তু আমাদেরকে গাইড করার মতো— দ্রুত মনোবিকাশ— আত্ম-বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করার মতো সময়োপযোগী কোনো ধর্ম নেই আমাদের সামনে।

প্রচলিত ধর্ম পড়ে আছে প্রায় সেই আদিম অবস্থাতেই। আমরা পড়ে আছি সেই তিমিরেই। ওপরে ওপরে কিছুটা আধুনিকতার রঙ লাগলেও, অন্ধ-বিশ্বাসের কালো পট্টি এখনো আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছে। আমরা এখনও ঘুরে মরছি— অজ্ঞান-অন্ধের মতো, এক তীব্র মোহের ঘোরে। এই অজ্ঞানতার ঘোর থেকে— এই অন্ধত্ব থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইলে— মুক্তি পেতে চাইলে, চোখ মেলে সত্যকে উপলব্ধি করতে চাইলে, জীবনে প্রকৃত সুখ-শান্তি-আনন্দ ও সুস্থতা লাভ করতে চাইলে, আমাদের মৌলিক ধর্ম— মানবধর্মকে বরণ করে নিতে হবে, তাকে গ্রহন করতে হবে সর্বাত্মকরণে।

আজকের দিনে চাই— আজকের মানুষের উপযোগী ধর্ম— যুগোপযোগী ধর্ম— মানবধর্ম। সেই চিরন্তন ধর্ম— যা এতকাল আমরা বিস্মৃত হয়ে ছিলাম।

হাজার হাজার বছর ধরে অজ্ঞান—অসহায় মানুষ অন্ধ-বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্মের অধিনস্থ হয়ে আসছে। এই সুদীর্ঘকালের ধর্ম-শিক্ষার মানুষের ওপরটাতে মেকী সভ্যতার চাকচিক্য— ধর্মীয় ভেক বা ভন্ডামোর ছাপ পড়েছে শুধুমাত্র, অন্তরের অন্ধকার ঘোঁচেনি এতটুকুও। অধিকাংশ মানুষ যে তিমির সেই তিমিরেই রয়ে গেছে আজও। স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা কুক্ষিগত প্রচলিত ধর্ম মানুষের সচেতন মনের বিকাশ ঘটাতে চায়নি কোনদিনই।

প্রচলিত ধর্ম ও রাজতন্ত্র (বর্তমানে রাজনীতি) উভয় উভয়ের স্বার্থে —একে অপরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। মেকী মানবসভ্যতার অন্যতম ভিত্তি স্বরূপ শক্তিশালী তিনটি স্তম্ভ হলো— ধর্ম, রাজতন্ত্র আর বৈশ্যতন্ত্র। এরা পারতপক্ষে (কম-বেশি) প্রত্যেকেই মানুষকে অজ্ঞান-অন্ধ ক'রে রাখতে, তাদের খুশিমতো মানুষকে ব্যবহার করতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে বদ্ধপরিকর। মানব মনের যথেষ্ট বিকাশ —এদের কাম্য নয়।

এককালে, আদিম মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, তাদেরকে সমাজবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তুলতে, প্রচলিত ধর্মের প্রয়োজন ছিল হয়তো। কিন্তু সময়ের সাথেসাথে তা' সময়োপযোগী না হয়ে ওঠায়, বরং দুষিত ও বিকৃত হয়ে ওঠায়, এখন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে অনেকাংশে। অন্ধ-বিশ্বাস ভিত্তিক প্রচলিত ধর্ম মানুষকে কখনোই প্রকৃত জ্ঞানের পথে— সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হতে সাহায্য করেনা।

কিছু স্বার্থান্ধ-কুচক্রী মানুষ— তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে, অন্যান্য সাধারণ মানুষকে মানবধর্ম— আত্ম-বিকাশের স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত ক'রে— ভুল পথে চালিত করার ফলেই আজ মানুষের এই দুরাবস্থা। সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেও মানুষের যথেষ্ট চেতনার বিকাশ ঘটেনি এই কারণেই।

অধিকাংশ প্রচলিত ধর্ম— সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষকে ভুল পথে চালিত করে আসছে। মানুষ তার প্রকৃত ধর্ম— মানবধর্ম ভুলে গিয়ে— বংশানুক্রমে এই ধর্মেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাকে তার মূল ধর্ম— আত্ম- বিকাশমূলক ধর্মে ফিরিয়ে আনতে, তাকে সচেতন করে তুলতে, মানবধর্ম— মহাধর্মকে আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

আজ চারিদিকে যে ভীষন অসুস্থতা— অরাজকতা, বিকার-বিকৃতি, যে তমসাচ্ছন্ন ঘোর সঙ্কট পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা' অনেকাংশেই এই সব ধর্মের গর্ভে সৃষ্ট। ধর্ম নিজেই যদি অজ্ঞান-অন্ধ —দুষিত —অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত হয়, তার অধীনস্থ মানুষ ভাল হয় কী করে! দু-একজন ব্যতিক্রমী মানুষকে নিয়ে আহ্লাদিত হলে হবেনা!

সারাবিশ্বে যত গন্ডগোল— যত সমস্যা— সঙ্কট, তার অধিকাংশের জন্যই দায়ী হলো— বিশ্বাস বা অন্ধ-বিশ্বাস। যে ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে আমার সম্যক জ্ঞান নেই, স্পষ্ট ধারণা নেই, সেই ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা বা কল্পনাকে 'সত্য' বলে— নিশ্চিতভাবে মনে স্থান দেওয়াই হলো— বিশ্বাস বা অন্ধ-বিশ্বাস। এ' যে কত বিপদজনক —কী মারাত্মক, তা' একটু সজাগ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালেই বোঝা যাবে। বোঝা না গেলে, —সে-ও হবে ঐ অন্ধ-বিশ্বাসের কারণেই। জ্ঞানী মানুষ মাত্রই তাদের ধারণা—বিশ্বাস ও জ্ঞানকে আপাতসত্য বলে মনে ক'রে থাকেন। আর, একজন অন্ধ-বিশ্বাসী তার বিশ্বাসকেই পরম সত্য বলে মনে করে।

পুরস্কারের লোভ আর শাস্তির ভয় দেখিয়ে পশুকে এবং পশুতুল্য নিম্নচেতন-স্তরের মানুষকে নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়। একটু জ্ঞান-চক্ষু ফুটলে— সচেতন মনের একটু বিকাশ ঘটলেই— সে মানুষ তখন আর ওসব বুজরুকির দ্বারা কারো নিয়ন্ত্রণে থাকেনা। তাই, অধিকাংশ প্রচলিত ধর্ম ও ধর্ম-ব্যবসায়ীগণ চায়না মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটুক। স্বর্গলাভ— পূণ্যলাভ প্রভৃতি পুরস্কারের লোভ আর নরকাদি শাস্তির ভয় দেখিয়ে, অলৌকীক কাহিনী আর আজগুবি দার্শনিক তত্বে ভুলিয়ে— মানুষকে অজ্ঞান-অচেতন করে রাখতেই সে বেশি আগ্রহী।

সারা পৃথিবীজুড়ে— মানবজগতে যে কঠিন সমস্যা চলছে, যে ঘোর সংকট বর্তমান, ধর্ম-রাজনীতি —শাসন ব্যবস্থার পক্ষে তার সমাধান সম্ভব নয়। তা' যদি সম্ভব হতো, —তাহলে এই নিদারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টিই হতো না আজ। একমাত্র, যুক্তিসম্মত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের পথে— প্রকৃত আত্ম-বিকাশ কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই এর সমাধান সম্ভব। অনেকেই মানবধর্মের মূল বিষয়টি ভালভাবে না বুঝে— নিজের নিজের ধর্মকেই মানবধর্ম বলে থাকেন। শুধু মানবধর্ম —্মানবধর্ম বলে, সোর মচালেই হবেনা, মানবধর্ম কী তা' জানতে হবে, —তাকে অনুসরণ করতে হবে।

আজকের এই করুণ পরিস্থিতিতে মানবজাতিকে রক্ষা করতে, চাই— প্রকৃত 'মানবধর্ম'-এর অনুশীলন। যে ধর্ম মানুষকে মিথ্যার পিছনে না ছুটিয়ে— ছোটাবে 'পূর্ণ বিকশিত মানুষ' হয়ে ওঠার লক্ষ্যে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে সে-ও একটু একটু করে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে! এখন, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে আমাদের নিজেরদের স্বার্থেই।

যুগ যুগ ধরে বহু মনীষীই আমাদের বলেছেন— 'মানুষ হও'... 'মানুষের মতো মানুষ হও'... 'প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠো'... কিন্ত, কি উপায়ে যে যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা যাবে, —তার হদিশ নেই কোথাও।

যে সব পথ অনেকে দেখিয়ে গেছেন, সে সব পথে যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা যাবেনা কোনও দিনই। তা' যদি হতো— তাহলে দেশের তথা পৃথিবীর চেহারাটাই পালটে যেতো।

এখানে উল্লেখ্য, মানুষ হওয়া মানে শুধু মানব দরদী হওয়াই নয়, মানুষ হওয়ার অর্থ হলো— মানব-মনের যথেষ্ট বিকাশ সাধন।

আজ, মানুষ গড়ার প্রকৃত দিশা দেখিয়েছেন আমাদের সদগুরু— মহর্ষি মহামানস তাঁর আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে। এ'-ই হলো প্রকৃত আত্ম-বিকাশ লাভের পথ। মানবধর্মই মহাধর্ম।

বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবধর্ম— মহাধর্ম-ই একমাত্র উপায়। বিশ্বজুড়ে মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে, তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

*এই লেখাটি মহর্ষি মহামানস-এর একটি বক্তৃতার সারসংক্ষেপ।

একজন সন্ন্যাসী ভক্তের অবদান

একজন মানুষ রূপে, আমরা প্রত্যেকেই একটি সহজ ধর্ম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে থাকি, তা' হলো~ মানবধর্ম। কিন্তু সমাজ-সংসার সেই মানবত্বলাভ মুখী স্ব-বিকাশমূলক স্বাভাবিক ধর্ম থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করে--- বিপথগামী ক'রে, কোনো একটি বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্ম নামক অধর্ম আমাদের উপর আরোপ ক'রে বা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে, আমরা স্বতঃস্ফূর্ত মনোবিকাশের পথ থেকে সরে এসে অন্ধের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি।

এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে চলতে চলতে আজ আমরা মানবজীবনের মূল লক্ষ্য~ পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্য থেকে বহুদূরে সরে এসেছি। এতদিনে স্বাভাবিকভাবে যতটা মনোবিকাশ তথা মানববিকাশ হওয়ার ছিল, তার কিয়দংশ বিকাশও হয়ে ওঠেনি আজ।

ক্রমশ আত্মবিকাশ লাভের মধ্য দিয়ে মানবত্ব লাভের উদ্দেশ্যে --- বিস্মৃতপ্রায় মানবধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, মানুষকে তার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে, সময়ের চাহিদা মতো আত্মপ্রকাশ করেছে~ 'মহাধর্ম'। বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপই হলো~ মহাধর্ম।

একে সঠিকভাবে বুঝতে হলে, পূর্বলব্ধ সংস্কার --বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে, প্রচলিত ধর্ম-- শাস্ত্র-- মত এবং বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তির সঙ্গে তুলনা না করে, নিরপেক্ষ যুক্তি-বিচারসহ মুক্তমন নিয়ে সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এ'হলো বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ।

এখানে একটা কথা উল্লেখনীয়, সহজ-প্রবৃত্তি এবং সহজ-ধর্মের সঙ্গে কিছু নীচ প্রবৃত্তি, কিছু আদিম বা পাশবিক বা প্রাক-মানব ধর্মও আমরা জন্মসূত্রে লাভ করে থাকি। এখন, সেগুলিকে অনিষ্টকর অবদমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবদমিত করে নয়, সঠিক শিক্ষা ও চিকিৎসার মাধ্যমে, এবং জ্ঞান ও চেতনার আলোকে— সেইসব অন্ধকার অংশগুলিকে আলোকিত করে তুলতে হবে।

যা সম্ভব হয়ে ওঠে, মানবধর্মের পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে থাকা সত্যদ্রষ্টা মানুষের লব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও উপদেশ লাভের মাধ্যমে। তাঁদের উদ্ভাবিত কিছু বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে। এ-ও মানবধর্ম তথা মহাধর্ম-এরই একটি অংশ। বিশ্বাস ভিত্তিক এবং প্রতারণামূলক ধর্ম পথে এটা কখনোই সম্ভব নয়।

* মহর্ষি মহামানসের 'মানবধর্ম আসলে কী' বক্তৃতার প্রথম অংশ নিয়ে এই ভূমিকাটি প্রস্তুত হয়েছে। ~স্বামী ভূমানন্দ

## মানুষ হওয়া বলতে কী বোঝায়!

মনীষীরা যখন আশীর্বাদ ক'রে বলেন, —'মানুষ হও', তখন তাঁরা কি শুধু খেয়ে-প'রে বড় হওয়ার কথা বলেন? —একবারও ভেবে দেখিনা আমরা। অনেকের বক্তব্য, —মানুষ আবার কি হবো, আমরা তো মানুষই!

আসলে, এই মানুষ হওয়া বলতে বোঝায়, —যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হওয়া। অর্থাৎ যথেষ্ট বিকশিত মনের মানুষ হওয়া। আত্মবিকাশের অর্থ হলো— মনোবিকাশ। 'মনের বিকাশ' —ব্যাপারটা নিয়েও অনেকে ধন্দে আছে। কেউ কেউ ভাবে, আমাদের অনেক বয়েস হয়েছে— যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা হয়েছে, এর থেকে আবার কি বিকাশ হবে! এদের কাছে— পূর্ণবয়স্ক মানুষ আর পূর্ণবিকশিত মানুষ প্রায় সমার্থক!

বহীর্মুখী দৃষ্টি দিয়ে অন্তরের অন্ধকার—অসুস্থতা—অপূর্ণতা, অন্তরের বিকাশ বোঝা সম্ভব নয়। তার জন্য মন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সহ, মন সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হতে হবে আমাদের। মনের দিকে তাকাতে— লক্ষ্য রাখতে হবে মাঝে মাঝেই। মনেরাখতে হবে, এই মন আছে ব'লেই— আমরা মানুষ। তাই, একজন মানুষ হিসেবে, আমাদের মন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। যার মন যত বিকশিত— সে ততটাই বিকশিত মানুষ।

মানুষে মানুষে এতো পার্থক্য সৃষ্টির পিছনেও বড় কারণ হলো— আমাদের মন। বিভিন্ন চেতনস্তরের— বিভিন্ন মানসিক গঠন এবং বিভিন্ন ধরণের সংস্কার বা 'প্রোগ্রাম' সংবলিত— বিভিন্নরূপ মনের কারণেই আমরা এক একজন এক এক ধরণের মানুষ।

আমাদের এই মনের মধ্যে— বর্তমানে সক্রিয় দুটি অংশী মনের একটি হলো— অন্ধ-আবেগ প্রবণ অবচেতন মন, আর অপরটি হলো— সচেতন মন। এদের সুস্থতা এবং সচেতন মনের বিকাশের উপরেই মানুষের যাবতীয় বিকাশ— উন্নতি— সমৃদ্ধি নির্ভর করে। মানব সমাজের অধিকাংশ অসুখ-অশান্তি-সমস্যার মূলেই রয়েছে— আমাদের এই মন। অজ্ঞান-অন্ধ, অসুস্থ-বিকারগ্রস্ত মন। তাই, সুস্থ-সুন্দর —শান্তিপূর্ণ-সমৃদ্ধ জীবন লাভ করতে— নিজের নিজের মনোবিকাশ ও সুস্থতা লাভের চেষ্টার সাথে সাথে, চারিপাশের সমস্ত মানুষের মনোবিকাশ এবং মানসিক সুস্থতা ঘটাতে সচেষ্ট হতে হবে আমাদেরকে।

## ধর্ম কথা: স্বভাব ধর্ম ও আরোপিত ধর্ম

মানুষের ক্ষেত্রে ধর্ম দুই প্রকারের। একটি হলো তার স্বভাব-ধর্ম, অপরটি আরোপিত ধর্ম। আরোপিত ধর্ম হলো একটি প্রায়োগিক ব্যবস্থা, যা তার অধিনস্ত অথবা অনুসরণকারীদের উপর প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়ে

থাকে। আরোপিত ধর্ম গঠিত হয়ে থাকে, কয়েকটি বিষয় নিয়ে, যেমন--- দর্শন, নীতি, অনুশাসন, অনুশীলন, আচরণবিধি প্রভৃতি। স্বভাব ধর্মের মধ্যে থাকে, মূলত সুস্থ মানুষের সহজ ও স্বভাবগত আচরণ।

প্রচলিত আরোপিত ধর্ম হলো অজ্ঞান মানুষকে চিরকাল অজ্ঞান অন্ধ মূর্খ বানিয়ে রাখার এক সুন্দর খাঁচাকল।

ভালভাবে বাঁচার জন্য এবং সঠিকভাবে দ্রুত বিকাশলাভের জন্য এই আরোপিত ধর্মটির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এছাড়াও, স্বভাব ধর্মের মধ্যে কিছু ভালো গুণ থাকে এবং কিছু খারাপ গুণও থাকে। সেই খারাপ গুণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও আরোপিত ধর্মের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু প্রচলিত আরোপিত ধর্মগুলি-- এই দুটির কোনোটাই নয়। এই ধর্ম মানুষকে বিপথগামীই করে, বিকশিত করে না।

মানুষের এই অভাব দূর করতেই আত্মপ্রকাশ করেছে, যুগোপযোগী নতুন ধর্ম--- মহাধর্ম।

অনেকেই মানবতা বা মানবিকতা এবং মানবধর্ম এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলেন। তাই, এখানে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।
মানবতা হলো--- মনুষ্যোচিত সদগুণাবলী। অনেকের মধ্যেই এই সদগুণাবলীর কিছু অংশ প্রকাশিত, আর কিছু অংশ সুপ্তাবস্থায় থাকে।

মানবধর্ম হলো--- মানুষের স্বভাব ধর্ম। এই সুস্থ স্বভাব ধর্মের মধ্যে রয়েছে, ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা আর বিকাশ লাভের প্রচেষ্টা।

কিন্তু প্রচলিত ধর্ম মানুষের এই বিকাশ লাভের স্বভাব ধর্মকে উৎসাহিত না ক'রে, সাহায্য না ক'রে, বরং উল্টে তাকে চাপা দেওয়ার এবং মানুষকে বিপথগামী করে তোলার চেষ্টা ক'রে থাকে। ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বরের কৃপা লাভ, স্বর্গ লাভ প্রভৃতি অলীক বিষয় -বস্তুর পিছনে মানুষকে অন্ধের মতো ছুটিয়ে মারে। মুখে সত্যের কথা ব'লে, অসত্যের পিছনে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় প্রবঞ্চক প্রতারকদের মতো। একে তাই মানুষের উপযোগী ধর্ম না বলে বলা উচিত অধর্ম।

মানবিকতা মানুষের স্বভাবগুণ বা স্বভাব ধর্মের একটা অংশ হলেও, অনেক সময় অসুস্থতা, অস্বাভাবিক মানসিক গঠনের কারণে, এবং কুশিক্ষার কারণে, স্বভাব ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু খারাপ গুণও থাকতে পারে, অথবা প্রবেশ করতে পারে। ফলে, মানবিকতা রূপ সদগুণাবলীর অভাব দেখা দিতে পারে, এবং অমানবিক গুণের প্রকাশ ঘটতে পারে।

এখন, একটি উপযুক্ত আরোপিত ধর্মের দ্বারা তা' নিরাময়ের ব্যবস্থা করাই হলো আমাদের কর্তব্য। আর এই উদ্দেশ্যেই এসেছে--- মহাধর্ম।

এই আরোপিত ধর্মও কিন্তু কিছু উন্নত চেতনার মানুষ তাদের উন্নত স্বভাব ধর্ম থেকেই সৃষ্টি ক'রে থাকেন। বিকাশ বলতে, এখানে মনোবিকাশ বোঝায়। আর, বিকাশের বিভিন্ন স্তরে স্বভাব ধর্মেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়।

শুধু ধর্মই নয়, প্রায় প্রতিটি সিস্টেম বা ব্যবস্থার মধ্যেই কিছু ভালো কিছু খারাপ জিনিস থাকে।

এখন, যদি সেই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকগণ অথবা তার অধীনস্থ মানুষ--- সেই খারাপ দিকটাকে দূরীকরণের চেষ্টা না ক'রে, শুধু ভালো দিকটাকে নিয়েই গর্ব- মত্ত হয়ে থাকে, তাহলে একদিন না একদিন, সেই খারাপ অংশটা বৃদ্ধি পেতে পেতে ক্রমশ সমস্ত অংশটাকেই গ্রাস করে ফেলে। ফলস্বরূপ একসময় সেই ব্যবস্থাটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

হাজার হাজার বছর ধরে অজ্ঞান—অসহায় মানুষ অন্ধ-বিশ্বাস ভিত্তিক (আরোপিত) ধর্মের অধিনস্থ হয়ে আসছে। এই সুদীর্ঘকালের ধর্ম-শিক্ষায় মানুষের ওপরটাতে মেকী সভ্যতার চাকচিক্য— ধর্মীয় ভেক বা ভন্ডামোর ছাপ পড়েছে শুধুমাত্র, অন্তরের অন্ধকার ঘোঁচেনি এতটুকুও। মানুষ যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে আজও। প্রচলিত ধর্ম মানুষের সচেতন মনের বিকাশ ঘটাতে চায়নি কোনদিনই।

প্রচলিত ধর্ম ও রাজতন্ত্র (বর্তমানে রাজনীতি) উভয় উভয়ের স্বার্থে —একে অপরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেস্ট। মেকী মানবসভ্যতার অন্যতম ভিত্তি স্বরূপ শক্তিশালী তিনটি স্তম্ভ হলো— ধর্ম, রাজতন্ত্র আর বৈশ্যতন্ত্র। এরা পারতপক্ষে (কম-বেশি) প্রত্যেকেই মানুষকে অজ্ঞান-অন্ধ ক'রে রাখতে— তাদের খুশিমতো মানুষকে ব্যবহার করতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে বদ্ধপরিকর। মানব মনের যথেষ্ট বিকাশ —এদের কাম্য নয়।

এককালে, আদিম মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, তাদেরকে সমাজবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তুলতে, প্রচলিত ধর্মের প্রয়োজন ছিলো হয়তো। কিন্তু কালের সাথেসাথে তা' সময়োপযোগী না হয়ে ওঠায়, এখন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে অনেকাংশে। অন্ধ-বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্ম মানুষকে কখনোই প্রকৃত জ্ঞানের পথে— সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হতে সাহায্য করেনা। আজ চারিদিকে যে ভীষন অসুস্থতা— অরাজকতা, বিকার-বিকৃতি, যে তমসাচ্ছন্ন ঘোর সঙ্কট পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা' অনেকাংশেই এই ধর্মের গর্ভে সৃষ্টি। ধর্ম নিজেই যদি অজ্ঞান-অন্ধ —দুষিত —অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত হয়, তার শাসনাধীন মানুষ ভাল হয় কীকরে! দু-একজন ব্যতিক্রমী মানুষকে নিয়ে আহ্লাদিত হলে হবেনা!

সারাবিশ্বে যত গন্ডগোল— যত সমস্যা— সঙ্কট, তার অধিকাংশের জন্যই দায়ী হলো— দৃঢ় বিশ্বাস বা অন্ধ-বিশ্বাস। যে ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে আমার সম্যক জ্ঞান নেই, সেই ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে কোনো ধারণাকে 'সত্য' বলে— নিশ্চিতভাবে মনে স্থান দেওয়াই হলো— বিশ্বাস বা অন্ধ-বিশ্বাস। এযে কত বিপদজনক —কী মারাত্মক, তা' একটু সজাগ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালেই বোঝা যাবে। বোঝা না গেলে, —সে-ও হবে ঐ অন্ধ-বিশ্বাসের কারণেই। জ্ঞানী মানুষ মাত্রই তাদের ধারণা—বিশ্বাস—জ্ঞানকে আপাতসত্য জ্ঞান ক'রে থাকেন।

পুরস্কারের লোভ আর শাস্তির ভয় দেখিয়ে পশুকে এবং পশুতুল্য নিম্নচেতনস্তরের মানুষকে নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়। একটু জ্ঞান-চক্ষু ফুটলে— সচেতন মনের একটু বিকাশ ঘটলেই— সে মানুষ তখন আর ওসবের দ্বারা কারো নিয়ন্ত্রণে থাকেনা। তাই, ধর্মও চায়না মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটুক। স্বর্গলাভ—পূণ্যলাভ প্রভৃতি পুরস্কারের লোভ আর নরকাদি শাস্তির ভয় দেখিয়ে, দিব্য-চেতনার নামে আজগুবি দার্শনিক তত্ত্বে ভুলিয়ে— মানুষকে অচেতন করে রাখতেই সে বেশি আগ্রহী।

আজকের এই করুণ পরিস্থিতিতে মানবজাতিকে রক্ষা করতে, চাই— মানবধর্ম ভিত্তিক 'মহাধর্ম'। যে ধর্ম মানুষকে মিথ্যার পিছনে না ছুটিয়ে— ছোটাবে 'পূর্ণ বিকশিত মানুষ' হওয়ার লক্ষ্যে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে সে-ও একটু একটু করে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে! এখন, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে আমাদের নিজেরদের স্বার্থেই।

## ধর্ম প্রসঙ্গে নানা কথা

যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রচলিত ধর্মীয় শাসন ও শিক্ষার অধিনে থেকেও, তার যথেষ্ট মনোবিকাশ ঘটেনি এখনো। যে তিমির সেই তিমিরেই পড়ে আছে। এর চাইতে, মানুষ যদি প্রচলিত ধর্ম হতে মুক্ত থেকে, স্বাভাবিক মানবধর্ম অনুযায়ী পৃথিবীর মুক্ত-পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতো, তাহলে অনেক অনেক বেশি বিকাশলাভ করতে পারতো।

***

ধর্ম-টা ব্যক্তিগত ব্যপার, ব্যক্তি স্বার্থের ব্যপার হলে বিশেষ সমস্যা থাকেনা। কিন্তু, সেটা যখন গোষ্ঠিগত ব্যপার, গোষ্ঠীগত স্বার্থের ব্যপার হয়, এবং সেই গোষ্ঠি যদি গোড়া মৌলবাদী গোষ্ঠি হয়, তখন সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অথচ স্বাধীনচেতা বা মুক্তমনের মানুষের পক্ষে তা' সঙ্কটের কারণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ প্রচলিত ধর্মের মধ্যে থেকে, তার সেই ধর্মকে সংশোধন —পরিবর্তন করতে চায়। খুব উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হলে, কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হলেও হতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা' সম্ভব হবেনা। উল্টে প্রাণটাই যাবে।

***

দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চাও? —আগে কান্ডজ্ঞান লাভ করো! (ভক্ত ও অনুগামীদের প্রতি মহামানসের উক্তি)

যদি দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে— আগে কান্ডজ্ঞান লাভ করো। মোহ-মায়া —অজ্ঞানতা, অন্ধ-বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারবে, —তবেই মুক্তিলাভ সম্ভব হবে।

পূর্ণ বিকাশলাভই এই জীবনের অন্তিম লক্ষ্য। তার জন্য পায়ে পায়ে— সমস্ত পথ অতিক্রম করতে হবে। চেতনার পথে যত এগিয়ে যাবে, —ততই বন্ধন মুক্ত হবে, —ততই স্বাধীন হয়ে উঠবে। তবে, ফাঁকি দিয়ে— ফাঁক রেখে, কাউকে ঘুষ দিয়ে— কোনো জাদু-মন্ত্র বলে এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথ ডিঙিয়ে যাওয়ার অলীক চিন্তা কোরো না।

যে যতই প্রলোভন দেখাক না কেন, বর্তমান মানব-চেতন স্তরে কোনো ভাবেই মুক্তিলাভ— মোক্ষলাভ— দিব্যজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তাই, যথাসম্ভব মুক্তমনা হয়ে, যথাসাধ্য সজাগ— সচেতন থেকে, আত্মজ্ঞান— আত্মবিকাশ লাভে সচেষ্ট হও।

কেউ অত্যল্প অতিন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েই— নিজেকে একজন কেউকেটা ভাবছে। আবার কেউ কেউ মানুষ ঠকানোর মতো কিছু ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা, —কিছু প্রতারণা মূলক কৌশল অথবা প্রেতশক্তির সাহায্য নিয়ে— নিজেদেরকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে উপস্থাপিত করছে।

কান্ডজ্ঞান বিহিন— লোভী মানুষই প্রধানত এদের শিকার হয়। এদের মতো লোভে পড়ে, বিকাশের পথ ছেড়ে— বিপথগামী হয়োনা।

আগের কাজ আগে করো। পূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়ার আপাত লক্ষ্যে এগিয়ে যাও। তার পরের ধাপে— 'মহামানব' হও। তারপর আস্তে আস্তে দেবচেতন স্তরে উন্নীত হবে। তারওপরে 'মহাদেব' চেতনা সম্পন্ন হয়ে উঠবে, এবং ক্রমে পূর্ণ বিকাশলাভ করবে। এই উচ্চতর থেকে উচ্চতম চেতনস্তর গুলির বিকাশ ঘটবে— ভিন্ন ভিন্ন লোকে, —এই পৃথিবীতে নয়।

মনেরেখ, ঈশ্বরের এই বিধান— এই জাগতিক ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করার সাধ্য— ঈশ্বরেরও নেই। সে তুমি যতই তার পূজা— উপাসনা ও প্রার্থনা করো না কেন!

***

ঈশ্বর আছে কি নেই, থাকলে তার স্বরূপ কি —তা' যুক্তি-বিচার দিয়ে বোঝার চেষ্টা কর। অজ্ঞান-অন্ধের মতো কেন চোখ বুঁজে তা' বিশ্বাস করবে!?

মনে রেখ, যুক্তি—কারণ ছাড়া এখানে কোন কিছুই ঘটে না। ঈশ্বরকে যুক্তি-বিচারের সাহায্যে বোঝা যায় না, —একথা ঠিক নয়। তোমার যেটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে— সে টুকুই বোঝ। কল্পনার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার চাইতে তা' অনেক গুণে ভালো। কল্পনার ঈশ্বরকে নিয়ে তৃপ্ত থাকা— মুর্খের স্বর্গে বাস করার সমান।

ঈশ্বরকে তার স্বরূপে জানা—বোঝার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে, 'মহাধর্ম' পুস্তকটি তোমার কাজে লাগতে পারে। মানবধর্ম হলো মানুষের মূলগত ধর্ম। মানব ধর্মই মহাধর্ম।

## মহাধর্ম এবং অন্যান্য ধর্ম

'মহাধর্ম' হলো মানুষের মৌলিক ধর্ম— মানবধর্ম। বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপই হলো— মহাধর্ম। অন্যান্য ধর্ম হলো অন্ধ-বিশ্বাস ভিত্তিক আরোপিত ধর্ম। 'মহাধর্ম' মূলতঃ যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্ম। মানববিকাশ মূলক ধর্ম।

অন্যান্য ধর্মের লক্ষ্য— ঈশ্বরলাভ, ঈশ্বরের কৃপা লাভ, স্বর্গলাভ প্রভৃতি। মহাধর্মের অন্তিম লক্ষ্য— ঈশ্বরত্ব লাভ। তবে, ঈশ্বরত্ব লাভ হলেও, বিকাশমান চেতনার পথে— এই মানব-চেতন-স্তরে ঈশ্বরত্ব লাভ সম্ভব নয়, সে অনেক দূরের ব্যাপার, তাই, মহাধর্মমত অনুসারে এই মানব-জীবনের আপাত লক্ষ্য হলো— পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। উচ্চ থেকে ক্রমোচ্চ— আরো কয়েকটি চেতনস্তর পার হয়ে— অন্তিমে আমরা ঈশ্বর-চেতন-স্তরে পৌঁছাবো। এই জীবনে পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা— মানবত্ব লাভই এই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য।

অন্যান্য ধর্মের প্রধান ধর্ম-কর্ম হলো— নিয়মিতভাবে ঈশ্বর উপাসনা, প্রার্থনা এবং নিজনিজ ধর্মীয় রীতি-নীতি শাস্ত্র অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পন্ন করা। মহাধর্মের প্রধান ধর্ম-কর্ম হলো— যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পথে—

সচেতনভাবে মনোবিকাশ— মানববিকাশ ও সুস্থতা লাভের জন্য, এবং আভ্যন্তরিক ও জাগতিক সত্য লাভের জন্য কর্তব্য কর্ম করা। যুক্তিবাদী হয়ে— জ্ঞানের পথ ধরে সুস্থ-সমৃদ্ধ-সুন্দর জীবন লাভ করাই একজন মহাধর্মীনের লক্ষ্য, এবং তার জন্য কর্তব্য কর্মই হলো মহাধর্মের ধর্ম-কর্ম।

আপনিও কি একই পথের পথিক? আসুন, আমরা সবাই মিলে এক উন্নত পৃথিবী গড়ে তুলি।

প্রতিটি মানুষই বিকাশলাভ করে চলেছে। বিকাশলাভই মানুষের মৌলিক ধর্ম— স্বভাবধর্ম। তবে, শরীর-মনের অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, সুযোগ-সুবিধা, বাধা-বিঘ্ন-অভাব, প্রতিকূলতা, সুস্থতা-অসুস্থতা, সু বা কু শিক্ষা প্রভৃতি সাপেক্ষে কারো বিকাশ ঘটছে খুব ধীর গতিতে, আবার কারো বিকাশ ঘটছে স্বচ্ছন্দে— সঠিকভাবে। কেউ সমগ্র আয়ুষ্কালের মধ্যে অতি সামান্যই বিকশিত হতে পারছে, কেউ যথেষ্ট বিকাশলাভে সক্ষম হচ্ছে।

এই বিকাশ হলো— মনোবিকাশ— আত্ম-বিকাশ— চেতনার বিকাশ। যার ফল স্বরূপ ঘটে মানব বিকাশ।

একটা পোষ্য চারাগাছকে যেমন প্রয়োজনীয় আলো—বাতাস—জল—খাদ্য, পরিচর্যা ও সুরক্ষা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথেষ্ট বিকশিত করে তোলা হয়, মহাধর্মও তেমনিভাবে একজন মহাধর্মানুসারীর সার্বিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে থাকে। এখানেও কিছুকিছু নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি আরোপ করা হয়ে থাকে, তবে তা' করা হয়, বিকাশের প্রয়োজনে— বাধা-বিঘ্ন-প্রতিকূলতা অপসারণের জন্যে, শরীর-মনের সুস্থতা লাভের প্রয়োজনে।

অন্ধ-বিশ্বাস হলো বিকাশের পরিপন্থি। তাই, অন্যান্য ধর্ম সরাসরি মানুষের বিকাশ ঘটাতে পারেনা। তাছাড়া, যথেষ্ট বিকাশ ঘটলে মানুষ আর ধর্মের বাঁধনে বাঁধা থাকেনা, তাই, অন্যান্য ধর্ম— প্রকৃত বিকাশ ঘটুক তা' চায়না। 'মহাধর্ম' মানুষকে বিভিন্ন প্রতিকুলতা ও বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখায়।

### নাস্তিকরা কি 'মহাধর্ম' গ্রহণ করতে পারে?

নাস্তিকদের মধ্যে দুই শ্রেণীর নাস্তিক রয়েছে। যারা বলেন, জানিনা--- তাই মানিনা। ঈশ্বর অস্তিত্বের প্রমাণ পেলেই মানবো। আমারা জানতে চাই---

এরা মহাধর্ম গ্রহণ করার যোগ্য এবং অনেকেই মহাধর্ম গ্রহণ করছেন। মহাধর্মের মধ্যে যে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর সম্পর্কীত দর্শন আছে, তা' অজ্ঞান- অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে এবং গ্রহণ করতে বলিনা আমরা। এই দর্শনের বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত একে গ্রহণ করা যাবেনা।

নাস্তিকদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বর অনস্তিত্বে অন্ধবিশ্বাসী, যাঁরা অন্য কোনো দর্শনে অন্ধবিশ্বাসী হয়ে--- ঈশ্বর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকেন, তাঁরা মুক্তমনের যুক্তিবাদী মানুষ নয়। আর তাই, তাঁরা 'মহাধর্ম' গ্রহণের যোগ্য নয়। বিশেষ স্বার্থ না থাকলে, তাঁরা 'মহাধর্ম' গ্রহণ করবেও না।

এই প্রসঙ্গে আরো দু-একটা কথাঃ প্রচলিত ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে মানবধর্মে স্থিত হতে, নাস্তিক-ই যে হতে (বিশ্বাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে) হবে, এমন নয়। আর, মুক্তমনা হলেই যে, সে নাস্তিক হবে, আর নাস্তিক হলেই যে, সে

মুক্তমনা হবে, এমন নয়। নাস্তিক হলেই যে সে একজন মুক্তমনের যুক্তিবাদী মানবতাবাদী এবং যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হবে, তেমন কোনো কথা নেই।

মানবধর্মই মহাধর্ম। যার মূল কথা হলো— মানব বিকাশ

মানবদেহী বা মানবদেহধারী হলেই যে সে মানবত্ব লাভ করেছে অথবা তার আয়ুষ্কালের মধ্যেই মানবত্ব লাভ করতে পারবে, তেমন নয়। মানবত্ব লাভ হলো— পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যই হলো— মানবত্ব লাভ। একজন মানবদেহী (মানবদেহ ধারী) যে ধর্মরূপ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে মানবত্ব লাভ করতে পারে, সেই ধর্মই হলো— মানবধর্ম।

নানা মতবাদ অনুসরণ ক'রে ঈশ্বর ও স্বর্গরূপ মরীচিকার পিছনে অন্ধের মতো ছুটে চলা— মানবধর্ম নয়।

দেবত্ব এবং তৎপরবর্তী ঈশ্বরত্ব আমাদের মধ্যেই সুপ্তাবস্থায় এবং বিকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। দেবত্ব এবং ক্রমে ঈশ্বরত্ব লাভের জন্য আমাদেরকে মানবত্ব লাভ করতে হবে সর্বাগ্রে।

কর্ম ও ভোগের মধ্য দিয়ে— জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে— ক্রমশ মনোবিকাশ তথা চেতনার বিকাশ লাভ করা— আমাদের স্বভাবধর্ম। কিন্তু, আমাদের ভিতরে—বাইরে—চারিপাশে বিকাশের অনুকূল অবস্থা না থাকায়, নানা প্রতিকূলতা থাকায়, বিকাশ-উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহন —আবশ্যক হয়ে পড়ে। মানবধর্ম— মহাধর্মই হলো সেই অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা। একটা চারাগাছের সঠিক বিকাশের জন্য যেমন যত্ন-পরিচর্যা-সুরক্ষাসহ পুষ্টি ও সুস্থতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়, এ-ও ঠিক তেমনি।

মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী— বহু পথ বা মার্গ ধরে মানুষ অগ্রসর হয়ে থাকে। তার মধ্যে নিম্নগামী পথগুলি বাদ দিয়ে কর্মপথ—ভক্তিপথ—জ্ঞানপথ –এসবই মিলিত হয়েছে মহাধর্ম পথে। কর্ম ব্যতীরেকে ভক্তিপথ-জ্ঞানপথ –কোনো পথেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আবার জ্ঞানপথেও ভক্তি থাকে। সে হলো জ্ঞানের প্রতি ভক্তি— সত্যের প্রতি ভক্তি। তবে তা' অন্ধ ভক্তি নয়। অন্ধভক্তির পথ হলো নিম্নমূখী পথ –অধঃপতনের পথ।

ধর্মরূপ যে যুক্তিসম্মত পথ-পদ্ধতি ও ব্যবস্থা— একজন মানবদেহীকে মানবত্ব লাভে সাহায্য করে— তা-ই হলো মানবধর্ম। আর, এই মানবধর্মই— মহাধর্ম।

'মহাধর্ম' প্রচলিত রিলিজিয়ন, প্রচলিত ধার্মিক সিস্টেমের মতো কোন ধর্মমত নয। মহাধর্ম হলো~ মানবধর্ম। মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম এবং ঠিকমতো বিকশিত হয়ে ওঠার ধর্ম।

একজন মানুষ অনেক জ্ঞান, চেতনা ও সুস্থতা লাভের মধ্য দিয়ে অনেকটাই বিকশিত মানুষ হয়ে উঠলে, সে তখন নিজেই বুঝতে সক্ষম হয়, যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, কি তার করণীয়, কোনটা গ্রহণ করা উচিত আর কোনটা উচিত নয়। এমনকি নতুন পথও উন্মোচিত হতে পারে--- সেই সচেতন দৃষ্টির সামনে।

মহাধর্ম' তাই আমাদের কোন তত্ত্ব--- কোন দর্শন চাপিয়ে না দিয়ে, যথেষ্ট বিকাশপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে ওঠার উপরেই গুরুত্ব দেয়। পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য পালনীয় কর্মই হলো--- মহাধর্মাচারণ।

মহাধর্ম বলে, আগে নিজেকে জানো, জীবনের উদ্দেশ্য--- লক্ষ্য কি তা জানো, এবং সেই সঙ্গে জগত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করো। এই ভিত্তিমূল জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে--- চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে--- তুমি নিজেই নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারবে। কর্তব্যকর্মের মধ্যে আপাত করণীয় কিছু কর্ম আছে, ---যা তোমায় আগে করতে হবে, আর ভবিষ্যতে করণীয় কর্মগুলি ভবিষ্যতেই করতে হবে। শুধু মাথায় রাখতে হবে যে আপাত করণীয় কর্মগুলির মধ্য দিয়ে তোমাকে ভবিষ্যতে করণীয় কর্মের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

এই মহা-চেতন-সিন্ধুর তুমি হলে একটি বিন্দু স্বরূপ। যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতই জানে, একমাত্র সে-ই ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম--- তার স্বরূপ-এ (প্রকৃতরূপে)। যার আছে নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা--- ভ্রান্ত বিশ্বাস, তার ঈশ্বরও হয়, ভ্রান্ত ধারণা--- ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর গড়ে ওঠা--- এক কল্পলোকের ঈশ্বর।

তাই, নিজেকে না জেনে--- ঈশ্বরকে (তার স্বরূপে) না জেনে, ঈশ্বরলাভ--- ঈশ্বরের কৃপা লাভ--- মুক্তিলাভ বা স্বর্গ লাভের পিছনে ছুটে মরো না। বাস্তব জ্ঞানসহ প্রকৃত অধ্যাত্ম-জ্ঞান ও যথেষ্ট চেতনা লাভের মধ্য দিয়ে, এবং সর্বাঙ্গীন সুস্থতা লাভের মধ্য দিয়ে--- প্রকৃত বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠো।

একজন মানুষ হিসেবে--- পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার ধর্মই হোক তোমার ধর্ম। মহাধর্ম হলো মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম--- স্বধর্ম। যে ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ--- সার্বিক বিকাশপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হতে পারে, সেই আচরিত ধর্মই হলো মহাধর্ম।

আত্মবিস্মৃত মানুষকে তার আত্মা-স্বরূপ--- আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে স্বধর্মে দীক্ষিত ক'রে--- জীবনের মূল লক্ষ্য পানে এগিয়ে দেওয়া হলো, এই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। নিজের সাথে নিজের পরিচয় ঘটানোই এই ধর্মের প্রথম পাঠ।

এই প্রসঙ্গে সেই ব্যাঘ্রশাবকের গল্পটা উল্লেখযোগ্য:
এক গ্রামে এক পশুপালক বাস করতো। তার সেই খোঁয়াড়ে অনেক গরু ছাগল ভেড়া ছিল। প্রতিদিন সেই পশুপালক তার পোষ্যদের বনের ধারে নিয়ে যেত, ঘাসপাতা খাওয়ানোর জন্য।

একদিন সে দেখতে পায়, পথের ধারে একটা ব্যাঘ্রশাবক প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। স্নেহ-মমতা বশতঃ সে ওই ব্যাঘ্রশাবকটিকে নিয়ে এসে--- অন্যান্য পশুদের সঙ্গেই লালন পালন করতে থাকে। ব্যাঘ্রশাবকটি একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই, সে নিজেকে ওই গরু-ছাগল-ভেড়াদের মতোই একজন ভাবতে থাকে, এবং ওদের দেখাদেখি সে-ও ওদের মতোই ঘাস পাতা আহার করতে থাকে ওদের সাথে।

বনের ধারে অন্যান্য পশুদের সঙ্গে বিচরণ করতে করতে, একদিন হঠাৎ সে এক বড় বাঘের সম্মুখীন হয়। বাঘটি আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখতে থাকে। ব্যাঘ্রশাবক হয়েও, তাকে গরু-ছাগলের মতো আচরণ করতে দেখে, বাঘটি তার কাছে এগিয়ে আসে, এবং তাকে নিয়ে যায় নিকটবর্তী এক জলাশয়ের ধারে। জলাশয়ে উভয়ের প্রতিফলিত আকৃতি দেখিয়ে--- বড় বাঘটি তাকে বোঝায়, তার রূপ-জাত-ধর্ম সবই বাঘের মতো। যেসব পশুদের সাথে সে এতকাল কাটিয়েছে, মোটেই তাদের মত নয়। ওইসব পশুদের হত্যা করে খাওয়াই তার ধর্ম।

এখানে বিষয়টি হত্যা করা বা রক্ষা করা নয়, বিষয়টি হলো--- নিজের স্বরূপ -এর জ্ঞান। তুমি প্রকৃতই যা--- তোমার সেই স্ব-রূপের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো মহাধর্মের প্রথম পাঠ।

নিজেদের তথা মানবজাতির প্রকৃত উন্নয়নে, এই মহা কর্মযজ্ঞে শরিক হোন। মহাধর্ম -এর মনোবিকাশ মূলক (আত্মবিকাশ যোগ) শিক্ষার আলো চতুর্দিকে যত বেশি প্রসারিত হবে, অজ্ঞান- অন্ধত্ব- অন্ধকার ততই দূর হয়ে যাবে। আমরা ততই শান্তি-- সুস্থতা, আত্মবিকাশ লাভ করতে পারবো। আরো উন্নত, আরও ভালো জীবন লাভ করতে পারবো আমরা।

প্রত্যেক চেতনসত্তার ধর্ম~ তার চেতন-স্তরের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সব কিছু সবার জন্য নয় –সবার উপযোগী নয়। মহাধর্মের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। মহাধর্ম শুধু তাদের জন্যই, -যাদের মনোবীণার সুরের সাথে –এর সুরের, এর কম্পনাঙ্কের মিল আছে। মহাধর্মকে যাদের ভালো লাগে বা লাগবে, মহাধর্ম শুধু তাদের জন্যই। এই ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ধর্ম নয়।

বিশ্বাস প্রবণ- ধর্ম প্রবণ মানুষদের জন্য অনেক ধর্ম – অনেক ধর্মগুরু আছেন। তাদের নিয়ে মহাধর্ম বিশেষ চিন্তিত নয়। -এর বাইরে যে জগৎ আছে, -যারা আছে মাঝখানে, মহাধর্ম তাদের কথাই বেশী ভাবে। এছাড়া, মানবজাতির বয়স বাড়ছে – সেই সাথে মানবমনেরও বয়স বাড়ছে ক্রমশ। সেই বয়স্ক মন– মায়ের আঁচল তলের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেড়িয়ে এসে– এই জগতটাকে দেখতে চায় – বুঝতে চায়, –নিজেকে জানতে চায়, –মহাধর্ম মূলতঃ তাদের কথা ভেবেই।

বিভিন্ন চেতনস্তরের— মন বা চেতনসত্তার ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন— বরফের ধর্ম, জলের ধর্ম এবং বাষ্পের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তি যে চেতনস্তরে অবস্থান করছে, তার ধর্মও তদনুরূপ। যে যা করছে, সবই সে করতে বাধ্য— তাই করছে। অন্য চেতন স্তরের ধর্ম তার কাছে আশা করাই ভুল। সবাই নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী কর্ম ক'রে চলেছে।

তবু, জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে —এই ভুল আমরা অনেকেই করে থাকি। উচিত— অনুচিত, ঠিক-বেঠিক নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, বিচার-আলোচনায় মেতে উঠি আমরা। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু এই চেতন স্তরের মানুষের পক্ষে একেবারে স্বাভাবিক, –এটাই তাদের স্বভাব ধর্ম।

যুক্তিসম্মত আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক ধর্ম — 'মহাধর্ম' কখনোই কোনো ধর্মকে ছোট, কোনো ধর্মকে বড়, অথবা নিজেকে বড় বলেনা। তবে সে তার অনুগামীদের কাছে সত্যকে যথাসম্ভব উন্মোচিত ক'রে— তুলে ধরতে চেষ্টা করে। অবশ্য এতে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারে। কিন্তু এই সত্য –এই ধর্মমত তো তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তারা তাদের সত্যে —তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকুক !

আসলে, আমাদের এই সত্য —অসত্য –এসবই আপেক্ষিক ব্যাপার। আমার কাছে যা সত্য —অপরের কাছে তা' সত্য নয়। তাই, আপাত সত্যের হাত ধ'রে বিকাশের পথে— পরম সত্যের লক্ষ্যে এগিয়ে চলাই মহাধর্মীদের কাজ।

যুক্তি-বিজ্ঞানের পথ ধরেও যে ঈশ্বর উপলব্ধি সম্ভব, যুক্তি সম্মত আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হয়েও— আধ্যাত্মিক উন্নতি— আত্মবিকাশ লাভ সম্ভব, –যুক্তিবাদী —বিজ্ঞান মনস্ক —মুক্ত মনের মানুষদের কাছে তা' তুলে ধরা এবং সেই পথে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই মহাধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

যা হচ্ছে— সবই যখন ঠিক ঠিক ভাবে ঘটে চলেছে, যা হবার ঠিক তা-ই হচ্ছে, তবে আবার এর প্রয়োজন হলো কেন ? জাগতিক নিয়মেই— কালের চাহিদা মতো, অনিবার্য কারণেই এর সূচনা হয়েছে। ঈশ্বর তথা জাগতিক ব্যবস্থা না চাইলে— কিছুই সম্ভব হয়না। জাগতিক নিয়মে— সময়ের চাহিদা মতোই ধর্ম বিপ্লব সম্ভব হয় যুগে যুগে !

## মহাধর্ম সম্পর্কে আরো দু-চার কথা

মহাধর্ম বলে, আমাদের প্রতি মহাবিশ্বরূপ সৃষ্টিকর্তার আর কিছু করার নেই। সৃষ্টিকর্তার প্রতিও আমাদের কিছু করার নেই। সৃষ্টিকর্তা আমাদের কাছে আত্মবিকাশ (মনোবিকাশ) বৈ আর কিছু আশা করে না। আমরাও সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু আশা করি না।

কিছু পাওয়ার নেই, কিছু চাওয়ার নেই। তবু আছে নাড়ির টান। কোনো আশা নেই, তবু আছে তার প্রতি ক্ষোভ-অভিমান, আছে শ্রদ্ধা-ভক্তি, সহজ ভালবাসা।

সৃষ্টিকর্মে বা সৃজন কর্মে 'লাষ্ট ফিনিশিং টাচ্' দেওয়ার পর থেকে এই সৃষ্টির ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তার আর কোনো ভূমিকা নেই। সৃষ্টি চলছে জাগতিক ব্যবস্থা মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

'ভগবান ভগবান' বলে, কেঁদে মরে গেলেও ভগবান ছুটে আসবে না। ফিরে তাকিয়েও দেখবে না। ভাগ্যে যা আছে, পূর্ব নির্ধারিত মতো, তা-ই ঘটবে। তার বাইরে কিছুই হবার নয়। এটাই কঠিন সত্য।

সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে বিকাশের পথেই এগিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ---ঘটনাচক্রে, আমরা বিকাশের পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে অজ্ঞান-অন্ধকারের পাঁকে পাক খেয়ে মরছি। আমরা ভুলে গিয়েছি, আত্মবিকাশই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ভাগ্য যে ঈশ্বরের থেকেও বলবান, এ' হলো তারই এক প্রমাণ। ভাগ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে, মৎ রচিত 'মহাসৃষ্টি রহস্য উন্মোচন' ও ভাগ্য সম্পর্কে প্রবন্ধটি পড়ো।

একমাত্র স্বল্প-চেতন স্তরের মানুষই চায়, সবাই তার পূজা করুক। বর্তমানে ঈশ্বরের চেতনার এতটা দৈন্যদশা নয়, যে সে মানুষের পূজার জন্য লালাইত হবে!

মহাধর্ম-এ দেব, ঈশ্বর, গুরু পূজার অবকাশ নেই। আত্ম-বিকাশ লাভ এবং সুস্থতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মই আমাদের ধর্ম, আমাদের পূজা।

আরও জানতে এই ওয়েবসাইট দেখুন। www.mahadharma.wix.com/bangla

আমরা সমমনষ্ক মানুষদের কামনা করছি।

## মহাধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে

আমরা কাউকে ধর্মান্তরিত (কনভার্ট) করতে আগ্রহী নই। আমরা কেবলমাত্র তাঁদেরকেই কামনা করি, যারা আমাদের সমমনস্ক— সম-মত পোষণকারী— সমধর্মী এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক।

মহাধর্ম যেহেতু মানুষের মৌলিক ধর্ম, তাই যেকোন মানুষ তাঁর পূর্বেকার ধর্ম পরিত্যাগ না করেও ‘মহাধর্ম’ গ্রহণ ও পালন করতে পারবে।

তবে, যাঁরা সক্রিয় সদস্য হতে চাও, যাঁরা পরিপূর্ণভাবে মহাধর্ম অনুসরণ করতে চাও, তাঁদেরকে অন্যান্য মতবাদ পরিত্যাগ ক'রে— সম্পূর্ণরূপে মহাধর্মী/মহাধর্মীন হয়ে উঠতে হবে।

দীক্ষা শুধুমাত্র তাদেরকেই দেওয়া হবে, যারা পরিপূর্ণভাবে 'মহাধর্ম' অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, এবং মহাধর্ম সংসদের সক্রিয় সদস্য হতে ইচ্ছুক।

## মহাধর্ম যাঁদের জন্য

মহাধর্ম-এর মুল সুরের সাথে যাঁদের মন-বীণার সুরের মিল আছে, মহাধর্ম-কে ভালবেসে যাঁরা গ্রহন করবে, তাঁদের জন্যই মহাধর্ম। সাধারণতঃ মুক্তমনের যুক্তিবাদী সত্যপ্রিয় জ্ঞানপিপাসু আত্ম-বিকাশকামী মানুষরাই মহাধর্ম গ্রহন করে থাকে।

যে পথ ও পদ্ধতিকে ধারণ ক'রে একজন মানুষ নিজেকে— নিজের স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারে, আরো ভালো জীবন লাভে সক্ষম হতে পারে, এবং পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে, তা'ই হলো— ‘মহাধর্ম’।

‘মহাধর্ম’ হলো— অন্ধ-বিশ্বাস মুক্ত যুগোপযোগী মানব-বিকাশমূলক ধর্ম। মানবধর্ম। সদস্য হও। তোমায় এলাকায় শাখা-কেন্দ্র গড়ে তোলো। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও।

### পূজা-আরাধনা-প্রার্থনা প্রসঙ্গে

'মহাধর্ম'-এ প্রচলিত পূজা-আরাধনা- প্রার্থনার পরিবর্তে রয়েছে— 'মহামনন' ধ্যান-যোগ (আত্ম-ধ্যান), প্রাণযোগ, সুষুপ্তি যোগ, মহামানস যোগ, স্ব-অভিভাবন সঙ্গীত, প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রভৃতি। এইগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিতভাবে অনুশীলন করলে, মানুষ প্রভূত উন্নতি লাভসহ বিভিন্ন দিক থেকে লাভবান হতে পারবে।

তবে, পুরোনো সংস্কার থেকে, যদি পূজো করার প্রবল বাসনা জাগে তোমার মনে— তাহলে, নিজেকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে— নিজের পূজো করো। নিজের ছবিকে মালা-ফুল-চন্দন দিয়ে সাজিয়ে, ধূপ-প্রদীপ সামনে রেখে, তোমার ছবির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকো। আর, গান করো— 'জাগো ওঠো--- জাগো ওঠো---'। গান গাইতে গাইতে ধ্যানস্থ হয়ে যাও। এই পদ্ধতিতে তুমি অনেক সুফল লাভ করতে পারবে।

অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, নিজেকে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বরের অংশ রূপে— নিজের মধ্যে বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করো। এ-ই হলো বিশ্বাত্মা বা ঈশরের প্রকৃত উপাসনা।

### দীক্ষা প্রসঙ্গে

মানবধর্ম— 'মহাধর্ম'-এ দীক্ষিত হতে চাইলে, এবং মহর্ষি মহামানসের সান্নিধ্যে দীক্ষিত হবার সুযোগ না থাকলে, মনেমনে দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে স্ব-দীক্ষিত হওয়া যায়। অথবা, ধ্যানাসনে বসে— মহর্ষি মহামানসের স্মরণ ও শরণ নিয়েও মনেমনে তাঁর কাছ হতে দীক্ষিত হওয়া সম্ভব।এছাড়া, মহর্ষি মহামানসের নিকটে দীক্ষিত হয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিতভাবে 'মহাধর্ম' অনুশীলণকারী ব্যক্তির কাছ থেকেও দীক্ষিত হওয়া যাবে।

### ।। সময়োপযোগী সতর্কীকরণ ।।

আমরা এখন সময়ের এক চরম সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভিতরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে, চতুর্দিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা যদি নিজদেরকে পরিবর্তিত করতে না পারি, যদি সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারি, তাহলে অচিরেই অনিবার্যরূপে আমাদের বিলুপ্তি ঘটবে।

বেশি দূরের কথা নয়, আগামী ২০ বছরের মধ্যেই প্রকৃতিসহ আমাদের জীবনে এত বেশি পরিবর্তন ঘটবে, যে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী ও পরিবর্তিত হতে না পেরে, বহু মানুষই জীবন চলার পথে মুখ থুবড়ে পড়বে।

এই করুণ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে, আমাদেরকে অনেক বেশি সজাগ-সচেতন-সতর্ক হয়ে উঠতে হবে। সময়োপযোগী হয়ে উঠতে হবে। তা' না হলে, আমরা হারিয়ে যাবো অতীতের সেই বিলুপ্ত প্রাণীদের মতোই।

তাই সময়ের ডাকে, মানবধর্ম ভিত্তিক সময়োপযোগী ধর্ম~ 'মহাধর্ম' -কে মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে, তা' নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে যথেষ্ট মনোবিকাশ ঘটাতে পারলে, তবেই এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

কঠিন সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে, কঠিন পদক্ষেপ নিতেই হবে আজকে আমাদের। এখনো সময় আছে, সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও আলস্য ত্যাগ করে, আত্মবিকাশ অর্থাৎ মনোবিকাশের নিমিত্ত, অবিলম্বে মানবধর্ম~ মহাধর্ম গ্রহণ ও পালন করতে হবে আমাদেরকে।

এটা কোনো ভয় দেখানো কথা নয়। এটাই হলো আজকের চরম সত্য।

আমাদেরকে এই চরম দুরবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারবেনা প্রচলিত কোনো ধর্ম-ই। কোনো ওপরওয়ালা-ই নেমে আসবে না তখন এই পৃথিবীতে। নিজেদেরকেই রক্ষা করতে হবে, যুক্তি-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান ও প্রকৃত অধ্যাত্ম জ্ঞানের সাহায্যে। পরিবর্তীত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে টিঁকে থাকতে, প্রয়োজন মতো নিজেদের সংশোধন পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

সেই পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে 'মহাধর্ম'। মানুষের আদি ধর্ম, মৌলিক ধর্ম, একমাত্র ধর্ম। মানবধর্ম। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আবির্ভূত হয়েছে, মানুষের প্রকৃত কল্যানকামী ধর্ম।

মানুষ যদি এখনো নিজের ভালো নিজে বুঝতে না পারে, নিজের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করে এগিয়ে যেতে না পারে, সত্য ও মিথ্যা এবং শত্রু ও বন্ধুর পার্থক্য বুঝতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে, তার অন্তিম কাল আসন্ন হয়েছে।

'মহামানব-প্রেমিক মহর্ষি মহামানস -এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানবধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন। এই দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে সর্বোত্তম জীবন লাভ করুন।'— সম্পাদক

স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা আরোপিতভাবে প্রকৃত মনোবিকাশের জন্য অনুসরণীয় ধর্মই হলো মানবধর্ম।

যাকে ধারণ করে মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে ও সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে, তা-ই হলো ধর্ম। তাকেই বলা হয়~ মানব ধর্ম।

আর, যাকে ধারণ করে মানুষ অজ্ঞান-অন্ধের মতো নিম্নগামী হয়ে ভুল পথে এগিয়ে যায়, যা মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে গহ্বরে ডুবিয়ে রাখে, তা' কখনোই ধর্ম নয়, তা' হলো অধর্ম। যারা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথবা মানবধর্ম বিস্মৃত হয়েছে, তাদের জন্য আজ প্রয়োজন 'মহাধর্ম' নামে এই আরোপিত মানবধর্ম।

সন্তানদের প্রকৃত মানুষ করে তুলতে চাইলে, শুরু থেকেই তাদেরকে মানবধর্মের পাঠ দিতে হবে। সন্তান অমানুষ তৈরি হলে, তারজন্য দায়ী হবে তোমরাই, আর, তার কুফল শুধু তোমরাই নও, ভোগ করতে হবে গোটা মানব সমাজকেই।

তাই, আর বিলম্ব না করে, আজই মানবধর্মে দীক্ষিত হও সবাই।

মানবধর্ম-ই মূর্ত হয়েছে 'মহাধর্ম' রূপে। মানব ধর্মই মহাধর্ম।

।। জাগো~ ওঠো, আত্মবিকাশ লাভ করো ।।
।। জয় মানবধর্মের জয় ।।

।।জয় মহাধর্মের জয়।।

সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস। অতি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

তিনি একালের একজন মহাপ্রাজ্ঞ সদগুরু মহান মানব প্রেমিক ঋষি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক। আমরা তাঁর অনেক ভক্তগণই তাঁকে স্মরণ কোরে, তাঁর শরণ নিয়েই বহু বিপদ-আপদ ও সমস্যা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকি।

আমরা জ্ঞান পথের পথিকগণ জানি, তাঁর প্রদর্শিত ও নির্দেশিত পথে— তাঁর দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ কোরে চললে, আমাদের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটবে। জীবনটাই বদলে যাবে— সুখ শান্তি আনন্দ ও সুস্থতায়, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে আমাদের জীবন। আমরা যারা তাঁর পথ অনুসরণ কোরে— অনায়াসে তার কিছুটা লাভ করতে পেরেছি, তারাই জানি এর সত্যতা।

অন্যান্য আধ্যাত্মিক গুরু বা অবতার পুরুষদের সাথে তঁর তুলনা চলে না। তাঁর প্রদর্শিত পথ— 'মহা আত্মবিকাশ পথ' যা 'মহামনন' নামে পরিচিত, এবং তাঁর দর্শন ও মহা মতবাদ— 'মহাবাদ' সেইসব মুক্তমনা যুক্তিবাদী আত্মবিকাশকামী প্রগতিশীল মানুষদের জন্য, যাদের জ্ঞান পিপাসা— আত্ম জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে তেমন মানুষের সংখ্যা আজ আর কম নয়। মানবজাতির যথেষ্ট বয়েস হয়েছে— এখন চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

একবিংশ শতাব্দি যে হবে মহা-আত্ম-বিকাশ এবং 'মহাবাদ'-উক্ত প্রকৃত আত্মবিকাশ যোগের কাল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আসুন, আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে মহা আত্ম-বিকাশ পথের পথিক হই।

সারা জীবন ধরে তিনি মানুষের প্রকৃত বিকাশ, মনোবিকাশ এবং জীবন ও মহাজীবনের পরম সত্য অন্বেষণ তথা উন্মোচনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

মানুষকে অজ্ঞান-অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করতে, মানব মনের সঠিক বিকাশ ঘটাতে, তিনি সুদীর্ঘকালের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মানুষ গড়ার এক অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের দিয়েছেন, যার নাম। 'মহামনন' আত্ম-বিকাশ যোগ শিক্ষাক্রম।

তিনি বলেন, "সে-ই হলো প্রকৃত মানবধর্ম আধারিত ধর্ম, যা মানব মনের বিকাশ ঘটাতে সরাসরি সাহায্য কোরে থাকে। ধর্ম পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো— আত্মবিকাশ বা যথেষ্ট মনোবিকাশ লাভ।

ঈশ্বর লাভের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে একশ্রেণীর দুষ্ট লোকের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যা কিছু বলা হয় এবং করা হয়, তা আর যা-ই হোক, মানব বিকাশমূলক ধর্ম— মানবধর্ম মনে করেন না তিনি।

সদগুরু মহামানস একজন বহুমুখী সৃজন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং বহুব্যপক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিল্পী, গবেষক, মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ। একজন জ্ঞান পথের ও বিকাশ পথের পথিক। পৃথিবীর মুক্ত-পাঠশালায় তিনি আজও অবিরাম শিক্ষা গ্রহন ক'রে চলেছেন।

তিনি কোনো সাধু সন্ত বা গুরুবাবা নন। তিনি একজন মহান ঋষি। সদগুরু মহামানস একজন সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক। তাঁর সারা জীবনের বড় অবদান হলো, তাঁর মহান মতবাদ~ মহাবাদ। যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, মানববিকাশ মূলক যুগান্তকারী ধর্ম~ মহাধর্ম। মহাধর্মের মহা ধর্মগ্রন্থ, যুক্তিসম্মত আধ্যাত্মিক দর্শনসহ আধাত্মিক মনোবিজ্ঞান এবং আত্মবিকাশ তথা মনোবিকাশের শিক্ষায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ আমাদেরকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

বিভিন্ন শিল্প কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ধ্যানযোগ সহ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও তাঁর সহজাত ব্যুৎপত্তি ও সমান আগ্রহ দেখা যায়।

তাঁর কথা, আমাকে নিয়ে মাতামাতি কোরো না। আমাকে দেখা ও পাওয়ার জন্যে শ্রম ও সময় ব্যয় না ক'রে, এমনকি আমার জীবনধারা অনুসরণ না কোরে, আমার প্রদর্শিত মত, পথ ও শিক্ষা অনুসরণ কোরে, তার মধ্য দিয়েই আমাকে খুঁজে পাবে। মহাশিবের মতোই অসাধারণ বর্ণময় জীবন তাঁর।

তিনি অল্প বয়সেই সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ কোরে, বহু জনপদ— বহু তীর্থ ঘুরে, সারা ভারত ভ্রমণ কোরে, পরে হিমালয়ে গিয়ে অবস্থান করেন। বহুকাল ধরে তিনি হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে— বিশেষ কয়েকজনকে দীক্ষা দেন। বর্তমানে তাঁদেরই কয়েকজনের প্রচেষ্টায় 'মহাধর্ম মিশন' এবং 'মহাধর্ম সংসদ' গড়ে উঠেছে। সমস্ত জগতবাসীকে মহামানসের ধর্ম— 'মহাধর্ম' এবং তাঁর উপদেশ— বাণী, শিক্ষা এবং তাঁর যুক্তিস্মমত অধ্যাত্ম-দর্শনসহ আত্মবিকাশ লাভের প্রকৃত ও সহজ উপায় জানানোর উদ্দেশ্যে আমরা প্রয়াসী হয়েছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে মহামানসের দিব্য আলোকে আলোকীত হয়ে উঠি।

মহর্ষি মহামানসের জন্ম বৃত্তান্ত অত্যন্ত রহস্যময়। তিনি প্রকৃতপক্ষে ভিন গ্রহের বাসিন্দা ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে।

মহর্ষি মহামানসের বাবা-মায়ের বিবাহের পর কয়েকবছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও তাঁদের কোনো সন্তানাদি না হওয়ায়, মা সুভদ্রাদেবী সন্তান লাভের আশায় একজন সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো শিবের কাছে মানত করেন। নিয়মিতভাবে যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত-উপবাস-ধর্ণা এবং শিবনাম জপ ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে একসময় তিনি দৈববাণী লাভ করেন, যে তার গর্ভে ভিন্ন গ্রহ থেকে মহাশিবের অংশ রূপে একজন মহাপুরুষের আগমন ঘটবে। তার কিছুদিনের মধ্যেই এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি গর্ভবতী হন।

তারপর, যখন তিনি প্রায় নয় মাসের গর্ভবতী, একদিন এক পর্যটক সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হলেন আকস্মিকভাবে। সেই জটাজুটধারী বিশালদেহী সন্ন্যাসী সুভদ্রাদেবীর উদ্দেশে বলেন, তোমার গর্ভে একজন মহাপুরুষের আগমন

ঘটেছে, তিনিই এই যুগের উদ্ধারকর্তা। তিনিই প্রকৃত অধ্যাত্ম পথের দিশারী। শীঘ্রই তোমার কোল আলো করে তিনি অবতীর্ণ হবেন।

প্রথমদিকে তাঁর বাড়ির নাম রাখা হয়েছিল~ বিশ্বনাথ। পরে, অন্য জায়গায় বসবাসকারী তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের ওই একই নামকরণ হওয়ার কারণে, তখন তাঁর নাম রাখা হয়~ তারক। এখনো তাঁর পৈতৃক গ্রামের অনেক মানুষই তাঁকে তারক নামেই চেনে। মহর্ষি মহামানস নামটি পরবর্তী সময়ে তাঁর একজন গুরুর দেওয়া নাম।

আরও বিস্তারিতভাবে তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত রয়েছে 'মহাবাদ' ও 'মানবধর্মই মহাধর্ম' নামক গ্রন্থে।

মহর্ষি অল্প বয়সেই সত্যের সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে নানা দেশে ঘুরে, তারপর হিমালয়ে গিয়ে সেখানে অবস্থান করেছিলেন বহুদিন। কিন্তু কোথাও তিনি তাঁর যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর পাননি।

অবশেষে তিনি ঘরে ফিরে এসে, নিজেকে বারবার প্রশ্নবানে জর্জরিত করে, আত্মধ্যানে ধ্যানমগ্ন হওয়ার পর, তাঁর অন্তর থেকেই একেরপর এক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর উঠে আসে। সেই নিয়েই রচিত হয়েছে তাঁর দর্শন ও মতবাদ।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট দুর্দশায় সমব্যাথি হয়ে তিনি প্রকৃত মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। মহর্ষি দীর্ঘকাল তপস্যা, সাধনা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, এতো সমস্যার মূল কারণ হলো তাদের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর থেকে মুক্ত হতে পারলেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান হবে। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে একটি চমৎকার মানববিকাশের শিক্ষা প্রণালী গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয়~ 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম। এর পরেই তিনি তাঁর যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান সহ নিজস্ব মতবাদ~ 'মহাবাদ' ভিত্তিক মনোবিকাশ তথা মানববিকাশ মূলক শিক্ষা দান শুরু করে দেন।

বহুমুখি প্রতিভাবান এবং বহু গুণাধার প্রজ্ঞাবান এই অসাধারণ মানুষটির জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা থাকলেও, তিনি সেগুলোকে সযত্নে গোপনে রাখতেই পছন্দ করেন। এসবের পাশাপাশি তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও করেছেন। তাঁর কিছু গবেষণাপত্র বিভিন্ন সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি জানতেন, চেতনা বিকাশের পথে বহু যোজন পিছিয়ে থাকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানো মোটেও সহজ কাজ নয়। তবুও তিনি মানুষের মনোবিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যেই নিরলসভাবে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। নিজের জীবদ্দশায় ফলের আশা না করেই তিনি গাছ লাগিয়ে গেছেন, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

আরও বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে, অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। ধন্যবাদ।
https://mahadharma.wixsite.com/book

।। জয় সদগুরু মহামানসের জয় ।।

## উপসংহার

মহর্ষি মহামানসের এই মতবাদের মূল বিষয়ের সঙ্গে আপনি একমত না হলে, বুঝতে হবে— এই বিষয়টি আপনার জন্য নয়। সেক্ষেত্রে, আপনি আপনার পথে চলবেন, বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি যুক্তি-বিচারের মাধ্যমে মহর্ষির কোনো মত খণ্ডন করতে ইচ্ছুক হন, প্রচলিত কোনো ধর্ম— শাস্ত্র— মত বা কারো উক্তির সঙ্গে তুলনা না করে, বাইরের কনো প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে, নিজস্ব যুক্তি-বিচার প্রয়োগের দ্বারা তা' করতে পারবেন। এছাড়া, কোনকিছু জিজ্ঞাস্য থাকলেও জানাতে পারবেন। আপনার এই মতামত লিখিতভাবে জানাতে হবে। আমাদের ওয়েবসাইটেও (কমেন্ট বক্সে) জানাতে পারবেন। মৌখিকভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

'মহাবাদ' ও 'মহাধর্ম' কখনো শেষ কথা বলেনা। বলেনা, আমি যা বলছি তাই একমাত্র সত্য! এই জাগতিক ব্যবস্থায় আমরা পূর্ণ চেতনার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। আমরা এখন মানব-চেতন-স্তরে অবস্থান করছি। লক্ষ্যে পৌঁছাতে, আমাদের সামনে এখনো অনেক পথ বাকি। এই চেতনা বিকাশের পথের মাঝামাঝি কোনো একজায়গায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ পথের জ্ঞান— অসম্ভব।

'মহাধর্ম' মত কখনোই অন্ধবিশ্বাসীদের মতো 'পূর্ণ সত্য জানি' বলে, দাবী করেনা। সে বলে, আপাত সত্যের সিঁড়ি বেয়ে পূর্ণ সত্যের লক্ষ্যে এগিয়ে চলাই আমাদের ধর্ম। আর তাই, তাকে মাঝে মাঝেই আপডেটেড ও সময়োপযোগী হতে দেখা যায়। 'মহাধর্ম' হলো অগ্রগামী মানুষের স্বধর্ম~ সচল ধর্ম।

এই গ্রন্থের মর্মোদ্ধার করতে হলে, ঐকান্তিকভাবে আগ্রহের সঙ্গে— মুক্তমন নিয়ে এর অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। গভীর মনোযোগ সহকারে সমগ্র গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করলে— ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকলে। তাছাড়া, হিংসা-বিদ্বেষ-বিরুদ্ধভাবসহ অন্ধ-বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হলে, কিছুই লাভ হবেনা। বরং নিজের মনোবিষে নিজেই আক্রান্ত হবে। একমাত্র বিজ্ঞান-সচেতন এবং অধ্যাত্ম-সচেতন মুক্তমনের আত্ম-বিকাশকামী মানুষই এই গ্রন্থের মর্মোদ্ঘাটন করে আনন্দিত হতে সক্ষম।

এই গ্রন্থের দর্শন ভাগ— সৃষ্টিতত্ত্ব, জীব-সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে সহমত হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু খোলা মনে যুক্তি-বিচার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিষয়গুলিকে সম্ভাবনাতত্ব রূপে উপভোগ করতে পারলেই তা' যথেষ্ট হবে। দর্শন হলো— থিওরী, সম্ভাবনাতত্ব, থিসিস বা হাইপোথিসিস, তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের দর্শন বিশেষ ('বিশ্বাস ও দর্শন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। দর্শনকে সত্য বলে বিশ্বাস করা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ।

সবশেষে বলি, মহর্ষি মহামানস-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্যদের নিয়ে মনোবিকাশ তথা মানববিকাশমূলক একটি সংগঠন বা সোসাইটি গড়ে উঠতে চলেছে। আপনি এই মহান কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক হলে, যোগাযোগ করুন। —সম্পাদক

যোগাযোগ ; mahamanan.kendra@gmail.com

ওয়েবসাইট : https://mahadharma.wixsite.com/book

প্রথম ভাগ এখানেই শেষ করা হলো। ধন্যবাদ।

## মানবধর্ম-ই মহাধর্ম
## (দ্বিতীয় ভাগ)

### ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে মানব বিকাশমূলক যুগান্তকারী মহাবৈপ্লবিক ধর্ম~ 'মহাধর্ম' সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। এখন এর দ্বিতীয় ভাগে এই ধর্মের ভিত্তি এবং এর ব্যবহারীক দিকসহ বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। যাঁরা এখনো পর্যন্ত 'মানবধর্মই মহাধর্ম' গ্রন্থের প্রথমভাগ পড়ে উঠতে পারেননি, তাঁদেরকে সর্বপ্রথম এর প্রথমভাগটি পড়তে অনুরোধ করছি।

যুগসন্ধিক্ষণের এই চরম সঙ্কটকালে, প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে একালের মহান দার্শনিক, বহুমুখি প্রতিভাবান ও প্রজ্ঞাবান ঋষি বিজ্ঞানী~ মহর্ষি মহামানস ~ সমগ্র মানবজাতিকে দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে, এক মহা আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন।

যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক এবং মানবকল্যাণে আত্মনিয়োজিত~ মহর্ষি মহামানস -- সারা পৃথিবীব্যাপী মানবকেন্দ্রীক অশান্তি হানাহানি রক্তপাত ও দারিদ্র্যসহ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে, 'মহামনন'

নামে আত্মবিকাশ যোগের পথে প্রকৃত মানব মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সুনিশ্চিত পথ ও পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে মানবজীবনে আমূল শুভ পরিবর্তন আসবে বলে তিনি তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

মহর্ষি মহামানসের মানব মুক্তির বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ' এর মূল কথা হলো, সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা~ অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির মূল কারণ হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব, আর মানসিক অসুস্থতা। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-সন্ত্রাস, সবই তার থেকেই জন্ম নিয়েছে। এর একমাত্র সমাধান হলো— সার্বিকভাবে আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও অনুশীলন।

মহর্ষি বলেন, একমাত্র সঠিক আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস সত্যিকারের মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে 'মহামনন' নামে বিশেষ আত্ম-ধ্যান প্রশিক্ষণ সহ অপরিহার্য মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা অর্থাৎ যথেষ্ট বিকশিত মানুষ তৈরির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন! এবং সেইসঙ্গে তিনি 'মানবধর্মই মহাধর্ম' নামে মানব বিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছেন, যার মধ্য দিয়ে এক আধ্যাত্মিক নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। যা আত্মপ্রকাশ করেছে এই বাংলার মাটিতেই।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি সর্বত্র একালের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ'-এর 'মহামনন' নামক আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান হবে। মহাধর্ম নামে এই যুগান্তকারী মহাবৈপ্লবিক ধর্মটি প্রচলিত মিথ্যাশ্রয়ী ধর্মের মতো কোনো ধর্ম নয়। এ হলো আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের ধর্ম তথা মানববিকাশের ধর্ম। প্রকৃত মানবধর্ম। এই ধর্মের প্র্যাকটিকাল দিক হলো 'মহামনন' আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের শিক্ষা ও অনুশীলন।

## ১ম অধ্যায়

মানব বিকাশমূলক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ধর্ম~ মহাধর্ম। মহাধর্মের অনুশীলন বা ব্যবহারিক দিক হলো~ 'মহামনন' মন-বিকাশমূলক শিক্ষা ও অনুশীলন।

এবার 'মহামনন' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

## মহামনন : গোড়ার কথা

যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক মহর্ষি মহামানস কর্তৃক এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে ! মহর্ষি বলেন, একমাত্র সঠিক মনোবিকাশের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, এবং সেইসঙ্গে মহাধর্ম নামে মানববিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন।

মহর্ষি মহামানসের মানব মুক্তির বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ' এর মূল কথা হলো:
সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা~ অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির মূল কারণ হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব, আর মানসিক অসুস্থতা। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-সন্ত্রাস, সবই তার থেকেই জন্ম নিয়েছে।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি সর্বত্র একালের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ'-এর 'মহামনন' নামক মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান হবে।

মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য প্রচলিত একাডেমিক (স্কুল-কলেজের) শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট নয়। তা' যদি হতো তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী মানবকেন্দ্রীক এতো সমস্যা-- এতো অশান্তি ও সঙ্কট সৃষ্টিই হতোনা। আজকের এই কঠিন বিপর্যয়ের একমাত্র সমাধান করতে পারে মহর্ষি মহামানস প্রদর্শিত বিশুদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলন।

এই উদ্দেশ্যেই সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস সত্যিকারের মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে 'মহামনন' নামে ধ্যান প্রশিক্ষণ সহ অপরিহার্য মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা বা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ তৈরির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন!

এর পাশাপাশি তিনি প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস মুক্ত, আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ধর্মের প্র্যাকটিস বা অনুশীলন পর্বই হলো 'মহামনন'।

মহর্ষি মহামানস প্রবর্তিত 'মহাধর্ম' ও 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম হলো প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক বিপ্লব!

মহর্ষি সত্যের সন্ধানে সারা দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, এতো সমস্যার মূল কারণ হলো তাদের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর থেকে মুক্তি দিতে পারলেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রীক সমস্যার সমাধান হবে। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে একটি চমৎকার মানববিকাশের শিক্ষা প্রণালী গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয়--- মহামনন আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম।

এর পরেই তিনি হিমালয় থেকে নেমে এসে যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক এবং নিজস্ব মতবাদ-- 'মহাবাদ' ভিত্তিক মানববিকাশের শিক্ষা দান শুরু করে দেন।

মহর্ষি বলেন, প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি তখনই অর্জিত হবে, যখন 'মহামনন' -এর সঠিক আত্মবিকাশের শিক্ষা সারা বিশ্বে  অনুশীলন করা হবে। আর, সত্যিকারের মানববিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ সমস্যা ও অশান্তি দূর করে মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতিশীল বা মানবদরদী হলেই হবেনা। সমস্ত কুপ্রভাব ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে, সজাগ-সচেতন হয়ে আত্মবিকাশের পথ ধরে জ্ঞান ও চেতনায় যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

প্রথমে তিনি এই কলকাতাতেই 'মহামনন' আত্মবিকাশ কেন্দ্র' নামে একটি বিশ্বমানের মনোবিকাশ সহ ধ্যান শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছেন। মানববিকাশের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে মহর্ষি সকল সচেতন মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।।

সেই সঙ্গে তিনি সরকারের কাছেও আবেদন রাখছেন, আগামী প্রজন্মকে এই ভয়ানক কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে, তাদেরকে সুস্থ, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ, যথেষ্ট বিকশিত মানুষ করে তুলতে সরকার যেন প্রতিটি স্কুলে তাঁর এই মনোবিকাশ মূলক শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন।

একজন যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে, শুধু জ্ঞান থাকলেই হবেনা, সেইসঙ্গে বুদ্ধিমত্তা~ কল্পনাশক্তি~ উদ্ভাবনী ক্ষমতারও বিশেষ প্রয়োজন। এই কল্পনা কোনো অলীক কল্পনা নয়, বাস্তবসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনাময় সুদূরপ্রসারী কল্পনা, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি।
সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই কমবেশি রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটাতে হবে।
নিয়মিতভাবে মনোবিকাশের শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে চেতনা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে আসে, সেইসঙ্গে এগুলিরও বিকাশ ঘটতে থাকে ক্রমশ।

এবার এই অসাধারণ ম্যান-মেকিং শিক্ষার পদ্ধতি, গঠন বা কাঠামো এবং পাঠক্রম সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবো।

প্রথমেই যেটা বলা প্রয়োজন তা হলো
একালের মহান মতবাদ 'মহাবাদ' অর্থাৎ 'মহাইজম' এর উপর ভিত্তি করেই 'মহামনন' নামে এই অতুলনীয় শিক্ষা পদ্ধতি ও তার পাঠক্রম তৈরি হয়েছে।

'মহাইজম'এর মূল কথা হলো, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মানুষের যথেষ্ট মনবিকাশ ঘটাতে পারলে একমাত্র তবেই প্রকৃত মানববিকাশ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। তাই সর্বসাধারণের মন-বিকাশ ঘটানোই হোক আমাদের প্রথম কর্তব্য।

মূলত মানব মনের বিকাশের উপায়, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মহাবাদ বা মহাইজম। তারসাথে প্রয়োজন অনুযায়ী রয়েছে মানব জীবনের ও মহাজাগতিক জীবনের বহু রহস্য উন্মোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

'মহাবাদ' বা 'মহাইজম' একটি বৃহদাকারের গ্রন্থ। এখানে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো।

'মহাইজম" এর অতি সারসংক্ষেপ নিয়ে অ্যামাজন থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি গ্রন্থ, নাম 'The absolute wisdom of the millennium'. এই গ্রন্থ থেকেও আমরা মহাইজম সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবো।

এছাড়াও আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম থেকেও 'মহাবাদ' বা 'মহাইজম' সম্পর্কে অনেক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবো।

'মহামনন' শিক্ষাক্রম মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। একটি হলো থিওরিটিক্যাল অংশ এবং অপরটি হলো প্র্যাকটিক্যাল অংশ।

মুক্তমনের আত্মবিকাশকামী সচেতন মানুষ এই মহান উদ্যোগের সাথে যুক্ত হতে চাইলে, তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ~সম্পাদক

If you are interested to know more, please do a Google search: Maharshi MahaManas / MahaManan / MahaDharma / मानवधर्म ही महाधर्म / মানবধর্মই মহাধর্ম

# মহামনন

প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তি অর্জনে অপরিহার্য একটি চমৎকার এবং অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চলেছি আজ !

একটু সজাগ দৃষ্টিতে চারপাশে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, গোটা মানব জাতি এক ভয়ানক সংকট ও কঠিন অসুস্থতার মধ্য দিয়ে কোনক্রমে এগিয়ে চলেছে। আর যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে এই দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা, শোক সমস্যা এবং দারিদ্র্যের তীব্রতা।

সারা বিশ্বে মানুষের দ্বারা সংঘটিত অন্যায়, দুর্নীতি, নিপীড়ন, ধর্ষণ, প্রতারণা, সহিংসতা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ইত্যাদি অমানবিক কাজ আজ পর্যন্ত কেউ থামাতে পারেনি। ধর্ম, রাজতন্ত্র বা রাজনীতি, প্রশাসন বা কোনো শক্তিশালী ব্যবস্থা বা সংস্থা এখনো মানবজাতির এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি।

অধিকাংশ মানবসৃষ্ট সমস্যার মূল কারণ হল চেতনা ও জ্ঞানের অভাব। অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধ-ভক্তি, কুসংস্কার এবং মানসিক অসুস্থতা, সমস্তই এর থেকে উৎপন্ন হয়।

এর একমাত্র সমাধান হল, প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক পথে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার এবং মানসিক বিকাশ লাভের জন্য মৌলিক মানুষ গড়ার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

একই সঙ্গে যুক্তিবাদী ও মানসিকভাবে বিকশিত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উন্নয়নের মান অনুযায়ী বিশেষ সনদ বা সার্টিফিকেট দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটগুলো মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হলে, মন-বিকাশের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি মনকে জানতে ও বিকশিত করতে সক্ষম হয় এবং যুক্তিবাদী হতে শেখে এবং তা অনুশীলন করে, তবেই তারা ধীরে ধীরে অন্ধ-ভক্তি, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।

একই সাথে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ প্রবণ শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত ক'রে, আচরণগত ত্রুটির তদন্ত ক'রে যথাযথ শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। তবেই শুভ পরিবর্তন আসবে।

দেহ ও মনের সুস্থতা ছাড়া প্রকৃত মন-বিকাশ ও মানববিকাশ সম্ভব নয়। এর জন্য, এর পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল বিভাগ গঠন করতে হবে।

বিভিন্ন এলাকায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মন-উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ক'রে, সকলকে মন-বিকাশ শিক্ষা ও অনুশীলনের সুবিধা ব্যাখ্যা ক'রে, তাদের এই শিক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে 'মহামনন' মন-বিকাশ পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। 'মহামনন' হল প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষা~ মন-বিকাশের শিক্ষার একটি চমৎকার - অতুলনীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। তবে সময়ের সাথে সাথে এই শিক্ষা পদ্ধতির আরও উন্নতি ঘটবে।

মানব উন্নয়নের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

'মহামনন' হলো প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির জন্য প্রকৃত মন বিকাশের এক অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃত শিক্ষাই একমাত্র সমাধান। 'মহামনন' হল সত্যিকারের শিক্ষা যা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত মানুষ হতে সরাসরি সাহায্য করে। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের ধীরে ধীরে যথেষ্ট সচেতন ও জ্ঞানী ক'রে তোলে। এছাড়াও এটি আমাদের বেশিরভাগ সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম ক'রে তোলে। তাই মানব উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা।
আমি আপনাকে মানব বিকাশ এবং বিশ্বশান্তির একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, যা বিশ্বব্যাপী সঠিক ও সার্বিক মন-বিকাশের জন্য অপরিহার্য একটি চমৎকার-অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

'মহামনন কেন্দ্র' হল একটি চমৎকার~ সত্যিকারের মন-বিকাশ (মনোবিকাশ শিক্ষাক্রম) এবং মানব বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্র। মানুষ গড়ার কর্মশালা। প্রথমে আমরা এই বাংলাতেই 'মহামনন কেন্দ্র' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের মন-বিকাশ ও ধ্যান শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাই।

আমরা মনে করি, প্রকৃত মানব বিকাশের মাধ্যমেই মানবজাতি তথা দেশের উন্নয়ন সম্ভব, আমরা এও মনে করি, প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক একাডেমিক (স্কুল-কলেজ ইত্যাদি) শিক্ষা মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। তার জন্য আমাদের এমন একটি অপ্রথাগত (অপ্রাতিষ্ঠানিক) মৌলিক মানব বিকাশমূলক শিক্ষা প্রয়োজন যা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করবে।

এটা প্রত্যেক সচেতন মানুষেরই জানা আছে, মানব সমাজের অধিকাংশ সমস্যা-অশান্তি ও অপরাধের কারণ হলো জ্ঞান ও চেতনার অভাব এবং মানসিক অসুস্থতা। এবং এটি স্ব-(মন) বিকাশ শিক্ষার অভাবের কারণেই ঘটছে। তাই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
ব্যক্তি এককের বা ইউনিটের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশ ও সমগ্র মানব জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর সেই লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে 'মহামনন' কার্যক্রম।

'মহামনন' মন-বিকাশের শিক্ষা হল বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূর করার বৈজ্ঞানিক উপায়। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও চেতনার অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারণ।

স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প সচেতনতা সম্পন্ন একজন দরিদ্র মানুষকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করলে হয়তো সে  সাময়িকভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ নাও ঘটতে পারে।

বংশগতভাবে বা অন্যথায় প্রচুর সম্পদের অধিকারী একজন ধনী ব্যক্তির যদি যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব থাকে, তবে শীঘ্রই সে তার সমস্ত সম্পদ হারাতে পারে এবং দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, যদি না সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে। তবে জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ এবং সেইমতো কাজ সম্পাদনের জন্যেও কিছু জ্ঞান থাকা জরুরি। ক্রমাগত অর্থ এবং সম্পদ উপার্জন এবং তাদের রক্ষা করার জন্য একজনের যথেষ্ট জ্ঞান এবং চেতনা থাকা প্রয়োজন।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক মুক্তি পেলেই যে মানব উন্নয়ন হবে তা নয়।

অর্থনৈতিক উন্নতির (economic development) ফলে মানুষের জীবন সাময়িকভাবে আরামদায়ক হতে পারে, মানব সম্পদ ও মানব সভ্যতার আপাত উন্নতি ঘটতে পারে, প্রচলিত (ডিগ্রি লাভের) শিক্ষায় মানুষ উচ্চশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তাতে মানুষের মনের বিকাশ ঘটবে না। আর সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না হলে মানুষ একসময় তার সমস্ত সম্পদ হারাবে এবং আবার দারিদ্রে পতিত হবে। এমনকি সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়েও যেতে পারে।

মানুষের বিকাশ মানেই আমরা বুঝি মানুষের মনের বিকাশ। চেতনা বা সচেতন মনের বিকাশ।

যদি মানুষের মন যথেষ্ট বিকশিত না হয়, তাকে বাইরের থেকে যতই চটকদার দেখাকনা কেন, মানুষ সেই অন্ধকারেই থাকবে অতীতে যেখানে সে ছিল।

মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা হলো সবচাইতে বড় সমস্যা। অজ্ঞান জনিত অন্ধত্ব থেকে যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আসে, সেগুলোকে দূর করে আমরা যদি মানুষকে প্রকৃত মন-বিকাশমূলক মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি, যদি আমরা তাদের সঠিকভাবে মন-বিকাশের ব্যবহারিক পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দিতে পারি। তাহলেই মানুষের বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

মানুষের (মনের) বিকাশ না ঘটলে বাকি সব বাহ্যিক উন্নয়ন হবে বানরের গলায় মুক্তার মালার মতো। আর মানুষের বিকাশ ঘটলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হতে থাকবে স্বাভাবিকভাবেই।

এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্য থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে মানুষকে সচেতন ও সচেতন করার পাশাপাশি জীবনের অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবজাতির বহু সমস্যা ও সঙ্কটের মূল কারণ হলো আমাদের অন্ধবিশ্বাস।
আমাদের অধিকাংশ সমস্যা দুঃখ কষ্ট দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো অজ্ঞানতা জনিত অন্ধত্ব, কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাস। শুধু দারিদ্র্যমুক্ত নয়, মানবাধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন অধিকাংশ মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনা থাকবে।

প্রচলিত ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাসহ  প্রচলিত কোনো ব্যবস্থাই মানুষের এই মূলগত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নয়।

এই প্রসঙ্গে, আমি বলতে চাই যে সাম্যবাদ (communism) এই সমস্যার সমাধান নয়। অনেকে বলেন, মানব সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এর সমাধান হবে। কিন্তু এটাই আসল সত্য নয়।

সাম্যবাদ তখনই সফল হতে পারে যখন সমগ্র মানব জাতির জ্ঞান ও চেতনা যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে  প্রায় সমতা অর্জন করবে। আরোপিত সাম্যবাদ একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা মাত্র। সেক্ষেত্রে সুবিধাবাদী নেতৃত্ব শ্রেণীর লোকেরাই লাভবান হবে। সাম্যবাদের পথে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হবে না। কমিউনিজম হলো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো কৃত্রিম ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা কখনোই সফল হতে পারে না। মানুষের জন্য ভালো হতে পারে না।

তাই, অলীক কমিউনিজম নয়, এর জন্য প্রয়োজন 'মানবধর্ম' ভিত্তিক 'মহাধর্ম', এবং এটি আধুনিক সময়ের মহান মতবাদ: 'মহাবাদ'। যা মানুষকে যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হতে সাহায্য করে। একমাত্র উন্নত মানুষই পারে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এর ওপর কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা চাপানোর প্রয়োজন নেই।

মনুষ্য সৃষ্ট আজকের এই চরম সংকট থেকে পরিত্রাণের পেতে মনোবিকাশের ও মানব-বিকাশের ধর্ম ~ 'মহাধর্ম'-ই হলো একমাত্র উপায়। এই ধর্ম প্রচলিত ধর্মের মতো মিথ্যাশ্রয়ী ধর্ম নয়। এটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় মন-বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানব বিকাশের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। 'মহামনন' হলো এই ধর্মের অনুশীলন।

আমাদের স্লোগান~ **'মানবধর্মই মহাধর্ম'  'मानवधर्म ही महाधर्म'**

আমরা আমাদের জীবনকে আরও সুন্দরভাবে উপভোগ করতে চাই~ জীবনে সফল হতে চাই~ সুখী, সমৃদ্ধশালী-শান্তিময়, আনন্দময়, সুন্দর, সুস্থ জীবন পেতে চাই। আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। আমাদের পার্থিব বিকাশের সাথে সাথে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, জ্ঞানে, গুণে, আচরণে, প্রকৃত শিক্ষায়, সক্ষমতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

যদি আপনার চাওয়া একই হয়, আপনি যদি একটি সুখী-উন্নত, স্বাস্থ্যকর, সুন্দর জীবন উপভোগ করতে চান, তবে আপনি তা অর্জন করতে পারেন 'মহামনন' শিক্ষা সিলেবাসের এই মহান মন-বিকাশমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে। এমনকি আপনার প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি, 'মহামনন'  মন-বিকাশ শিক্ষাক্রমসহ  'মহামনন-যোগ' পদ্ধতি নিয়মিত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশের সাথে সাথে আপনার পরীক্ষার রেজাল্টও অনেক ভালো হবে।

যুগান্তকারী এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপ দিতে যদি বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন, তবেই মানবকেন্দ্রিক অধিকাংশ সমস্যা সহ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে প্রকৃত মানব বিকাশ সম্ভব হবে।

অগ্রবর্তী সচেতন মানুষের কাছে একটি সময়োপযোগী আবেদন:

একটি চিরাকাঙ্ক্ষিত দূষণ ও দুর্নীতি মুক্ত উন্নত পৃথিবী তৈরি করতে,  আমাদের এই মানবজীবনকে ধন্য করে তুলতে, নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলতে, আমাদের সমাজ থেকে অমানবিক কার্যকলাপ এবং দারিদ্র্য দূর করতে, আমাদের কাছে আজ  সত্যিকারের মানব উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য চমৎকার ও অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। নিজের এবং বৃহত্তর স্বার্থে একে সাদরে গ্রহণ করুন।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার স্রষ্টা হলেন~ মহর্ষি মহামানস ওরফে সুমেরু রে। আমরা বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি সত্যিকারের মানব উন্নয়নমূলক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

আমাদের সত্যিকারের মানব উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আমাদের সমমনা ব্যক্তিদের প্রয়োজন। আপনি যদি এই প্রোগ্রামে আগ্রহী হন, তাহলে এটি সম্ভব করতে আপনার সাহায্যের হাত প্রসারিত করুন এবং এই মহান উদ্যোগে অংশগ্রহণ করুন। 'মহামনন' শুধু এটি প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষা~। জনগণ একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

'যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হওয়ার আহ্বান' কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে আমাদের সামনে কোনো শিক্ষাকেন্দ্র, কোনো পথ বা পদ্ধতি নেই। এখন সেই পথ দেখিয়েছেন এ' যুগের একজন ভারতীয় মহান ঋষি~ মহর্ষি মহামানস।

মানব বিকাশের এই উৎকৃষ্ট শিক্ষা (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) এতই সুন্দর যে কোনো স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যদি তা পায়, সেই শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল অনেক ভালো হবে। সেই সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর আচরণেও অনেক উন্নতি ঘটবে।

'মহামনন' শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ কোর্স নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্ম বা মনের বিকাশ ঘটে। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, অনেক মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিক সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে তারা আত্মশুদ্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধি সহ প্রকৃত আত্ম-বিকাশের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। এছাড়া যারা অপরাধের দিকে ঝুঁকছে তারা এই শিক্ষাসহ 'মহামনন'-এর বিশেষ কোর্সের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারে এবং বিকশিত আত্মায় পরিণত হতে পারে। একটি শান্তিপূর্ণ-উন্নত সমাজ /দেশ গড়ে তোলার জন্য, 'মহামনন' হল সকলের জন্য চমৎকার অতুলনীয় ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

মহান ঋষি~ মহর্ষি মহামানসের প্রদর্শিত পথের মাধ্যমে আপনার জীবনকে উজ্জ্বল এবং আরও প্রস্ফুটিত করে তুলুন, আপনার জীবনে একটি অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক শুভ পরিবর্তন নিয়ে আসুন।

'মহামনন' ('মহা আত্ম-বিকাশ-যোগ') শিক্ষামূলক কর্মসূচি শুধুমাত্র আত্ম-বিকাশ বা মন-বিকাশের তাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞান, বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, আধুনিক মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান এবং মহামানসের উদ্ভাবিত আরও অনেক পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত, যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতা, 'মহামানস-যোগ' এবং
মহর্ষি মহামানসের নতুন উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, এবং বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষা এবং প্রয়োজনে তার ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়।

'মহামনন'~ 'মহা আত্ম-বিকাশ যোগ শিক্ষা হল একটি সহজ সরল এবং সহজবোধ্য কার্যকর পাঠ্যক্রম সামগ্রিক মন-বিকাশ বা আত্ম-বিকাশের সাথে মৌলিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহ বিশুদ্ধ (যুক্তিসঙ্গত) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা।

যথেষ্ট সুস্থতা ছাড়া প্রকৃত মন-বিকাশ সম্ভব নয়। সে জন্য 'মানসিক চিকিৎসা' 'মহামনন' শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যে দেহ ও মনের সংমিশ্রণ একজন নিজেকে মানুষ বলে গর্ব বোধ করে, সে যদি সেই দেহ ও মন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। সে হলো ঊনমানুষ বা অসম্পূর্ণ মানুষ। 'মহামনন'-এর মৌলিক শিক্ষা একজনকে সর্বক্ষেত্রে একজন উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করে। যে শিক্ষা অনুসরণ ও অনুশীলন করে (ব্যবহারিক~ প্রয়োগ পদ্ধতি সহ) একজন ব্যক্তি সবদিক থেকে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারে, তা হল 'মহামনন'।

২য় অধ্যায়

# মহাবাদ

**"একমাত্র মনোবিকাশমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি লাভ সম্ভব।"**

এই গ্রন্থে সহস্রাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি
মহর্ষি মহামানসের বৈপ্লবিক মতবাদ ও জ্ঞানদর্শনসহ তাঁর আত্মবিকাশ বা মন-বিকাশমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবজীবন ও মহাজাগতিক জীবনের বহু সত্য উন্মোচিত হয়েছে! উদ্ঘাটিত হয়েছে মানব জীবনের বিভিন্ন কঠিন সমস্যা ও তার মূল কারণ ও প্রকৃত সমাধান।

মহর্ষি মহামানসের যে মহান মতবাদের উপর ভিত্তি করে মহাধর্ম ও মহামনন সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম হলো~ মহাবাদ। এখন মহাবাদ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

মহর্ষি মহামানসে ওরফে সুমেরু রায়ের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ' -কে বলা হয় এই যুগের উপনিষদ। সুমেরুপনিষদ। প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্বশান্তির একমাত্র পথপ্রদর্শক!

মহর্ষি মহামানসের মানব মুক্তির বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ' এর মূল কথা হলো:

সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা~ অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির মূল কারণ হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনায় অভাব, আর মানসিক অসুস্থতা। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-সন্ত্রাস, এসব তার থেকেই জন্ম নিয়েছে।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি সর্বত্র একালের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ'-এর 'মহামনন' নামক মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান হবে।

জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন~ স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন কর্তা স্বরূপ একটা অহং চেতন সত্তা রূপে বোধ করে থাকি বা গণ্য করে থাকি। যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের এই অস্তিত্ব, আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, আচরণ ও কার্যকলাপ সমস্তই বহু কিছুর উপর নির্ভরশীল এবং বহু কিছুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে চলেছে।

মানবকেন্দ্রিক যাবতীয় সমস্যার শুরু হয়েছে এখান থেকেই। সমস্যার মূল কারণ আমরা দেখতে পাই না। সমস্যার মূলে কি আছে, তার খোঁজ করি না। আমরা অজ্ঞান-অন্ধের মতো তার শাখা-প্রশাখাতেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াই।

একটা ঘটনা থেকে জন্ম নেয় বহু ঘটনা। সেইসব ঘটনাগুলো থেকে সৃষ্টি হয় আরো অনেক ঘটনা। আবার সেই ঘটনাগুলি থেকে জন্ম নেয় অজস্র ঘটনাবলী। এইরূপে ধারাবাহিক ভাবে পরম্পরাগত অসংখ্য ঘটনার সৃষ্টি হয়ে চলেছে অবিরত। আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব সেই পরম্পরাগত ঘটনাপ্রবাহেরই ফসল। শুধু তাই নয়, আমরা এবং আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ জগতব্যাপী ঘটনা প্রবাহের অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের অবুঝ মন তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

আমরা মোটেও কোনো স্বাধীন~ স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন সত্তা নই। আমাদের অস্তিত্বসহ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ~ স্বয়ংক্রিয় জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ রূপ জাগতিক ব্যবস্থার অধীন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান-অন্ধ অহংবোধ সম্পন্ন মন তা মানতে চায় না।

এই মহাজগৎ সৃষ্টির শুরুর সেই আদি ঘটনা থেকেই সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি হয়েছে এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এখানে যা কিছু ঘটেছে~ ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে~ সমস্তকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে সৃষ্টির শুরুর মূহুর্তে সেই আদি ঘটনার মাধ্যমেই। পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় এই ঘটনাবলীকেই আমরা নিয়তি বা ভাগ্য নামে অভিহিত করে থাকি।

ভাগ্য সম্পর্কে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। এছাড়া, একটি সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত আমার রিসার্চ পেপার পড়ে দেখতে অনুরোধ করবো।

কেন এতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছি আমরা? আমাদের বিকাশের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা কোথায়? খুঁজে দেখার সময় এসেছে আজ।

যাকে ধারণ করে, যা অনুশীলন করে যথেষ্ট সুস্থ ও বিকশিত মনের মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধশালী মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে তা-ই হলো ধর্ম।
যা আমাদেরকে বিকাশ পথ থেকে বিচ্যুত ক'রে, বিপথগামী ক'রে, দীনহীন অন্ধবিশ্বাসী স্তাবকে পরিণত ক'রে তোলে, আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল না ক'রে পরনির্ভরশীল ক'রে তোলে, তা কখনোই মানুষের ধর্ম হতে পারে না।

আমরা অনেকেই নিজের নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে ক'রে থাকি। একবারও কি প্রশ্ন জাগেনা মনে? আমাদের ধর্ম যদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম-ই হবে, তাহলে সেই ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলন এতো দিনেও কেন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মানবজাতি ক'রে তুলতে পারেনি? কেন যথেষ্ট বিকশিত মনের মানুষ করে তুলতে পারেনি আমাদের? কেন আমরা এখনো অজ্ঞানতার অন্ধকারেই পড়ে আছি? কেন আমরা বিদেশি বিধর্মী মানুষের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হচ্ছি? কেন পরাধীন হয়ে নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের? কেন ভিন্নধর্মীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে বাঁচতে হয় আমাদের?

আমরা এতটাই কূপমন্ডুক হয়ে পড়েছি যে, আমরা প্রশ্ন করতেও ভুলে গেছি। আত্মসমালোচনা আমাদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে! মিথ্যা আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে আমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করছি এবং ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলাটাই আমাদের পরমগতি বলে ভেবে নিয়েছি।

আমরা মুখে বলি, "সত্য চাই"। প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্য চাইনা। আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়ে আমরা সত্যকে এড়িয়ে চলি। কারণ আমাদের অস্তিত্ব যে মিথ্যার ভিতের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে! আমরা আমাদের বিশ্বাসকে এবং মিথ্যাকেই সত্য বলে মনে করি।

মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য প্রচলিত একাডেমিক (স্কুল-কলেজের) শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট নয়। তা' যদি হতো তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী মানবকেন্দ্রীক এতো সমস্যা-- এতো অশান্তি ও সঙ্কট সৃষ্টিই হতোনা। আজকের এই কঠিন বিপর্যয়ের একমাত্র সমাধান করতে পারে মহর্ষি মহামানস প্রদর্শিত বিশুদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলন।

এই উদ্দেশ্যেই সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস সত্যিকারের মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে 'মহামনন' নামে ধ্যান প্রশিক্ষণ সহ অপরিহার্য মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা বা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ তৈরির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন!

এর পাশাপাশি তিনি প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস মুক্ত, আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ধর্মের প্র্যাকটিস বা অনুশীলন পর্বই হলো 'মহামনন'।

যুগসন্ধিক্ষণের এই চরম সঙ্কটকালে, এই বাংলার মাটিতে মহর্ষি মহামানসের মহান মতবাদ~ মহাবাদ -এর ভিত্তিতে 'মহাধর্ম' নামে একটি নতুন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে। যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক একালের মহান ভারতীয় ঋষি~ মহর্ষি মহামানস এই ধর্মের প্রবর্তক। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাঁর এই মানববিকাশ মূলক ধর্ম এবং তাঁর মানব মুক্তির মহান মতবাদ ক্রমশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

মহর্ষি মহামানস প্রবর্তিত 'মহাধর্ম' ও 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম হলো প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক বিপ্লব!

মহর্ষি মহামানস অল্প বয়সেই সত্যের সন্ধানে সারা দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি উপলব্ধি করেন, মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, এতো সমস্যার মূল কারণ হলো তাদের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর থেকে মুক্তি দিতে পারলেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রীক সমস্যার

সমাধান হবে। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে একটি চমৎকার মানববিকাশের শিক্ষা প্রণালী গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয়~ মহামনন আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম।

এর পরেই তিনি হিমালয় থেকে নেমে এসে যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক এবং নিজস্ব মতবাদ~ 'মহাবাদ' ভিত্তিক মানববিকাশের শিক্ষা দান শুরু করে দেন।

একজন সত্য-সন্ধানী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর মূল লক্ষ্য হলো নিজেকে জানা এবং নিজের শিকড় খুঁজে পাওয়া। ধীরে ধীরে, মুক্ত মন নিয়ে, যুক্তি-বিচারসহ জ্ঞানের পথে সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে জীবনের রহস্য এবং মহাজাগতিক জীবনের রহস্য তার কাছে ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে।

আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-অনুসন্ধানের পাশাপাশি মানুষ হিসেবে মানুষের দুঃখ-কষ্টে তার মন কেঁদে ওঠে। মানুষের কেন এতো দুঃখ-কষ্ট, কেন এতো সমস্যা, এতো দারিদ্র্য, এর মূল কারণ কী এবং কী উপায়ে মানুষকে তাদের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়া যায়, তার জন্য গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে যান তিনি। ক্রমশ একের পর এক সব প্রশ্নের উত্তর মিলছে, একের পর এক রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, আত্মধ্যান যোগে~ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সামনে। তারপর তিনি তার অত্যন্ত কঠিন দীর্ঘ যাত্রার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তগুলো উন্মোচন করেন, যাতে মানুষ সহজে মানব জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

মহর্ষি বলেন, প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি তখনই অর্জিত হবে, যখন 'মহামনন' -এর সঠিক আত্মবিকাশের শিক্ষা সারা বিশ্বে অনুশীলন করা হবে। আর, সত্যিকারের মানববিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ সমস্যা ও অশান্তি দূর ক'রে মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে, উন্নত আলোকোজ্জ্বল জীবনের সন্ধান দিতেই, মুক্তিসূর্য রূপে আবির্ভূত হয়েছে, 'মহাবাদ' ভিত্তিক প্রকৃত মানব ধর্ম~ মহাধর্ম। একে সাদরে গ্রহণ করতে হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। মহাধর্ম প্রচলিত ধর্মের মতো কোনো ধর্ম নয়। বিকাশ লাভ ও সুস্থতা লাভের জন্য আত্মবিকাশ যোগ অনুশীলন করাই হলো এই ধর্ম পালন করা।

'মহামনন' আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষাক্রম হলো মহাধর্মের ধর্মানুশীলন। নিজেকে জানা, নিজের শরীর ও মনকে জানা, মানবজীবনের লক্ষ্যকে জানার সাথেসাথে এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা, তারপর নিজের মনের বিকাশ সাধনের জন্য বিশেষ কিছু যোগ পদ্ধতি অনুশীলন করা, এই নিয়েই মহাধর্ম বা মহামনন অনুশীলন। যেকোনো ধর্মের মানুষ ইচ্ছা করলে, তাদের নিজ নিজ ধর্মে থেকেও এই অনুশীলনের মাধ্যমে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারবেন।

তিনি আত্মবিকাশ মূলক শিক্ষা ও আত্ম-ধ্যান প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশ্বমানের যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে অভিলাষী হয়েছেন। মানব বিকাশের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে মহর্ষি সকল সচেতন আত্মবিকাশকামী মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সেই সঙ্গে তিনি সরকারের কাছেও আবেদন রাখছেন, আগামী প্রজন্মকে আগামীদিনের ভয়ানক কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে, তাদেরকে সুস্থ, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ, যথেষ্ট বিকশিত মানুষ করে তুলতে সরকার যেন প্রতিটি স্কুলে তাঁর এই মনোবিকাশ মূলক শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই গ্রন্থে বর্ণিত ও আলোচিত প্রায় সমস্ত বিষয়গুলিই **'মহামনন'** মন-বিকাশ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আবার, মানব বিকাশমূলক ধর্ম~ **'মহাধর্ম'**-এর ব্যবহারিক বা অনুশীলন পর্বও **'মহামনন'** ধ্যান ও মন-বিকাশ শিক্ষা। আর, এই গ্রন্থের প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মহর্ষি মহামানসের মহান মতবাদ~ মহাবাদ।

সমস্যা এবং তার মূল কারণ ও প্রকৃত সমাধান

প্রতিদিন সারা পৃথিবী জুড়ে অত্যন্ত মর্মাহতকর মনুষ্যকৃত যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, এবং মানুষের যে বিকৃত— বিকারগ্রস্ত— উন্মাদপ্রায় রূপ আমরা প্রতিনিয়ত অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করে চলেছি, প্রচলিত ধর্ম— রাজনীতি— প্রশাসন প্রভৃতি প্রচলিত কোনো ব্যবস্থা বা সিস্টেম-ই তার প্রতিকারে সক্ষম নয়।

এই ঘোর সঙ্কটে, আগামী সর্বনাশা পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে— মহর্ষি মহামানস একমাত্র সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। এখনও সময় আছে, আমরা যদি এখনও সেই পথ অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলেই শেষ রক্ষা হবে।

মহর্ষি মহামানস বলেন, চতুর্দিকে মানবকেন্দ্রিক যত অশান্তি, যত সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশ ভয়ানক রূপ ধারণ করতে চলেছে, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ হলো— জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। আর, এর একমাত্র সমাধান হলো— সার্বিকভাবে সঠিক মনোবিকাশ শিক্ষার অনুশীলন।

অন্যায়-অপরাধ মুক্ত~ শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত~ সুন্দর পৃথিবী গোড়ে তুলতে চাইলে, সবার আগে স্কুল-কলেজ এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে দিকে দিকে~ মানুষ গড়ার কর্মশালা গড়ে তুলতে হবে। মানুষ গড়ার কর্মশালা হলো মনোবিকাশের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

একমাত্র, সার্বিকভাবে মনোবিকাশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানব বিকাশ সম্ভব হবে। আর, প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে তবেই মানুষের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হবে। সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানবজাতির অধিকাংশ সমস্যার মূল কারণ হলো~ যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব, এবং তজ্জন্য মিথ্যা অহংকার ও অন্ধবিশ্বাস এবং তলিয়ে ভাবার ও বোঝার অক্ষমতা। সেইসঙ্গে রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে অনীহা।

হাজার হাজার বছর ধরে আরোপিত ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেই শিখিয়েছে, খোলা মনে~ যুক্তিপথ ধরে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন কোরতে শেখায় নি।

এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো~ বিজ্ঞান ভিত্তিক মনোবিকাশ শিক্ষার প্রবর্তন। আর সেই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘকালের গবেষণা ও প্রচেষ্টায় প্রস্তুত হয়েছে~ 'মহাবাদ' ভিত্তিক 'মহামনন'~ নামে সঠিক মনোবিকাশের এক অতুলনীয়~ অত্যাবশ্যক শিক্ষাক্রম। নতুন ও আগামী প্রজন্মের শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে~ চতুর্দিকে মহামনন কেন্দ্র গড়ে তুলুন।।       ~প্রকাশক
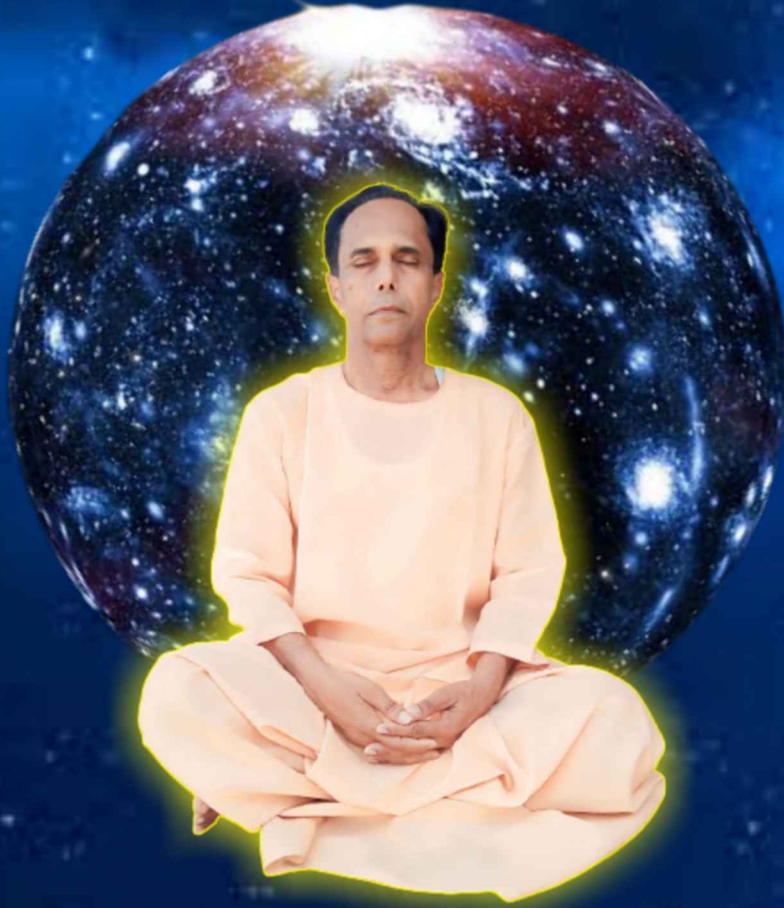
মহর্ষি মহামানস বর্ণিত একালের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ~ **'মহাবাদ'-**এর সারকথা**:**

মহর্ষি মহামানস প্রকৃত মানববিকাশ এবং বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে প্রায় সারাজীবন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁর যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক একালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ'-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় :

'মহাবাদ'-এর প্রধান দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি হলো মানবকেন্দ্রিক এবং অপরটি হলো মহাজগত কেন্দ্রিক মতবাদ।

মানবজাতির ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ-এর সারকথা হলো~
"মনুষ্যসৃষ্ট অধিকাংশ সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট- দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব এবং মানসিক অসুস্থতা। অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার এবং হিংসা-বিদ্বেষ-সন্ত্রাস এ' সবই তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।"
সঠিক মনোবিকাশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যদি সারা বিশ্বে প্রবর্তিত করা হয় তবেই প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি অর্জিত হতে পারে। সত্যিকারের মানববিকাশ ঘটলে তখন অধিকাংশ মানবকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান হবে।"

"মনুষ্যকৃত অধিকাংশ জটিল সমস্যার মূলে রয়েছে চেতনার স্বল্পতা এবং যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব, এবং তজ্জনিত অন্ধত্ব, এছাড়া শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। যথেষ্ট চেতনার অভাব এবং স্বল্প-জ্ঞান বা অজ্ঞানতাই মানুষের অধিকাংশ দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, দারিদ্র্য এবং অধিকাংশ সমস্যার প্রধান কারণ।"

"মানুষ কথাটার মধ্যে রয়েছে, মন ও হুঁশ। হুঁশ যুক্ত মন অর্থাৎ 'সচেতন মন'। আমাদের মধ্যে রয়েছে দুটি সক্রিয় মন, একটি হলো যুক্তি-বিচার ধর্মী 'সচেতন মন' বা মানব চেতন মন, আর অপরটি হলো যুক্তি-বিচার বিহীন অন্ধবিশ্বাসী আবেগ প্রবণ— 'অবচেতন মন' বা প্রাক মানব মন। এই সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটা অবধি আমরা অধিক অংশে অবচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকি। সচেতন মনের বিকাশ ঘটলে— তবেই আমরা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠবো এবং সর্বোন্নত আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারবো।"

দৃঢ় বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাস-ই হলো মানব-জগতের অধিকাংশ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। মনুষ্যকৃত অধিকাংশ জটিল সমস্যার মূলে রয়েছে— চেতনার স্বল্পতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অন্ধত্ব, এছাড়া শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। যথেষ্ট চেতনার অভাব এবং স্বল্প-জ্ঞান বা অজ্ঞানতাই মানুষের অধিকাংশ দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, দারিদ্র্য এবং অধিকাংশ সমস্যার প্রধান কারণ।

সঠিক মনোবিকাশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সারা বিশ্বে চালু হলে তবেই প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্বশান্তি অর্জিত হবে। আর সত্যিকারের মানববিকাশ ঘটলে, তখন অধিকাংশ মানবকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মানবধর্ম মানে শুধুই সৎ ও সহৃদয়— সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠাই নয়, মানবধর্ম হলো মানুষের সহজ ধর্ম— মৌলিক ধর্ম। স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মবিকাশ লাভের ধর্ম। আমরা সেই মানবধর্মকে ভুলে গিয়ে, নানারূপ ধর্ম ও অধর্ম নিয়ে অজ্ঞান-অন্ধের মতো মোহাচ্ছন্ন হয়ে মেতে আছি।

যেমন জলের ধর্ম— আগুনের ধর্ম, তেমনই মানুষের ক্ষেত্রে 'ধর্ম' হলো— তার সহজ আচরণ বা স্বভাবধর্ম। মানুষ তার স্বভাবধর্ম— সহজ আচরণের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রমশ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও চেতনা লাভের মধ্য দিয়ে— মনোবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে— একসময় মানবত্ব লাভ কোরে থাকে। পূর্ণবিকশিত মনের মানুষ হয়ে ওঠে। মানব-মনের বিকাশ-পথ ধরে এগিয়ে চলাই হলো— মানবধর্ম।

আমরা আমাদের স্বধর্ম~ মানবধর্ম বিস্মৃত হয়ে নিম্নগামী স্রোতে ভেসে চলেছি বলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা। সেই মানবধর্মকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতেই আবির্ভূত হয়েছে 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক মানব বিকাশমূলক একটি যুগান্তকারী ধর্ম।"

আরোপিত ধর্মের ক্ষেত্রে, যাকে ধারণ ক'রে মানুষ ভালভাবে বাঁচতে পারে এবং দ্রুত বিকাশলাভ করতে পারে, তা-ই হলো ধর্ম। অলৌকিকতার পিছনে অথবা মিথ্যা প্রলোভনের পিছনে ছোটাছুটি করা ধর্ম নয়~ অধর্ম।

তোমার একটি 'সচেতন মন' (Conscious Mind) আছে বলেই— তুমি মানুষ। তবে তোমার এই সচেতন মনটি এখনও যথেষ্ট বিকশিত নয়। যথেষ্ট বিকশিত একজন মানুষ হয়ে উঠতে— তোমার এই সচেতন মনটির বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। আর এটাই তোমার প্রাথমিক ধর্ম-কর্ম।

তুমি অধিকাংশ সময়েই যুক্তি-বিচার বিহীন অন্ধ আবেগপ্রবণ বেহিসাবি দেহগত মন~ অবচেতন মনের দ্বারা চালিত হয়ে চলেছো বলেই তোমার এত দুঃখ কষ্ট দুর্দশা। নিজের মনকে জানতে পারলে এবং তার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারলেই তোমার সচেতন মনের বিকাশ ঘটাতে থাকবে। সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেই তোমার দুঃখের কাল শেষ হবে।

ব্যক্তি এককের মনোবিকাশের মধ্য দিয়েই দেশের এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশ সম্ভব। একমাত্র সার্বজনীনভাবে মানুষের প্রকৃত মনোবিকাশের উদ্দেশ্যে~ সঠিক মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে পারলে, তবেই দেশ তথা মানবজাতির বিকাশ সম্ভব হবে।

দারিদ্র্যের মূল কারণ হ'ল অন্ধত্ব, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং দাস মনোভাব যা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সাথে জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে ঘটে থাকে।

যথেষ্ট চেতনার অভাবেই মানুষের এতো সমস্যা, দুঃখ কষ্ট দুর্দশা। আর এই চেতনা বিকাশের পরিপন্থী হলো ধর্ম, রাজতন্ত্র (বর্তমানে রাজনীতি), ও বৈশ্যতন্ত্র বা ট্রেড সিস্টেম। এরা নিজেদের স্বার্থে কখনোই চায়নি~ মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটুক। বরং এরা মানুষকে অজ্ঞান অন্ধ মুর্খ বানিয়ে রাখতেই সদা তৎপর।

তুমি একজন মানুষ রূপে জন্ম গ্রহন করেছো, তাই তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো— পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। নিজেকে এবং এই জাগতিক ব্যবস্থাকে জানতে এবং প্রকৃত বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে, সর্বদা সজাগ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়াই তোমার মূল ধর্ম। অজ্ঞান-অন্ধের মতো অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কাল্পনিক কোনো দেবতা বা ঈশ্বরের কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনোকিছুর পিছনে ছুটে চলা মানুষের ধর্ম নয়।

আমরা এক শিক্ষামূলক ভ্রমনে অল্প সময়ের জন্য এখানে এসেছি। ক্রমশ উচ্চ থেকে আরো উচ্চ চেতনা লাভই এই মানব জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এখানে আমরা জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে যত বেশি চেতনা-সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবো, তত বেশি লাভবান হবো। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে~ এখান থেকে চলে যাবার সময় কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবেনা, একমাত্র চেতনা ব্যতীত।"

মহাজাগতিক ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ-এর সারসংক্ষেপ হলো~
"নিয়তি (বা ভাগ্য) আর কিছুই নয় তা হলো, একটি আদি ঘটনা থেকে ক্রমাগত একের পর এক উৎপন্ন হতে থাকা ধারাবাহিক ঘটনাবলী, যে ঘটনাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পূর্বনির্ধারিত হয়ে গেছে আদি ঘটনার শুরুতেই।

শর্ত হলো এক্ষেত্রে এই ঘটনা ক্রমের মধ্যে বাইরের থেকে অন্য কোনো ঘটনা বা শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে না।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রাথমিক ঘটনা থেকেই পরবর্তীতে সকল ঘটনা ও সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

এই মহাজাগতিক ঘটনা ক্রমের মধ্যে বাইরের থেকে কোনো শক্তি বা ঘটনা প্রযুক্ত হয়নি।

এর বাইরের থেকে ঈশ্বর নাম্নী কোনো কাল্পনিক সত্তা এখানে ইন্টারফেয়ার করতে আসেনি। আসলে কোনো ঈশ্বর এই মহাজগত সৃষ্টি করেনি। এই মহাজগত নিজেই আমাদের স্রষ্টা বা ঈশ্বর।

মহাসৃষ্টির সেই আদি ঘটনা থেকে যেমন নিয়তি নামে একটি জাগতিক ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে, তেমনি একই সাথে জন্ম নিয়েছে 'সময়' নামে একটি অস্তিত্ব।"

"এই মহাবিশ্ব ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়নি, সে নিজেই ঈশ্বর। আর, তার সৃষ্টিকর্তা হলো আদিসত্তা~ পরমাত্মা।"

"সমগ্র মহাবিশ্ব অস্তিত্বই হলো আমাদের স্রষ্টা বা প্রকৃত ঈশ্বর। এই বিশ্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে একটি মন, সে-ই হলো ঈশ্বর মন বা কসমিক মাইন্ড। এই মহাজগতে বিশ্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমরা তথা সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের অংশ। আমরা নিজেকে সঠিকভাবে জানতে পারলে তবেই ঈশ্বরকে জানতে পারবো তার স্বরূপে। তথাকথিত স্রষ্টা বা কাল্পনিক ঈশ্বরের পিছনে ছুটে চলা মনুষ্যোচিত কর্ম বা ধর্ম নয়।"

মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে সাথেই 'ভাগ্য' ও 'সময়' অস্তিত্ব দুটি একই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে, এবং এরা উভয়েই জাগতিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। 'মহাকাশ' অস্তিত্বেরও জন্ম হয়েছে ওদের সঙ্গেই। আমাদের জীবনে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

'ভাগ্য' হলো মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতেই স্বয়ংসৃষ্ট এক অনৈচ্ছিক ভবিষ্যত নির্ধারক স্বয়ংক্রিয় জাগতিক ব্যবস্থা। বিস্ফোরণের মূহুর্তেই নির্ধারিত হয়ে যায়~ ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে কখন~ কোথায়~ কি~ ঘটবে।

'সময়' হলো একের পর এক ঘটে চলা (পরিবর্তন সূচক) ক্রিয়া বা ঘটনাগুলির মধ্যেকার দূরত্ব বা অবকাশ বা দৈর্ঘ্যের পরিমাপ স্বরূপ একটি বিশেষ অস্তিত্ব। গতি বা ক্রিয়া থেকেই সময়ের জন্ম হয়। যেখানে ক্রিয়া বা গতি নেই, সেখানে 'সময়'-ও নেই। সময় অস্তিত্বটি গতি বা ক্রিয়ার সাথে প্রায় একাকার হয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। তাই সময় একটি গতিশীল অস্তিত্ব।

সমগ্র মহাবিশ্ব অস্তিত্বই হলো আমাদের স্রষ্টা বা ঈশ্বর। এই বিশ্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে একটি মন, সে-ই হলো ঈশ্বর মন বা কসমিক মাইন্ড। এই মহাজগতে বিশ্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমরা তথা সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের অংশ। আমরা নিজেকে সঠিকভাবে জানতে পারলে তবেই ঈশ্বরকে জানতে পারবো তার স্বরূপে। তথাকথিত কাল্পনিক ঈশ্বরের পিছনে ছুটে চলা মনুষ্যোচিত কর্ম বা ধর্ম নয়।

'মহাবাদ' বর্ণিত মহা সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টিবাদ অনুসারে আদিসত্তা পরমাত্মা~ নিজেকে হারিয়ে~ পুনরায় নিজেকে খোঁজার খেলাই হলো মহাসৃষ্টিবাদ-এর অন্তর্নিহিত কথা।

আমরা যাকিছু করি, সবকিছুই জাগতিক ব্যবস্থা বা ভাগ্য দ্বারা করিত হই বা করতে বাধ্য হই। তাই আমাদের কর্ম ও কর্মফলের জন্য আমরা ঈশ্বরের  কাছে  দায়ী নই। ঈশ্বর~ সেও অনেকাংশে ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। বলা যায়, ভাগ্য ঈশ্বরের থেকেও বলবান।

"এই মহাজগৎ সৃষ্টির শুরুর সেই আদি ঘটনা থেকেই সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি হয়েছে এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এখানে যা কিছু ঘটেছে~ ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে~ সমস্তকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে সৃষ্টির শুরুর মূহুর্তে সেই আদি ঘটনার মাধ্যমেই। পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় এই ঘটনাবলীকেই আমরা নিয়তি বা ভাগ্য নামে অভিহিত করে থাকি।"

আমাদের শরীর ও মনের অভ্যন্তরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটতে থাকা অনৈচ্ছিক কার্যকলাপ বা ঘটনাগুলি যেমন, বিশ্বরূপ ঈশ্বর শরীর ও মনের মধ্যে ঘটে চলা অধিকাংশ কর্মকাণ্ডগুলি ঠিক তেমনই। আমরা তথা সমস্ত জীব ঈশ্বর উপাদানে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হলেও, আমাদের অস্তিত্ব আসলে ভাগ্যের অবদান।

আমরা সবাই একই পথের পথিক, ক্রমবিকাশমান চেতনার পথে। অস্ফুট চেতন-স্তর থেকে পূর্ণ চেতনার লক্ষ্যে এগিয়ে চলাই হলো মানবজীবন তথা মহাজীবনের অন্তিম লক্ষ্য।   —মহর্ষি মহামানস

"মানবধর্মই 'মহাধর্ম'। বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপই হলো 'মহাধর্ম'। মানবধর্মই একমাত্র চিরন্তন ধর্ম।"

'মহাবাদ' এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য  অংশ হলো, মানবধর্ম, 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক মানববিকাশ মূলক ধর্ম, যুক্তিসম্মত অধ্যাত্মবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ব, মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা, এছাড়াও কিছু অমিমাংশিত বা বিতর্কিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক মতবাদ~ মহাবাদ এর শেষ কথা হলো, "মহাবাদ কখনোই শেষ কথা বলেনা।" "চেতনার ক্রমবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। মাঝপথে থেকে সম্পূর্ণ পথের জ্ঞান অসম্ভব।"

"জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন~ স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন কর্তা স্বরূপ একটা অহং চেতন সত্তা রূপে বোধ করে থাকি বা গণ্য করে থাকি। যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাবের কারণে আমরা বুঝতে পারিনা যে আমাদের এই অস্তিত্ব, আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, আচরণ ও কার্যকলাপ সমস্তই বহু কিছুর উপর নির্ভরশীল এবং বহু কিছুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে চলেছে।

মানবকেন্দ্রিক যাবতীয় সমস্যার শুরু হয়েছে এখান থেকেই। সমস্যার মূল কারণ আমরা দেখতে পাই না। সমস্যার মূলে কি আছে, তার খোঁজ করি না। আমরা অজ্ঞান-অন্ধের মতোই তার শাখা-প্রশাখাতেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াই।

একটা ঘটনা থেকে জন্ম নেয় বহু ঘটনা। সেইসব ঘটনাগুলো থেকে সৃষ্টি হয় আরো অনেক ঘটনা। আবার সেই ঘটনাগুলি থেকে জন্ম নেয় অজস্র ঘটনাবলী। এইরূপে পরম্পরাগত ভাবে অসংখ্য ঘটনার সৃষ্টি হয়ে চলেছে অবিরত। আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব সেই পরম্পরাগত ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহেরই ফসল। শুধু তাই নয়, আমরা এবং আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ জগতব্যাপী ঘটনা প্রবাহের অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের অবুঝ মন তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।"

"আমরা মোটেও কোনো স্বাধীন~ স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন সত্তা নই। আমাদের অস্তিত্বসহ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ~ স্বয়ংক্রিয় জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ রূপ জাগতিক ব্যবস্থা বা ভাগ্যের অধীন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান-অন্ধ অহংবোধ সম্পন্ন মন তা মানতে চায় না।"

"এই মহাজগৎ সৃষ্টির শুরুর সেই আদি ঘটনা থেকেই সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি হয়েছে এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এখানে যা কিছু ঘটেছে~ ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে~ সমস্তকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে সৃষ্টির শুরুর মূহুর্তে সেই আদি ঘটনার মাধ্যমেই। পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় এই ঘটনাবলীকেই আমরা নিয়তি বা ভাগ্য নামে অভিহিত করে থাকি।"

"অত্যন্ত জটিল শারীরিক যন্ত্রপাতিসহ জীবের মন সফ্টওয়্যারটি নিজে নিজেই তৈরি হয়নি, এর পিছনে রয়েছে একজন মহান স্রষ্টা। কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্তা কাল্পনিক কোনো ঈশ্বর নন। মহাজাগতিক মন নিয়ে এই মহাজাগতিক অস্তিত্বই হলো সেই সৃষ্টিকর্তা।"

"অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত এবং অনেকটাই চেতনা সম্পন্ন মানুষ এই মূল তত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং অজ্ঞানতা জনিত অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে আরো বেশি করে সত্য উপলব্ধী করার জন্য এবং আরও ভালো জীবন লাভের জন্য আত্মবিকাশ লাভে প্রয়াসী হবে।"

"অনেকেই বলে থাকেন, সাম্যবাদ বা কমিউনিজম তথা প্রচলিত বাম আন্দোলনই নাকি একমাত্র মুক্তির পথ। কিন্তু তা বাস্তব সত্য নয়। মানুষের মনোবিকাশ ঘটিয়ে, তাকে অজ্ঞানতা ও অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারবে যে পথ ও পদ্ধতি, সেই হলো একমাত্র মুক্তির উপায়।

প্রচলিত বা তথাকথিত বাম আন্দোলন নয়, আমরা চাই প্রকৃত বাম আন্দোলন~ প্রকৃত মানববিকাশের জন্য। নিম্নগামী স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা বা এগিয়ে চলাই হলো বামপন্থা। বামপন্থী হতে হলে যে তাকে কমিউনিষ্ট হতে হবে, এমন নয়।"

মানুষের জ্ঞান ও চেতনার বৃদ্ধি ঘটাতে সঠিক মনোবিকাশ শিক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে, স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প চেতনা সম্পন্ন অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোকে অলীক মুক্তির জন্য খেপিয়ে তোলার বাম আন্দোলন কখনোই সফল হবে না।

প্রচলিত বাম আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালোভী শোষকশ্রেণীর মতোই শাসক ও শোষক শ্রেণীর সুবিধাবাদী এক দল নেতা তৈরি করে থাকে। কারণ তাদেরও তো মনের বিকাশ ঘটেনি। ফলে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটে না। মানুষ যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই থেকে যায়। চেতনার স্বল্পতা ও অন্ধ বিশ্বাসের কারণে কিছু মানুষ এ' কথার মর্মার্থ বুঝতে আজ অক্ষম হলেও আগামী দিনে ঠিকই বুঝতে পারবে।

প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলন ঘটাতে হলে, এ' যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ~ 'মহাবাদ' -এর পথ অবলম্বন করতেই হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।"

সুমেরু রে ওরফে মহর্ষি মহামানস প্রকৃত মানব বিকাশের লক্ষ্যে প্রায় সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে, নিরলস গবেষণা এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি 'মহামনন' নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মনোবিকাশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। আপনি যদি এই সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হন, অনুগ্রহ করে একটি Google search করুন: Maharshi MahaManas, MahaManan, MahaDharma, Sumeru Ray

মানবধর্মই 'মহাধর্ম'। বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপই হলো 'মহাধর্ম'।

সুসংবাদ!
যুগসন্ধিক্ষণের এই গভীর সঙ্কটকালে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে, মুক্তিসূর্য রূপে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের প্রকৃত ধর্ম~ মহাধর্ম। একে সাদরে গ্রহণ করতে হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। মহাধর্ম প্রচলিত ধর্মের মতো কোনো ধর্ম নয়। আত্মবিকাশ বা চেতনার বিকাশ লাভ ও সুস্থতা লাভের জন্য আত্মবিকাশ যোগ অনুশীলন করাই হলো এই ধর্মের অনুশীলন বা ধর্ম পালন করা।

মহাবাদ কি একটি বামপন্থী মতবাদ?

হ্যাঁ, মহাবাদ প্রকৃত মানব মুক্তির একটি স্বতন্ত্র বামপন্থী মতবাদ। তবে বামপন্থী মানেই কমিউনিস্ট নয়। পরম্পরাগত নিম্নগামী স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যে, অথবা স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে যেতে পারে যে, সে-ই হলো বামপন্থী।

যেটা চালু সিস্টেম বা পরম্পরাগত স্রোত, সেটাই হলো ডানপন্থা। সেই স্রোতে ভেসে যায় যে সেই হলো ডানপন্থী। তার বিরুদ্ধে বা বিপরীতে যাওয়াটাই হলো বামপন্থা।
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন প্রথাগত নিয়ম-নীতি, শাস্ত্র, সিস্টেম বা ব্যবস্থা প্রভৃতির কাছে নির্বোধের মতো বশ্যতা স্বীকার ক'রে, অন্ধবিশ্বাসে নির্বিচারে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে চলাই হলো দক্ষিণপন্থা।

আর সেগুলোকে যুক্তি-বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তার মধ্যে থাকা বাস্তব-অবাস্তব, সত্য-মিথ্যা উপলব্ধি ক'রে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধিতা করাই হলো বামপন্থা। ডানপন্থা সেই বিরোধিতা মেনে না নেওয়ার ফলে, একশ্রেণীর মানুষ শুরু করে ভিন্ন পথে চলা। কখনো কখনো সে পথ বিপরীতমুখিও হতে পারে। সাম্যবাদ বা কমিউনিজম সম্পর্কে মহাবাদ তার নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করে, নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

প্রচলিত বাম আন্দোলন নয়, আমরা চাই প্রকৃত বাম আন্দোলন প্রকৃত মানববিকাশ এবং মানবমুক্তির জন্য।

সাম্যবাদ বা কমিউনিজম তথা প্রচলিত বাম আন্দোলনের পথে মানবমুক্তি সম্ভব নয়। মানুষের মনোবিকাশ ঘটিয়ে, তাকে অজ্ঞানতা জনিত অন্ধত্ব ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি দিতে পারবে যে পথ ও পদ্ধতি, সেই হলো একমাত্র মুক্তির উপায়।

মানুষের জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ না ঘটিয়ে, সঠিক মনোবিকাশ শিক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে, স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প চেতনা সম্পন্ন অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোকে অলীক মুক্তির জন্য খেপিয়ে তোলার বাম আন্দোলন কখনোই সফল হবে না। প্রচলিত সাম্যবাদীরাও অন্ধবিশ্বাসী। তারা বলে থাকেন, তাদের মতবাদই শেষ কথা। তাদের পথই একমাত্র মুক্তির পথ।

মহাবাদ কখনও শেষ কথা বলেনা। এই পথ অন্ধবিশ্বাসের পথ নয়। এই মতবাদ বিকাশ পথ ধরে, সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ আরও উন্নত ও বিকশিত হওয়ার কথা বলে। পরিবর্তনশীল এই জগতে কোনকিছুই চিরসত্য নয়। তাই সে আপাত সত্যের হাত ধরে পূর্ণ সত্যের লক্ষ্যে এগিয়ে চলে।

প্রচলিত বাম আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালোভী শোষকশ্রেণীর মতোই শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থপর সুবিধাবাদী এক দল নেতা তৈরি ক'রে থাকে। কারণ তাদেরও মনের বিকাশ ঘটেনি বা ঘটানো হয়নি। ফলে প্রচলিত বামপন্থার পথে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটে না। মানুষ পূর্বে যে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছিলো সেই অন্ধকারেই থেকে যায়।

প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলন ঘটাতে হলে, এ' যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ~ 'মহাবাদ' -এর পথ অর্থাৎ জনগণের মনোবিকাশের পথ অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া এখনো পর্যন্ত আর কোনো উৎকৃষ্ট পথ আমাদের সামনে নেই।

মহর্ষি মহামানসের মহান সৃষ্টিতত্ত্ব

।। মুখবন্ধ।।

আমার সৃষ্টিতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা হলো, এখানে বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে এই মহাবিশ্বের মধ্যে ক্রমশ বিকাশমান চেতনা সম্পন্ন একটি অত্যুচ্চ চেতন-মন রয়েছে। বহিরাগত কোনো চেতন সত্তা বা ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনি, সেটি নিজেই ঈশ্বর (যদি তাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়)। ঈশ্বর শুধু বিচিত্র জীব ও উদ্ভিদের স্রষ্টা মাত্র। এ সমস্ত সৃষ্টির পিছনে যে একটি অত্যন্ত উচ্চ বুদ্ধিমান মন উপস্থিতি রয়েছে, তা পরবর্তীতে বিশদভাবে আলোচনাকালে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এছাড়া, এই বিশ্বসত্তা বা বিশ্ব-মন বা ঈশ্বর সমস্ত জাগতিক ঘটনার নিয়ন্তা নয়, নিয়তি নামক স্বয়ংক্রিয় জাগতিক ব্যবস্থার দ্বারা ঘটনা ক্রমে সমস্ত কিছু পূর্বনির্ধারণ মতো ঘটে চলেছে। এমনকি ঈশ্বরও নিয়তির অধিন। মহা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্বের জন্ম মূহুর্তেই নিয়তি নামক এই জাগতিক ব্যবস্থাটির উৎপত্তি হয়েছে।
আমার প্রায় সব তত্ত্বই যুক্তি ও বিজ্ঞানের পথে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছে।

মহাজগত সৃষ্টির প্রেক্ষাপট এবং মহাজগত সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত একে একে সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হয়েছে এখানে।

ফিজিক্স ও কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ফোটন ও ইলেক্ট্রনের অস্বাভাবিক আচরণ আমরা লক্ষ্য করেছি। তাদের দিকে তাকালে তারা এক রকম আচরণ করছে, আবার তাদের দিকে না তাকালে তারা অন্য রকম আচরণ করছে! এই পরীক্ষা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাদের মধ্যে চেতনা বা বোধ ক্ষমতা রয়েছে। মহাবিশ্বের মন ও চেতন অস্তিত্বের এটা হলো একটি বড় প্রমাণ। মহাজাগতিক মন ও তার বুদ্ধিমত্তার আরও অনেক প্রমাণ আমরা ক্রমশ পেতে থাকবো।

এই মহাবিশ্ব রূপী চেতনা সমুদ্রের প্রতিটি কণা, প্রতিটি এককের মধ্যেও চেতনা বর্তমান। আমাদের চেতনা খুবই কম হওয়ায় আমরা তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। চেতনা কে উপলব্ধি করতে হয় উচ্চ চেতনা দিয়ে, আর মনকে উপলব্ধি করতে হয় উচ্চ চেতনা সম্পন্ন মন দিয়ে। চেতনা হলো 'মন' সফটওয়্যারের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য। চেতনা থাকলে সেখানে মন থাকবে। সেই 'মন' নিম্ন চেতন স্তরের 'মন' হতে পারে, আবার উচ্চ চেতন স্তরের 'মন' হতে পারে। স্বল্প ক্ষমতার ক্ষুদ্র আকৃতির মনই হোক আর বৃহৎ আকৃতির উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মনই হোক, তা আসলে একটি মন।

আমাদের মস্তিষ্ককে বহুগুণ থেকে আরও বহুগুণ বড় করে দেখলে সেটি মহাবিশ্বের মতোই দেখাবে। আমাদের এই মস্তিষ্কের মধ্যে যেমন 'মন' সফটওয়্যার রূপে একটি চেতন সত্তা রয়েছে, মহাবিশ্বের মধ্যেও তেমনই একটি মন আছে। সে-ই হলো বিশ্ব-মন। এই মহাবিশ্বই হলো আমাদের স্রষ্টা।
এর বাইরে স্রষ্টা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। স্রষ্টা তার বিশ্বরূপ শরীর ও তার মন উপাদান থেকেই জীব তথা মানুষ সৃষ্টি করেছে।

স্রষ্টা কৃত আমাদের এই মন-সফটওয়্যার এবং তারমধ্যে তৎকর্তৃক অন্তর্গ্রথিত করে দেওয়া প্রোগ্রামিং অনুযায়ী আমরা যাবতীয় কাজ করে থাকি। স্রষ্টা যদি চাইতো, আমরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তার উপাসনা করি, এবং যদি সে আমাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পথে পরিচালিত করতে চাইতো, সেক্ষেত্রে স্বভাবতই সেইরূপ প্রোগ্রাম সে আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিতো। তার জন্য আলাদা করে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের শাস্ত্র রচনা করার প্রয়োজন হতোনা তার। আসলে এসবই ধর্ম ব্যবসায়ীদের কারসাজি।

এই মহাবিশ্বরূপ স্রষ্টাকে মহাসাগর রূপে কল্পনা করলে, আমরা হলাম তারমধ্যে এক এক বিন্দু জল স্বরূপ। এই মহাসাগরকে জানতে, সর্বাগ্রে— তার কয়েক বিন্দু জল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমাদের। আমরা নিজেকে এবং নিজের চারিপাশকে সঠিকভাবে যত বেশি জানতে পারবে, মহাবিশ্ব রূপী স্রষ্টাকে জানতে পারবে তত বেশি।

স্রষ্টা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনি। এই মহাবিশ্ব নিজেই স্রষ্টা। এই মহাবিশ্বের বাইরে একমাত্র কাল্পনিক স্রষ্টা ব্যতীত আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

মহাবিশ্ব রূপী স্রষ্টার শরীরের মধ্যে রয়েছে একটি মন। সেই হলো~ বিশ্ব-মন বা কসমিক মাইন্ড। সেই মহান শিল্পী~ বিশ্ব-মন~ তার নিজের দেহ ও মন উপাদান দিয়েই একেরপর এক সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদ। এই মহাবিশ্ব প্রকৃতিই আমাদের স্রষ্টা। এই মহাবিশ্ব রূপী 'শরীর' আর এই মহাজাগতিক 'মন' মিলে একত্রে স্রষ্টার অস্তিত্ব। বিশ্ব-প্রকৃতি আর আমাদের স্রষ্টা আসলে একই। আমাদের স্রষ্টা কোনো রূপকথার গল্পের মহানায়ক নয়।

এই মহাবিশ্ব— আমাদের স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট নয়, সে নিজেই স্রষ্টা। এই মহাবিশ্বে স্রষ্টার অতিরিক্ত আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। একমাত্র সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন থাকা আদিসত্বা ছাড়া (এ সম্পর্কে আমার সৃষ্টিতত্বে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে)। শুধুমাত্র এর কিছু অংশ— যেমন জীব— উদ্ভিদ প্রভৃতি স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। যদিও স্রষ্টা এদের সৃষ্টি করেছে তার নিজের শরীর উপাদান থেকেই। আমাদের মনও সৃষ্টি হয়েছে— বিশ্ব-মন বা কসমিক মাইন্ড থেকে। শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হয়নি। আপনাআপনি কিছু সৃষ্টি হয়নি। আমরা সবাই স্রষ্টার অর্থাৎ এই মহাবিশ্বেরই অংশ।

এই বিশ্ব-অস্তিত্বই হলো আমাদের স্রষ্টা। যা সৃষ্ট হয়েছে আদিসত্বা বা পরমাত্মা~ (সংস্কৃততে ব্রহ্ম) থেকে। এই আদিসত্বা সরাসরি আমাদের স্রষ্টা নয়, এবং এই জাগতিক কর্মকান্ডে তার বিশেষ ভূমিকা নেই। এই বিশ্ব-লীলায় আদিসত্বা হলো নিরব নির্বিকার ও প্রচ্ছন্ন দর্শকের মতো। আদিসত্বা~ পরমাত্মা কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ নয়। পূর্ণতা হলো~ পূর্ণ স্থির নিশ্চল~ নিষ্ক্রিয় অবস্থা। পূর্ণতা থেকে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়। সেই পূর্ণ অবস্থায় চাওয়ার কিছু থাকে না, পাওয়ারও কিছু নেই। সেই কারণে করারও কিছু নেই। সৃষ্টির প্রশ্নই আসেনা সেখানে।

আদিসত্বাও পূর্ণ নয়। তারও কিছু চাহিদা~ কিছু অভাব রয়েছে। সে জানেনা, সে~ কে, কেনই বা সে, আর কোথা থেকেই বা সে এসেছে বা তার উৎপত্তি হয়েছে। জানেনা তার পরিণতি কী। এই নিজেকে জানার ইচ্ছাই হলো~ সৃষ্টির আদি কারণ। অগত্যা~ সেই আদিসত্তা~ স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে, পুণরায় তাকে খোঁজা বা আত্মানুসন্ধান করাই হলো~ এই সৃষ্টি লীলার গোপন রহস্য। এই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে আমার আধুনিক কসমোলজি বা মহান সৃষ্টিতত্বে। এছাড়াও এই কসমোলজির একটি অংশ What exactly Destiny is নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স জার্নালে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের স্রষ্টার বুদ্ধিমত্তার বহু প্রমাণ এই পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। যখন আমরা তাকে একটি চেতন সত্তা রূপে উপলব্ধী করতে পারবো, তখন সেই সমস্ত প্রমাণগুলি আমাদের চোখের সামনে একেরপর এক হাজির হতে থাকবে। আর, ক্রমবিকাশমান বিশ্ব-মন বা কসমিক মাইন্ডকে আমাদের স্রষ্টা রূপে চিনতে পারলে, এবং তার চেতনার বিকাশের সাথে সাথে তার দ্বারা সৃষ্ট ক্রমোন্নত জৈবিক শিল্পকে বুঝতে পারলে তখন প্রচলিত বিবর্তনবাদ অনর্থক হয়ে পড়বে।
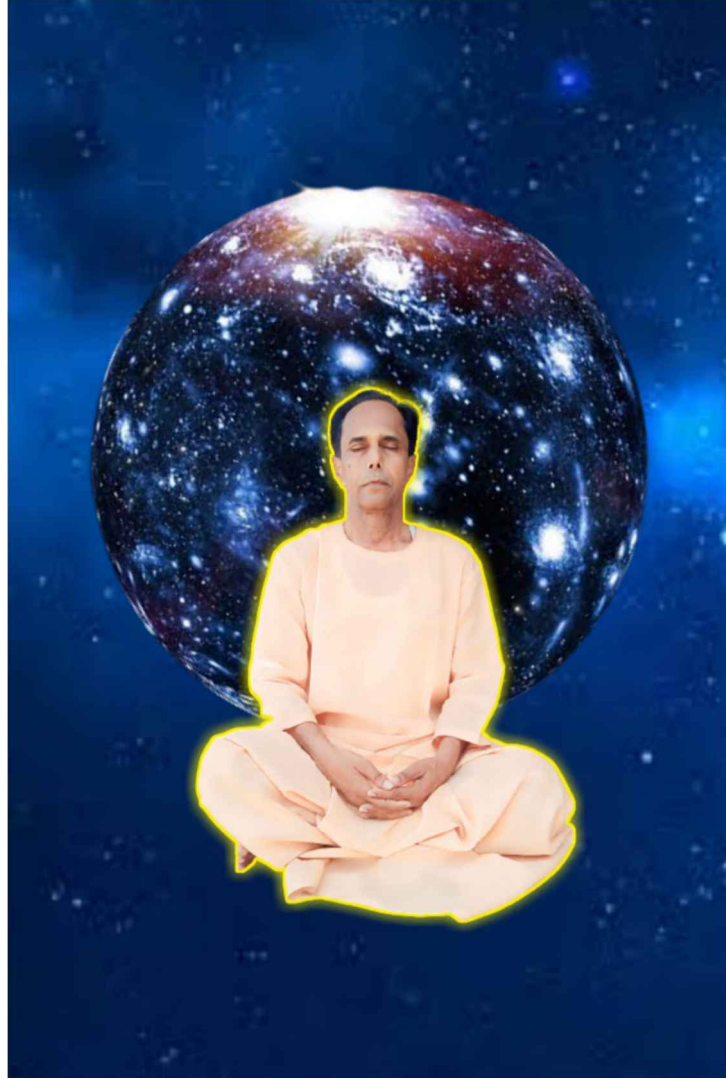
স্রষ্টা বা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কি!

কাল্পনিক ঈশ্বর এবং বাস্তবিক ঈশ্বর সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস।
~সম্পাদক

মহর্ষি মহামানস বলেন, আমরা সবাই একই চেতন-স্তরে অবস্থান না করার ফলে, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণাও সবার ক্ষেত্রে একরূপ নয়। আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বর, আর প্রচলিত ধর্মীও ঈশ্বর একরূপ নয়। যখন তুমি নিজেকে নিজের স্বরূপে জানতে পারবে, একমাত্র তখনই তুমি ঈশ্বরকে তার প্রকৃত রূপে বা স্বরূপে জানতে সক্ষম হবে অনেকাংশে।

এই বিশ্বপ্রকৃতি হলো আমাদের স্রষ্টা। মহাবিশ্বরূপ স্রষ্টা বা ঈশ্বরকে— মহাসাগররূপে কল্পনা করলে, তুমি হলে তার একবিন্দু জল বা পাণি স্বরূপ। এই মহাসাগরকে জানতে, সর্বাগ্রে— তার কয়েক বিন্দু জল বা পাণি সম্পর্কে

জ্ঞান অর্জন করতে হবে তোমাকে। তুমি নিজেকে এবং নিজের চারিপাশকে সঠিকভাবে যত বেশি জানতে পারবে, ঈশ্বরকেও জানতে পারবে তত বেশি।

একালের প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক~ মহর্ষি মহামানস বলেন, ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনি। এই মহাবিশ্ব নিজেই ঈশ্বর। এই মহাবিশ্বের বাইরে একমাত্র কাল্পনিক ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই।

মহাবিশ্ব রূপ ঈশ্বর শরীরের মধ্যে রয়েছে একটি মন। সেই হলো~ বিশ্ব-মন বা বিশ্ব-আত্মা বা কসমিক মাইন্ড। সেই মহান শিল্পী~ বিশ্ব-মন~ তার নিজের দেহ ও মন উপাদান দিয়েই একেরপর এক সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদ। তিনি জানান, এই মহাবিশ্ব প্রকৃতিই আমাদের স্রষ্টা।

মনকে জানতে ও বুঝতে হয় মন দিয়ে। তার জন্য চাই যথেষ্ট চেতনা সমৃদ্ধ বিকশিত মন। মহাজাগতিক মন বা বিশ্ব-মনকে বুঝতে হলে প্রয়োজন আরও অনেক বেশি চেতনা সম্পন্ন মন। যে ব্যক্তি তার নিজের মন সম্পর্কেই সচেতন নয়, মন সম্পর্কে যার স্পষ্ট ধারণা নেই, সে অপরের মনকে জানতে পারবে না। বিশ্ব-মনকে জানা তো বহু দূরের কথা।

মহর্ষি মহামানস এর মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ' বা মহাইজ্ম্ এর মধ্যেই রয়েছে তার সর্বাধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব। মহাবিশ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে তার আত্ম-দর্শনে। সেখানে সৃষ্টি রহস্য ছাড়াও আরও অনেক রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। যা একজন মহাকাশ বিজ্ঞানীকেও হতবাক করে তুলতে পারে।

তার এই দর্শন এর একটি অংশে, তিনি ভাগ্য বা নিয়তি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ভাগ্য বা নিয়তি আসলে কী, এই নামে তার একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেছে। সেখানে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, ভাগ্য বা নিয়তি হলো~ মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে যাওয়া,
একেরপর এক সৃষ্ট পরম্পরাগত ঘটনা ক্রমের এক বিশেষ অনৈচ্ছিক মহাজাগতিক ব্যবস্থা। এর পিছনে কোনো নিয়ন্ত্রক সত্তা বা ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই। এমনকি ঈশ্বরও এই পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের অধীন। ভাগ্য ঈশ্বরের থেকেও বলবান।

আমরা মনে করি, বিশ্ব-মন বা ঈশ্বর এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেনি। সে নিজেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড। তবে তার পিছনে সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টিরহস্য আছে। এ'নিয়ে আমাদের 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন' নামক সৃষ্টিতত্ত্বে যথাসম্ভব বর্ণনা করা হয়েছে। এই দর্শনে আমরা দেখেছি, বিশ্ব-আত্মা বা ঈশ্বর শুধু উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে এই জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ, সে আবার সৃষ্টি করেছে অনেক কিছু।

আমরা 'মহাবাদ' ও 'মহাধর্ম'-এর অনুসরণকারীগণ আমাদের স্রষ্টাকে বলি, বিশ্ব-মন বা মহামানস। আমাদের 'বিশ্ব-মন' আর প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন নামে 'ঈশ্বর' একরূপ নয়। আমরা 'মহাবাদ' ও 'মহাধর্ম'-এর অনুগামীগণ মনে করি, এই মহাবিশ্ব হলো ঈশ্বরের শরীর, এবং এই শরীরের মধ্যে রয়েছে একটি মন, তা-ই হলো ঈশ্বর-মন। এই মহাবিশ্বরূপ 'শরীর' আর এই মহাজাগতিক 'মন' মিলে একত্রে ঈশ্বর অস্তিত্ব। বিশ্ব-প্রকৃতি আর আমাদের ঈশ্বর আসলে একই। আমাদের ঈশ্বর কোনো রূপকথার গল্পের মহানায়ক নয়।

এই মহাবিশ্ব— ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নয়, সে নিজেই ঈশ্বর। এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর অতিরিক্ত আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। একমাত্র সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন থাকা আদিসত্বা ছাড়া। শুধুমাত্র এর কিছু অংশ— যেমন জীব— উদ্ভিদ প্রভৃতি ঈশ্বর

কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। যদিও ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেছে তার শরীর উপাদান থেকেই। আমাদের মনও সৃষ্টি হয়েছে— বিশ্ব-মন বা ঈশ্বর-মন থেকে। শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হয়নি। আমরা সবাই ঈশ্বরের অর্থাৎ এই মহাবিশ্বেরই অংশ।

এই বিশ্ব-অস্তিত্বই হলো ঈশ্বর। যা সৃষ্ট হয়েছে আদিসত্বা থেকে। এই আদিসত্বা ঈশ্বর নয়, এবং এই জাগতিক কর্মকান্ডে তার বিশেষ ভূমিকা নেই। এই বিশ্ব-লীলায় আদিসত্বা হলো নিরব নির্বিকার ও প্রচ্ছন্ন দর্শকের মতো। আদিসত্বা কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ নয়। পূর্ণতা হলো~ পূর্ণ স্থির নিশ্চল~ নিষ্ক্রিয় অবস্থা। পূর্ণতা থেকে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়। সেই অবস্থায় চাওয়ার কিছু থাকে না, পাওয়ারও কিছু নেই। সেই কারণে করারও কিছু নেই। সৃষ্টির প্রশ্নই আসেনা সেখানে।

আদিসত্বাও পূর্ণ নয়। তারও আছে কিছু চাহিদা~ কিছু অভাব। সে জানেনা, সে~ কে, কেনই বা সে, আর কোথা থেকেই বা সে এসেছে বা তার উৎপত্তি হয়েছে। জানেনা তার পরিণতি কী। এই নিজেকে জানার ইচ্ছাই হলো~ সৃষ্টির আদি কারণ। অগত্যা~ সেই আদিসত্তা~ স্ব-ইচ্ছায় আত্ম-সম্মোহনের মাধ্যমে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, পুণরায় নিজেকে খোঁজা বা আত্মানুসন্ধান করাই হল~ এই সৃষ্টি লীলার গোপন রহস্য।

## মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন

পরমশূন্য! আদি-অন্তবিহীন— নিরাকার প্রকৃত শূন্য! আমাদের জানা মহাশূন্য নয়—। মহাবিশ্ব বা ঐশ্বরীয় এলাকা ছাড়িয়ে— আদিসত্তার অঞ্চল (বা ব্রহ্মাঞ্চল) পেরিয়ে বিদ্যমান যে অনন্ত আকাশ— সেই পরম শূন্য। নিস্তব্ধ—নিস্তরঙ্গ—নির্বিকার— অস্তিত্বহীন এক অস্তিত্ব। শূন্যাস্তিত্ব! অপরিবর্তিত— অবিনাশী—অবিচল সেই শূন্যে— এখানের কোনো সচল বস্তু বা শক্তি প্রবেশ করতে অক্ষম।

সেই পরম শূন্যের মাঝে, একটি নির্দিষ্ট সীমা নিয়ে আদিসত্তা— পরমাত্মার অবস্থান। সে এখন* লীলা অবসানে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সেই আদিসত্তার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে মহাসৃষ্টি। বহুসংখ্যক মহাবিশ্ব নিয়ে এই মহাসৃষ্টি। তারমধ্যে একটি হলো আমাদের এই মহাবিশ্ব। আদিসত্তা— পরমাত্মা প্রধানত আদিকণা — পরমকণা — আদিশক্তি দিয়ে গঠিত। এছাড়াও তা' আদি বস্তুকণা, অসংখ্য যুগ্মকণা এবং বিকিরণে পরিপূর্ণ। পরমাত্মার অধিক অংশই পরমাণু— অতিপরমাণু, আদি শক্তিকণা ও তার বিপরীত কণা দিয়ে গঠিত অসংখ্য যুগ্মকণা এবং

নানা বিকিরণে পূর্ণ। এদের সাথে মিলেমিশে রয়েছে আরও অনেক বস্তু— অবস্তু, অন্যবস্তু। যেমন— পরম-পদার্থ, দিব্য-পদার্থ ও চেতনা। আদি চেতনা— পরম চেতনা।

সৃষ্টিপূর্বে— একাবারে আদিতে, দুই প্রকারের আদিকণা উপস্থিত ছিল। একটি হলো— পজেটিভ চার্জ বিশিষ্ট ‘1’ প্রোগ্রামীং কোড এবং '1' ডাইমেনশন সম্পন্ন ‘X’ কণা, আর অপরটি হলো— নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট ‘0’ (জিরো) প্রোগ্রামীং কোড সম্পন্ন এবং জিরো ডাইমেনশন বা ডাইমেনশন বিহীন ‘Y’ কণা। বিভিন্ন সংখ্যক 'X' ও 'Y' কণার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মৌলিক কণা। একাধিক মৌলিক কণা— বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশে মিলিত হয়ে তৈরী হয়েছে বিভিন্নরূপ মৌলিক পদার্থ কণা।

বিভিন্ন মাত্রার ঘূর্ণন— কম্পাঙ্ক এবং চার্জ সম্পন্ন এক একটি মৌলিক কণা— অপরাপর মৌলিক কণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মৌলিক পদার্থ ও শক্তি সৃষ্টি করে থাকে। এই বিভিন্নতার পিছনে নিহিত থাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামীং কোড— ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক আদিকণার উপস্থিতি।

আদিকণা থেকে মৌলিক কণাসহ সমস্ত পদার্থ কণা ও শক্তি কণা এবং তাদের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশে সৃষ্ট বিভিন্ন জাগতিক অস্তিত্বগুলি— সবকিছুর অন্তরেই নিহিত রয়েছে বিভিন্নরূপ 'প্রোগ্রামীং কোড'। কতকটা আমাদের কম্পিউটার প্রোগ্রামীং ল্যাঙ্গুয়েজ— কোড-এর মতোই। আদিকণা থেকে পরবর্তীতে সৃষ্ট বিভিন্ন কম্পাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার কণাগুলিসহ সমস্ত প্রকার জাগতিক অস্তিত্ব— ভিন্ন ভিন্নরূপ অব্যক্ত প্রোগ্রামীং কোড-এরই ব্যক্ত বা মূর্ত রূপ।

বিভিন্ন প্রকার যোগ-বিয়োগ, আদান-প্রদান, গ্রহণ-বর্জন প্রভৃতি আচরণের ফলে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন বহু প্রকারের কণা ও অস্তিত্ব। যেমন— XY, XYY, XXX, YYY, (XY)+(XYY), (XXY)+(XYY) প্রভৃতি বিভিন্ন ভর বিশিষ্ট এবং ভর বিহীন, চার্জ বিশিষ্ট এবং চার্জ বিহীন, শূন্য ডাইমেনশন থেকে বহু ডাইমেনশনাল অস্তিত্ব।

সৃষ্টি হয়— মহাকাশ, পদার্থ, শক্তি, চেতনা প্রভৃতি। মৌলিক কণার মধ্যে পরবর্তীতে রূপান্তরিত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই নিহিত বা সুপ্ত থাকে। এই কণাগুলি রূপান্তরধর্মী এবং কখনো কখনো বৈপরীত্য গুণ সম্পন্ন। মৌলিক কণাগুলির মধ্যে বিভিন্নরূপ যোগ-বিয়োগের ফলে সমবিপরীত এবং আংশিক বিপরীত কণাও সৃষ্টি হয়ে থাকে। মৌলিক কণাগুলি এবং তাদের থেকে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্নরূপ কণাগুলির এক বিশেষ বিন্যাসের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে আদি-মন ও আদি-চেতনাসহ আদিসত্তা— পরমাত্মা।

তা-ই বলে, এই আদিসত্তা— পূর্ণ চেতন-সত্তা বা পূর্ণ চেতনা সম্পন্ন নয়। আর, আদিসত্তা— পরমাত্মা সবদিক থেকেও পুর্ণ নয়। পুর্ণতা হলো একেবারে পূর্ণ অচলাবস্থা। পূর্ণ নিষ্ক্রিয়— নির্গুণ অবস্থা, যা অচেতনতার সমার্থক। যে অবস্থা থেকে কোন সৃষ্টি হতে পারে না। পূর্ণ স্থিতাবস্থা। পূর্ণ চেতন-সত্তার চাওয়ার কিছু থাকে না। পাওয়ারও কিছু নেই। তাই, তার করারও কিছু নেই। স্বয়ং সম্পূর্ণ হলে, সেখানে সৃষ্টি লীলার প্রশ্নই আসেনা। যেখানে লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, চলা নেই— সেখানে সৃষ্টি অসম্ভব।

না, আদিসত্তা— পরমাত্মা পূর্ণ নয়, —তবে প্রায় পূর্ণ। আমাদের নিম্ন চেতনা সাপেক্ষে— আপাতঃ দৃষ্টিতে তাকে পূর্ণ মনে হলেও, প্রকৃত অর্থে তাকে শুধু পরম চৈতন্যময় পরমাত্মা** বলা-ই ঠিক হবে। এখানে একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

তার অন্তরের গভীরে অতি ক্ষীণ মাত্রায় অপূর্ণতা রয়েছে। রয়েছে অতি ধীর এবং সূক্ষ্ম মাত্রায় সক্রিয়তা। তার বহির্ভাগ প্রায় নিস্তরঙ্গ— নিরুত্তেজিত মনে হলেও, রয়েছে চাপা উত্তেজনা। বাস্তবে, পূর্ণতঃ বিরাম এবং পূর্ণ সক্রিয়াবস্থা বলে কিছু নেই। সর্বোচ্চ বিরাম বা নিষ্ক্রিয় অবস্থার মধ্যেও অতি সামান্য হলেও থাকে কিছু সক্রিয়তা। বিপরীত ক্ষেত্রেও তা'ই। বিরাম অবস্থা থেকে পুনরায় কর্মারম্ভ হয়, নিদ্রা-জাগরণের মতো।

পরমসত্তা হলো পরমাত্মার দিব্যশরীর সহ দিব্যমন। সামগ্রিকভাবে যা জন্ম-মৃত্যু রহিত— অবিনশ্বর। সাদৃশ্যে মন্ডলাকার। তার কেন্দ্রাভিমুখে ঘনত্ব— তাপ ও চাপ ক্রমশ বেশি।

একসময় পরমাত্মার নিদ্রাকাল শেষ হলো। পরম কালের (মহাকাল নয়) সকাল হলো যেন। নিদ্রাবসানের সাথে সাথে আমাদের যেমন, বিভিন্ন চাহিদা— বিভিন্ন ইচ্ছা জাগ্রত হয়, যেমন— কর্মেচ্ছা, সুখ ও আনন্দ লাভের ইচ্ছা, পূর্ণতা লাভের ইচ্ছা— যা সাধারণ মানুষের অজ্ঞাতে কাজ করে, তার চেতনা সাপেক্ষে— নানা প্রকার হওয়া ও বহু কিছু করা, এবং বহু কিছু পাওয়ার ইচ্ছা রূপে। একাকীত্ব দূর করতে এবং পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে— প্রিয় সঙ্গ লাভের ইচ্ছা জাগে। প্রায় অজ্ঞান মনের অপূর্ণতার চাহিদা মেটাতে এইরূপ ইচ্ছা, —যেন ওকে পেলে বা ঐ বস্তুটা পেলে আমি সুখি হবো— আমি পূর্ণ হবো। আমার একাকীত্ব দূর হবে। এক জীবনে পূর্ণতা লাভ এবং অমরত্ব লাভ সম্ভব নয় বলে, এবং সেইসঙ্গে একাকীত্ব ঘোচানোর উদ্দেশ্য থেকেই সৃষ্ট হয় সন্তান লাভের ইচ্ছা। জীবন ধারণ এবং রসনার সুখ লাভার্থে আহারের ইচ্ছা বা চাহিদা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে আরেকটু বিকশিত হলে, আত্মজীজ্ঞাসা জাগ্রত হলে, তখন আত্মজ্ঞান লাভের এবং সচেতনভাবে বিকাশলাভের ইচ্ছা প্রভৃতি একে একে জাগ্রত হতে থাকে নিদ্রা অবসানে।

পরমাত্মারও— নিদ্রান্তে প্রায় অনুরূপ কিছু চাহিদা ও ইচ্ছার উদ্রেক হলো। আমাদের ইচ্ছাগুলি যেমন মন ও শরীরের নানা চাহিদারই বহিঃপ্রকাশ বা মনঃপ্রকাশ, তেমনই পরমাত্মার ক্ষেত্রেও। ঐ চাহিদার পিছনে রয়েছে তার মন ও শরীরাভ্যন্তরের ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারূপ নানা ঘটনা।

নিদ্রান্তে এইসব চিন্তা-ভাবনা থেকে— পরমাত্মার শরীরাভ্যন্তর কেন্দ্রে ক্রমশ তাপ-চাপ —উত্তেজনা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেখানকার যুগ্ম আদি-কণাগুলি মিলে মিশে, ভেঙেচুরে সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন কণা— নতুন নতুন পদার্থ। ক্রমশ অন্তরের গভীরে চলতে থাকে মহাসৃষ্টির জন্য সৃষ্টি-বীজ তৈরীর প্রস্তুতি।

পরমাত্মা নিজের অবস্থা ভেবে ও বুঝে, আর কোনো গতি না দেখে, অগত্যা, অবশেষে নিজের চাহিদা মেটাতে এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করে। প্রথমে সে (প্রোগ্রামীং কোড-এর মাধ্যমে)— নিজের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র মায়া অস্তিত্ব (ভার্চুয়াল এক্সিস্টেন্স) তৈরী কর— নিজের মধ্যে। তারপর, পরমাত্মার নির্দেশ বা ইচ্ছানুসারে তার দ্বারা সৃষ্ট সেই মায়া-সত্তা— স্ব-অভিভাবন বা আত্ম-সম্মোহনমূলক স্ব-অভিভাবন দ্বারা গভীর যোগনিদ্রার (সম্মোহন-নিদ্রার) মধ্য দিয়ে নিজেকে ঘনীভূত— কেন্দ্রীভূত ক'রে বীজাকার প্রাপ্ত হয়। নিজের রূপ-গুণ-চেতনা, জ্ঞান-শক্তি-ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে বীজ আকারে পরিণত করে সে। নিজেকে অস্ফূট-জ্ঞান বা অজ্ঞান প্রাক-শিশুচেতন— অর্থাৎ ভ্রূণ চেতন স্তরে পর্যবসিত ক'রে, —নিজেকে হারিয়ে ফেলে, পুনরায় নিজেকে খোঁজার— আবিষ্কারের খেলায় মেতে উঠবে ব'লে।

Note______________________

"নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারিয়ে ফেলে, —আবার তাকে খোঁজা-খুঁজির কানামাছি খেলাই হলো সৃষ্টি রহস্যের মূল কথা।" —মহর্ষি মহামানস

**এখন’ কিন্তু বর্তমান কাল নয়, সৃষ্টিপূর্ব কোনো এক সময়।

***আদিসত্তার ক্ষেত্রে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি, এবং মহাবিশ্ব অস্তিত্ব বা বিশ্বাত্মার ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র বোঝানোর সুবিধার জন্য। প্রচলিত 'ঈশ্বর' ধারণার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

---

এরপর, পরমাত্মার সেই মায়া-সত্তা (ভার্চুয়াল এক্সিস্টেন্স) নিজেকে ক্রমশ সঙ্কুচিত ক’রে বীজাকারে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়— পরমাত্মার মধ্যস্থলে। তারপর ক্রমসংকোচনের এক বিশেষ পর্যায়— পরমাত্মার কেন্দ্রস্থলে অকল্পনীয় তাপ—চাপ ও ঘনত্বের ফলে, সেই বহু বিশ্ব-বীজের সমষ্টিরূপ সৃজন-ফলটির মধ্যে ঘটে এক বিস্ফোরণ। আদি বিস্ফোরণ! বিস্ফোরণের মধ্যদিয়ে সেই আদি সৃষ্টি-বীজ ফেটে বহুবিভক্ত হয়ে, সৃষ্টি হয়— বহু বিশ্ব-বীজ।

পরমাত্মার কেন্দ্রস্থল থেকে সেই বিশ্ব-বীজগুলি সবদিকে— কেন্দ্র থেকে সবেগে ছিটকে বেড়িয়ে আসে। বিশ্ব-বীজগুলির মধ্যে— সমসংখ্যক বিশ্ব-বীজ এবং সম-বিপরীত গুণ সম্পন্ন বিশ্ব-বীজ রয়েছে। বিপরীত গুণ সম্পন্ন বীজগুলি একে অপরের সাথে মিলিত হলে, লয় প্রাপ্ত হবে উভয়েই। এরা হলো পরস্পর বিপরীত বিশ্ব-বীজ — অর্থাৎ বিপরীত বিশ্বের বীজ। একসময়, প্রত্যেকটি বিশ্ব-বীজের মধ্যে ঘটলো মহা বিস্ফোরণ, প্রায় একই সময়ে। — অবিলম্বে অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে, কোষ-বিভাজনের মধ্য দিয়ে— ক্রমে মহীরুহ হয়ে উঠতে, তারা শুরু করলো আত্ম-বিকাশের পালা।

বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকলো প্রত্যেকে— বহু মহাবিশ্ব রূপে! তাদের অভ্যন্তরেও নিরন্তর ঘটে চলেছে অসংখ্য বিস্ফোরণ—। ভাঙা-জোড়া, পরিবর্তন, রূপান্তর, নব নব সৃষ্টি—ধ্বংস, অজস্র বিচিত্র ঘটনা।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি কোনকিছু খুব তীব্র গতিতে বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়, সেক্ষেত্রে তা বিস্ফোরণের মতোই মনে হবে।

সৃষ্টি—স্থিতি—গতি—লয়-এর ঘটনাচক্রে এ’সব কিছু ঘটে চলেছে পরমাত্মার শরীরাভ্যন্তরে সৃষ্ট এই মহাবিশ্বগুলির মধ্যে। সদ্যোজাত বিশ্বগুলি বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, এবং প্রত্যেকটি বিশ্ব নিজ নিজ কেন্দ্র থেকে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। ক্রম-প্রসারমান বিশ্বগুলি নিকটবর্তী বিপরীত বিশ্বের সংস্পর্শে এলেই তখন উভয় বিশ্বসহ সমস্ত সৃষ্টি-ই লয় প্রাপ্ত হবে।

আর সে—, সেই আদিসত্তা— পরমাত্মা চুপটি ক’রে উপভোগ করছে— সয়ংক্রিয়ভাবে—পরম্পরাগতভাবে ঘটে চলা— এই সৃষ্টি-লীলা।

এদিকে এরা— বেচারা! নিঃস্বপ্রায় অজ্ঞান-অচেতন— অসহায় শৈশব অবস্থা থেকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে এগিয়ে চলেছে পূর্ণবিকাশ লাভের উদ্দেশ্যে। এই ক্রমবিকাশমান বিশ্বগুলির মধ্যে একটি হলো— আমাদের মহাবিশ্ব! তারমধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ হলো আমাদের এই মানব-গ্রহ— পৃথিবী।

এইভাবে চলতে চলতে— অঙ্কুর থেকে কোষ-বিভাজনের মধ্য দিয়ে একটু একটু ক'রে ক্রমবিকাশের পথ ধরে অবশেষে লাভ করবে তারা পূর্ণ আত্ম-বিকাশ! আদি বীজ-কোষস্থ সফটওয়ারের মাধ্যমে— আদি বীজ-কোষের মধ্যে সাংকেতিক 'প্রোগ্রাম' আকারে নথিভূক্ত থাকা ভবিষ্যত কার্যকলাপের পরিকল্পনার ভিত্তিতে— একের পর এক ঘটতে থাকবে বহু বিচিত্র ঘটনাবলী।

তবে, এই প্রোগ্রামের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য— আত্মানুসন্ধান— আত্মোপলব্ধি— আত্মবিকাশ প্রভৃতি আদি ইচ্ছাগুলি অন্তর্গ্রথিত থাকলেও, কখন কী ঘটবে—, কবে—কোথায়— কার দ্বারা কীভাবে কী ঘটবে, এ'সমস্ত নির্দেশ বিশদভাবে সেখানে উল্লেখ নেই। তাহলে তো খেলার আনন্দই থাকে না! এ'সবই ঘটছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাগ্যক্রমে (ভাগ্য সম্পর্কে বিশদভাবে 'ভাগ্য আসলে কী' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি)।

বিকাশের নানা মাত্রায় একের পর এক ঘটে চলেছে নানা বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা। নানা পরিবর্তন— রূপান্তর, এবং সেই সাথে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও চেতনার ক্রমবিকাশ লাভ।

সৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, —চলছে তার ক্রমবিকাশ। এই অবসরে পরমাত্মার মনের অন্দর-মহলে একটু উঁকি দেওয়া যাক—।

পরমাত্মা নিদ্রান্তে— জাগ্রত হয়ে, বিগত সকালগুলির মতোই আবার কর্মজীবন শুরু করেছে। সে জানে, নতুন ক'রে পাওয়ার কিছু নেই —করারও কিছু নেই। সেই 'থোড় বড়ি খাড়া— খাড়া বড়ি থোড়', —একভাবে জীবন চলছে।

চাওয়ার যে কিছু নেই, তা' নয়। কিন্তু চেয়ে কোনো লাভ নেই—। তাই সে তার সমস্ত চাহিদাকে 'বুকের মাঝে পাষাণ চাপা দিয়ে' শুইয়ে রেখেছে। কিন্তু তা'তে কি হবে, সেই চাহিদার কীট— ভিতরে ভিতরে তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। আনমনা ক'রে তুলছে কখনো কখনো। কখনওবা অস্থির— উত্তেজিত— অসন্তুষ্ট— হতাশাগ্রস্ত— বিষাদ-বিমর্ষ ক'রে তুলছে তাকে।

তবে এ' সমস্তই অত্যন্ত মৃদু প্রকৃতির হৃদয়াবেগ। মাত্রারিক্ত হয়ে ওঠেনি কখনও। তাই বাইরে থেকে আপাতঃ দৃষ্টিতে সে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক পূর্ণ চেতনাময় নির্বিকার সত্তা। যেন, আপনাতে আপনি মগ্ন। শান্ত— সমাহিত— প্রসন্ন, সব পাওয়া— সব হওয়া— সব থাকার এক উজ্জ্বল মহিমামন্ডিত পূর্ণ রূপ!

কিন্তু কি সেই অভাব, কী সেই চাহিদা, যা আজও তাকে সক্রিয়—জীবন্ত ক'রে রেখেছে! যার জন্য হতাশা ভুলতে, আনন্দ—উত্তেজনার আগুন পুইয়ে একঘেয়েমীর শীতলতা কাটাতে, আবার কখনও উত্তেজনা দিয়ে উত্তেজনার প্রশমন ঘটাতে, —একা একাই দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে খেলার আয়োজন করতে হয়েছে তাকে বারবার। কেন, কিসের জন্য—?

এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক, তার ক্ষমতা— অক্ষমতা, জানা— অজানা, ইচ্ছা— অনিচ্ছার কতটা হদিশ পাওয়া যায়।

সে তার ইচ্ছামতো অনেক কিছু করতে পারে। পারে, —তবে তা' শুধু তার অঞ্চলের বা শরীরের মধ্যেই—। তার শরীর-মন অনেকটাই তার নিয়ন্ত্রণাধীন। শরীর-মনের মধ্যে যা কিছু ঘটছে— যা কিছু আছে, সে সম্পর্কে সে অবগত। কিন্তু সে পরম শূন্যপথে অন্যত্র কোথাও যেতে অক্ষম। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তে অক্ষম। সে নিজেকে নিয়েও যা খুশি করতে পারে না। পারে না নিজের আয়তনকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করতে, অথবা নিজেকে দ্বিগুণ বা তার বেশি সত্তায় পরিণত করতে। আর পারে না বলেই, সে নিজের উপাদানে এক ক্ষুদ্র মায়া প্রতিরূপ সৃষ্টি ক'রে, তার মধ্য দিয়েই নিজের ইচ্ছাপূর্তি ঘটিয়েছে বারবার।

তার এই সমস্ত ইচ্ছা কিন্তু অনেকাংশে তার শরীর ও মন নির্ভর। সে শরীর অন্যরূপ— অন্যবস্তু বা অন্য পদার্থে তৈরী হলেও তা' শরীর-ই। আমাদের মতোই তার ইচ্ছাগুলিও উৎপন্ন হয় কার্য-কারণের উপর ভিত্তি করে। তার ইচ্ছাও যথেচ্ছভাবে সৃষ্টি হয় না। সে-ও উৎপন্ন হয় তার শারীরিক-মানসিক গঠন-উপাদান, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও কাল সাপেক্ষে, এবং নেপথ্যে থাকা ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক অজানা শক্তির প্রভাবে।

সে তার শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে জানে। সে জানে, সে কোথাও যেতে অক্ষম। জানে, তার ক্ষয় নেই, বৃদ্ধিও নেই। কিন্তু সে জানে না, তার জন্ম রহস্য! তার শুরু ও শেষ, জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। যেন, তার শুরু নেই— শেষ নেই, —এভাবেই চলছে—চলবে। প্রশ্ন জাগে মনে, তবে কী এই পরমশূন্য থেকেই হয়েছে তার সৃষ্টি?! পরম শূন্যের মধ্যেই কী লুকিয়ে আছে আদিসত্তার সৃষ্টিরহস্য?!

মাঝে মাঝেই প্রশ্ন জাগে, কে— সে, কোথা থেকে— কিভাবে এসেছে বা উৎপত্তি হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে তার জীবন! কি তার পরিণতি! কোথায় শুরু— কোথায় শেষ এই পরম শূন্যের! কে তার স্রষ্টা! কোথাও তার দোসর আছে— কী নেই, এইসব প্রশ্ন জাগে মনে।

পরমশূন্যের মধ্যে অন্যত্র কোথায় কি আছে, কোথায় কি ঘটছে, সে জানে না। সে এটুকু জানে, পরম শূন্যের মধ্য দিয়ে কোনো আলোক, তরঙ্গ, শক্তি, বিকিরণ বা তার জানা কোন কিছুই যেতে বা চলতে সক্ষম নয়। সেখানে দৃষ্টি প্রসারিত হয় না— নিঃসীম অন্ধকার।

সে জানে, কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই, —দেওয়ারও নেই কাউকে কিছু। —এত কিছু সত্ত্বেও তার আলস্য নেই, কারণ তার মধ্যে রয়েছে প্রবলতম জীবনীশক্তি— পরম প্রানশক্তি। আছে তীব্র কর্মেচ্ছা— প্রচন্ড উদ্দীপনা। যার জন্য সে চিরকাল এত সক্রিয়— জীবন্ত!

আপাততঃ অতীত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, অজানা নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে— ঘটমান বর্তমানের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পরমানন্দে সে উপভোগ ক'রে চলেছে তার জীবন। সদানন্দ শিশুর মতোই খেলা নিয়ে মেতে আছে সে। প্রতিবারের মতো, খেলা শেষ হলে, দামাল শিশুর মতোই পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রার কোলে নিজেকে সঁপে দেবে সে— আদিসত্তা—পরমাত্মা।

আর বিশ্বাত্মা** — বিশ্বাত্মা বা ইশ্বর বলতে এখানে, আমাদের বিশ্ব-অস্তিত্বকেই বোঝানো হয়েছে। এই বিশ্ব-অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে একটি মন— বিশ্ব-মন। এখানে 'ঈশ্বর' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে সবার বোঝার সুবিধার্থে। আমরা তাকে 'বিশ্বাত্মা'-ই বলে থাকি।

আমাদের বিশ্বের নিকটবর্তী বিপরীত বিশ্বের মধ্যেও রয়েছে একটি বিশ্ব-মন। আমাদের বিশ্ব —যে বিশ্বে অবস্থান ক'রে— আমি বলছি, তুমি শুনছো। অথবা আমি লিখছি, তুমি পড়ছো। অপর বিশ্বেও তুমি আছো— আমি আছি। এখানে যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটছে— সব কিছু সেখানেও আছে, সেখানেও ঘটছে। সে বিশ্বের সাথে এ' বিশ্বের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ না থাকলেও, আছে এক অদৃশ্য আন্তরীক টান।

বিপরীত কণা দিয়ে গঠিত হলেও, সে বিশ্বের সব কিছু এই বিশ্বের মতোই। সেখানকার 'তুমি' —'আমি' এখানকার তুলনায় বিপরীত গুণ ও চরিত্র বিশিষ্ট নয়। এদের বিপরীত গুণ তখনই বোঝা যাবে, যখন এখানের 'আমি' আর ওখানের 'আমি' অথবা উভয় বিশ্ব পরস্পর প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হবে। মিলিত হবার সাথে সাথেই উভয় 'আমি' সহ উভয় বিশ্বই লয় প্রাপ্ত হবে তখুনি। আবার, এরা বিপরীত ধর্মী হলেও, পরস্পরের প্রতি পরস্পর তীব্র আকর্ষণ বোধ করে থাকে।

এবার আমাদের বিশ্বাত্মার (ঈশ্বরের) দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক—। মহা বিশ্বরূপ শরীর, বিশ্বমন, বিশ্বশক্তি স্বরূপ মহাপ্রাণ-শক্তিসহ সমগ্র বিশ্বসত্তাই— ঈশ্বর (বিশ্বাত্মা)। তার দেহ আছে, মন আছে, আছে নানারূপ কামনা-বাসনা, নানা কর্মকান্ড। সে অধিকাংশ গুণ, শক্তি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা, জ্ঞান-চেতনা প্রভৃতি লাভ করেছে আদিসত্তা—পরমাত্মা থেকে —জন্মসূত্রে। কিন্তু সে সবই সুপ্তাবস্থায় রয়েছে, —রয়েছে বিকাশের অপেক্ষায়।

বিশ্ব-শরীর বলতে এই পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর মতো ছোট-বড় অনেক গ্রহ-উপগ্রহ আর অসংখ্য গ্রহাণু এবং এক বা একাধিক নক্ষত্র নিয়ে গঠিত সৌরজগতের মতো এক একটি নক্ষত্র-জগত। এমনই কোটি কোটি নক্ষত্র-জগত নিয়ে এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জ। আর ঐরূপ লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে এই বিশাল বিশ্বরূপ ঈশ্বর শরীর। এই শরীরের মধ্যে রয়েছে— অদ্ভূত অদ্ভূত কত কী! আদিকণা— পরামানু—অতিপরমানু থেকে আরম্ভ ক'রে ধূমকেতু, নোভা, সুপার-নোভা, ব্ল্যাক-হোল, ডার্ক-ম্যাটার, ডার্ক-এনার্জী প্রভৃতি কতো কী। আছে বহু বিচিত্র জীব, বিভিন্ন প্রকারের চেতন-সত্তা— উদ্ভীদ আর বিচিত্র বিষয়-বস্তু।

মহাকাশ: সমগ্র বিশ্বজুড়ে— একটি বুদবুদ (Bubble)-এর মতো বহুমাত্রিক (Multidimensional), আপাতদৃষ্টিতে অবাধ এবং শূন্যস্থান অস্তিত্বকে মহাকাশ বলা হয়ে থাকে।

মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের এই মহাকাশ (Space) অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এবং মহাবিশ্বের সাথে সাথে ক্রমশই এই মহাকাশ প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই মহাকাশ আসলে একপ্রকার অদৃশ্য অননুভূত— বিশেষ কম্পাঙ্কের কণা দিয়ে গঠিত এক বিশেষ অস্তিত্ব। কোষবিভাজন প্রক্রিয়ার মতো এই কণাগুলি প্রয়োজনে চক্রবৃদ্ধিহারে নিজেদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। বিজ্ঞান এখনো তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি।

সাধারণভাবে, এই মহাকাশ আমাদের কাছে অদৃশ্য অননুভব্য এক অস্তিত্ব। তাই একে মহাশূন্য বলা হয়ে থাকে। তাইবলে, এই মহাকাশ পরমশূন্য নয়। পরমশূন্য রয়েছে মহাবিশ্বের বাইরে যে বহু মহাবিশ্বের সম্মিলিতরূপ মহাসৃষ্টি অবস্থান করছে, তার বাইরে— আদিসত্তারও বাইরে।

আমাদের এই মহাকাশ মোটেও শূন্য নয়। সে তার নিজস্ব অস্তিত্ব ছাড়াও, নানারূপ মহাজাগতিক রশ্মি—শক্তি, কণা এবং বিকিরণে ভরে আছে। সেইসব শক্তি ও কণাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ সহ বিভিন্নরূপ কার্যকলাপে সাধারণত সে অংশগ্রহণ করে না। সে নিরপেক্ষ— নিষ্ক্রিয় নির্বিকার।

মহাকাশের মধ্যেই যে বিশ্বের সমস্ত কিছু অবস্থান করছে, শুধু তাই নয়, সমস্ত কিছুর মধ্যে বা ভিতরেও মহাকাশ রয়েছে বা বিরাজ করছে। মহাকাশ কোন কিছুকে ধারণ করে না— বর্জনও করে না।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই— মহাকাশ ছাড়াও আরো দুটি অব্যক্ত অননুভবনীয় স্বতন্ত্র ভার্চুয়াল অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে। তা হলো 'সময়' আর 'ভাগ্য' (সময় বা Time ও ভাগ্য বা Destiny সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কেউ কেউ মহাকাশ আর সময়-কে মিলিয়ে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু সময় ও মহাকাশ দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। সময় আর মহাকাশের মধ্যে বড় সম্পর্ক হলো— তারা একইসঙ্গে একই ঘটনা থেকে জন্ম নিয়েছে।

জলাশয়ের জলের ভিতরে মাছ যেমন, অনেকটা তেমনই এই মহাকাশের মধ্যে আমাদের অবস্থান। আমাদের সবদিকে— ভেতরে ও বাইরে রয়েছে মহাকাশ। এই অরূপ মহাকাশকে কেউ কেউ তাদের ধারণা বা কল্পনা মতো বিভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেগুলির কোনটিই এই রহস্যময় মহাকাশের প্রকৃত রূপ বা অবয়ব নয়। মহাকাশ এখনও আমাদের কাছে অধরাই রয়ে গেছে।

মহাকাশকে বুঝতে হলে, একেবারে মূল থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। পরম শূন্যের মধ্যে আদিসত্তার অবস্থান। আর তার মধ্যেই বহু মহাবিশ্বরূপ মহাসৃষ্টি সহ বহু মহাকাশ জন্ম নিয়েছে। মহাবিশ্বগুলির অন্তরবর্তী শূণ্যস্থানকে বলাহয়— অতিমহাকাশ। সৃষ্টিতত্ত্বের শুরুতেই পরমশূন্য সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। সেই পরমশূন্যের মধ্যে আদিসত্তার অবস্থান। আর সেই আদিসত্তার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে মহাসৃষ্টি। বহুসংখ্যক মহাবিশ্ব নিয়ে এই মহাসৃষ্টি। তারমধ্যে একটি হলো আমাদের এই মহাবিশ্ব।

আদি বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বহু মহাবিশ্ব-বীজ দিয়ে গঠিত ফল রূপ--- প্রাক মহাসৃষ্টি। আর, একসময় এই ফলটির মধ্যে থাকা বিশ্ববীজগুলির মধ্যে সংঘটিত হয় মহাবিস্ফোরণ। সেই বিশ্ব-বীজগুলি থেকে ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে— অসংখ্য মহীরুহের মতো বিকশিত হয়ে চলছে মহাবিশ্বগুলি।

বিশ্বাত্মার (ঈশ্বরের) জন্ম একটু আগেই পর্যবেক্ষণ করেছি—। এখন দেখছি, আমাদের মতো তারও আছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি। আছে পরিণতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর মনও ক্রমবিকাশমান। অস্ফূট জ্ঞান ও চেতনা থেকে পূর্ণ জ্ঞান ও চেতনার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে ক্রমবর্ধমান চেতনালাভের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে— তার জীবন-চলা।

অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে শিশুর মতো হাঁটী হাঁটি পা-পা ক'রে তার যাত্রা শূরু। যত চলছে— ততই তার অজ্ঞানতা— মোহ-মায়া-অন্ধত্ব থেকে মুক্তি ঘটছে। ক্রমশ নব নব চেতনার আলোয় আলোকীত হয়ে উঠছে তার জীবন। শৈশব ও কৈশোর চেতন-স্তরে, তার মোহ-মায়া সম্পন্ন, স্বল্প-জ্ঞান ও অন্ধ আবেগ সম্পন্ন অবচেতন অংশ-মনই হলো— মহামায়াত্মা বা মহামায়া মন ('মন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

অতি-শৈশব কেটেছে ঘোর অজ্ঞানতার মধ্য দিয়ে, দুর্বার—দুরন্ত গতিতে বেড়ে ওঠা—। শৈশবও কেটেছে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছোটাছুটি— খেলেধুলায় খেয়াল-খুশি মতো কাজ করে, অসচেতনভাবে— ভিতরের তাড়নায়। কৈশোরে কিছুটা সচেতনতা এলেও, মোহ-মায়া, অজ্ঞান-অন্ধত্ব, অন্ধ-আবেগের বশে— খামখেয়ালীপনার সাথে কাম-পীড়িত হয়ে— পেরিয়ে এসেছে অনেকটা পথ। একই সময়ে দুটি ভিন্ন চেতন-স্তরের ভিন্নধর্মী দুটি সক্রিয় মনের ('মন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) উপস্থিতির কারণে, মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে যেমন বৈপরীত্য দেখা যায়, বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বরের মধ্যেও ঠিক তেমনই ঘটে।

এইভাবে ক্রমশ এগিয়ে চলতে চলতে— চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে সে একটু একটু ক'রে বুঝতে থাকে নিজেকে। তার শক্তি, ক্ষমতা, কর্ম, লক্ষ্য— উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ। এতদিন অজ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে* খেলা চলেছে। এবার আস্তে আস্তে শুরু হয়— সজ্ঞানে সচেতনভাবে চলার পালা। বিভিন্ন সময় চেতনার ক্রমবর্ধিত মাত্রা অনুসারে, তখনকার পরিবির্তিত মনোভাব— কামনা-বাসনা অনুযায়ী নানা উদ্দেশ্যে খেলতে থাকে সে। নিজেকে নিয়ে খেলা— সৃষ্টিলীলা।

Note________________________

* আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিহীন মনে হলেও, সে কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই প্রাক সংস্কার বা প্রি-প্রোগ্রামিং মতো লক্ষ্যপানেই এগিয়ে চলেছে।

** বোঝানোর সুবিধার্থে— 'ঈশ্বর' বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রচলিত 'ঈশ্বর' ধারণার সাথে 'বিশ্বাত্মা'-র অনেক অমিল আছে।

____________________________

যথেষ্ট চেতনা লাভের সাথেসাথে জাগে আত্ম-জিজ্ঞাসা। —ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার উত্তর সন্ধানে। খেলাধুলা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসে—। শুরু হয়ে যায় তার মহৎ লক্ষ্য পানে— আত্মানুসন্ধানের* লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। ক্রমশ দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে— পূর্ণতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলার নতুন খেলা।

ক্রমশ আরো চেতনা বৃদ্ধি পেলে, একটু একটু ক'রে আত্মজ্ঞান লাভ করতে থাকে সে। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে অনেক কিছু—। পরিণত হয়ে ওঠে সে ক্রমশ।

আমি কে—, কেন্—, কোথা থেকে এসেছি—, কোথায় যাব—, কি উদ্দেশ্যে আমি সৃষ্ট হয়েছি—(?) —এ' প্রশ্ন আজ নতুন নয়। এ' প্রশ্ন আমার— তোমার সকলের অন্তরে জ্ঞাতে—অজ্ঞাতে অনুক্ষণ অনুরণিত হয়ে চলেছে— সৃষ্টির আদি কাল হতে। এই প্রশ্নই সৃষ্টিলীলার মূল কারণ। আমি যেমন নিজেকে প্রশ্ন করছি, 'আমি কে—কেন—কোথা থেকে—কোথায়', বিশ্বাত্মা (বা ঈশ্বরও) তেমনি নিজেকে এই একই প্রশ্ন করছে। আবার, আদিসত্তা— পরমাত্মাও এই একই প্রশ্নবাণে জর্জরিত ক'রে তুলছে নিজেকে!

আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে শিকড়ের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়াই হলো— এই মহাজীবন-চলা। একেই অনেকে 'সৃষ্টিলীলা' বলে থাকেন। আসলে, এই সৃষ্টি— পরমাত্মার কল্পনা-বিলাস বৈ আর কিছু নয়। এ'সমস্তই তার মানস-সৃজন। সেই হিসাবে, ঈশ্বরকে তার মানস-সন্তান-ও বলা যেতে পারে।

পরমাত্মা নিজের জীবনে যে সমস্ত ইচ্ছা পূরণে অক্ষম হয়েছে, কল্পনার মধ্য দিয়ে— সেই সমস্ত ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যেই তার এই লীলা-খেলা বা সৃষ্টিলীলা।

বিশ্বাত্মা (ঈশ্বর)— শুধু আত্মানুসন্ধানেই নয়, সেই সাথে তার স্রষ্টার খোঁজেই শুধু নয়, এছাড়াও আরও একটি খোঁজ চলতে থাকে তার (বিশ্বাত্মার বা ঈশ্বরের) মধ্যে জ্ঞাতে—অজ্ঞাতে, তা' হলো তার দোসরের খোঁজ। একাকীত্বের পীড়ায় পীড়িত হয়ে, কামনা-বাসনায় জর্জরিত হয়ে, অতঃপর বিশ্বাত্মা (ঈশ্বর) মনে মনে স্থির করে,

‘হ্যাঁ, আমার প্রধান লক্ষ্য হলো নিজেকে জানা। তবে তার সাথে এ-ও দেখতে হবে, এখানে আমি একা— না আমার কোনো দোসর আছে।’#

কিন্তু কি ক’রে তা’ সম্ভব! সে শুধুমাত্র নিজেকে সম্প্রসারিত— বিস্ফোরিত করতে সক্ষম। বহু বিশ্ব নিয়ে গঠিত— মহাসৃষ্টির সম্প্রসারণের ফলে নির্ধারিত পথে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া, পরমাত্মার শরীরের (বা ব্রহ্মাঙ্গলের) অন্য কোথাও যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অগত্যা— নতুন উদ্যোমে জলন্ত গ্যাসীও অগ্নিপিন্ডের মতো কোটি কোটি অংশে বিভক্ত হয়ে, দুরন্ত গতিতে দশদিকে (সবদিকে) প্রসারিত হয়ে— দিগবিজয়ে বেড়িয়ে পড়ে সে।** যেন রাজ্য জয়ের মহোৎসবে— মহাশূন্য জুড়ে আতসবাজীর খেলা। কখনো একটা খণ্ড ভেঙে অনেক ছোট ছোট টুকরো হচ্ছে, আবার কখনো অনেক টুকরো মিলিত হয়ে একটা বড় খণ্ড অথবা গ্রহ— নক্ষত্র তৈরী হচ্ছে।

দুর্দম—দুরন্ত গতিতে নিজেকে প্রসারিত ক’রে এগিয়ে চলা—। পিছনে তাকানোর মতো একটুও সময় নেই হাতে। একের পর এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়, চক্রবৃদ্ধিহারে কোষ-বিভাজনের মধ্য দিয়ে— অবিরাম চলা।

ক্রমবিকাশমান চেতনার বিভিন্ন স্তরে, কল্পনার রঙে-রূপে-রসে —নিজেরই উপাদানে নিজেকে গড়ছে—ভাঙছে বারবার। যাত্রাপথের একঘেয়েমী দূর করতে, নিজেকে রসে-বশে আনন্দময় রাখতে, বিভিন্ন উপায়ে বা পথে কাম-তাড়নার প্রশমন ঘটাতে— সদা সক্রিয় সৃজনশীল শিল্পী-মন।

Note________________________

#মহাসৃষ্টিতে আরও অনেক বিশ্ব (দোসর) থাকলেও, প্রথমদিকে বিশ্বাত্মা তাদের সম্পর্কে কিছুই জানতো না। ক্রমবিকাশের পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে এসে, পরবর্তীকালে সে তার দোসরের সন্ধান পায়।

____________________________

আদি ইচ্ছাকে সফল ক’রে তুলতে, আনন্দ পেতে— আবিরাম চিন্তা-যজ্ঞ চলছে। দ্রুত সিদ্ধিলাভ চাই, আবার একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পেতে চাই বৈচিত্র, চাই সুখস্বাদ। শিল্পীমন মেতে আছে নবনব সৃষ্টির তাড়নায়। প্রকারান্তরে— পূর্ণতা লাভের আকাঙ্খায়।

নিরন্তর গবেষণায় নিত্য-নব রূপে— বহুভাবে নিজেকে করছে আবিষ্কার। স্রষ্টা সে— সৃষ্টিও সে-ই। সৃষ্টির আনন্দে মশগুল শিল্পী-গবেষক বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর— অনেক পথ পেরিয়ে এসে, এখন সে অনেকটাই পরিণত।

মহাসৃষ্টির আনন্দে মত্তপ্রায়— অপরিসীম সুখাবিষ্ট মোহাচ্ছন্ন বিশ্বাত্মা (ঈশ্বর)— নতুন আর কী সৃষ্টি করবে, যা কিছু সবই ছিলো বীজ রূপে। জ্ঞান-চেতনা— সমস্ত কিছু। চলতে চলতে সময়ের সাথে সাথে, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে— বিকাশ ঘটছে ধাপে ধাপে। পূর্ব নির্ধারিতভাবে ঘটে চলেছে— যখন যা ঘটার।

এরই নাম ভাগ্য! না, প্রত্যক্ষভাবে এর পিছনে সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রক ব্যক্তি বা চেতন সত্তা নেই। কারো অঙ্গুলী হেলনে বা কারো খেয়াল-খুশিমতো এ’সব কিছু ঘটছে না। ঘটছে— মহাজাগতিক ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক দুটি ভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে। ঐচ্ছিক শক্তি কাজ করছে— আদি বীজ-কোষ এবং সমস্ত বিশ্ব-কোষের মধ্যে অন্তর্গ্রথিত নির্দেশ বা ‘প্রোগ্রাম’ বা ‘প্রি-প্রোগ্রাম’ অনুসারে। আর, অনৈচ্ছিক শক্তি কাজ করছে— ঘটনা প্রবাহের কার্য-কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম মেনে, প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

একটা উদাহরণ দিলেই ভাগ্য সম্পর্কে ধারণাটা পরিস্কার হয়ে যাবে। একটা পটকা অথবা খুব ছোট একটা বোমার চারিদিকে কতগুলি মারবেল বা পাথরের টুকরো রেখে, —কাগজ দিয়ে মুড়ে নাও, যেন পটকাটির পলতেটা বাইরে বেড়িয়ে থাকে। এবার একটা পরিস্কার ফাঁকা উঠানে নিয়ে গিয়ে— পটকাটি ফাটিয়ে দাও। বিস্ফোরণের পরমূহুর্তে মারবেল বা পাথরের টুকরোগুলি চতুর্দিকে বিভিন্ন গতিতে— বিভিন্ন ঢঙে— ছিটকে বেড়িয়ে পড়েছে—। লক্ষ্য কর, এক একটা টুকরো এক এক পরিবেশে, এক এক ভাবে পাক খেয়ে অথবা গড়িয়ে চলেছে।

কেউ হয়তো আর একটিকে আঘাত ক'রে ভেঙে দুই বা ততোধিক টুকরো হয়েছে। আবার কোনো টুকরো হয়তো আরেকটিকে আঘাত ক'রে তার আচরণে পরিবর্তন এনেছে। আর, কোনো একটা টুকরো হয়তো এক জায়গায় লাট্টুর মতো পাক খেয়ে চলেছে। এইরকম বহু ঘটনা ঘটতে দেখা যাবে একই সময়ে। কারো আচরণের সাথে কারো পুরোপুরি মিল নেই।

ওখানে এমন একজন দিব্যজ্ঞানী যদি থাকতেন, —পটকাটি, মারবেল বা পাথরের টুকরোগুলির আকার—আয়তন—ওজন, উপাদানাদি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পরিবেশ—আবহাওয়া প্রভৃতি সমস্তকিছু সম্পর্কে যাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি— প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তিনি বলে দিতে পারতেন, কখন কোন টুকরোটির কি দশা হবে, কার কি গতি বা কি পরিণতি ঘটবে। কারণ, ওদের সবার ভাগ্যই নির্ধারিত হয়ে গেছে পটকাটি ফাটার মূহুর্তেই।

আরো সহজ ক'রে বোঝাতে, ঘুরণ-চরকী লটারী খেলার সাদামাটা চক্রের মতো যন্ত্রটার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চক্রটি ঘুরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই ঠিক হয়ে যায়— তার কাঁটাটি কোন ঘরে বা কত নম্বরে— কখন গিয়ে থামবে।

ঠিক তেমনিভাবে, এখানে যা কিছু ঘটছে, ঘটেছে এবং ঘটবে— সমস্ত কিছুর মূল কারণ নিহিত রয়েছে সেই মহাবিস্ফোরণের মূহুর্তে। একেই বলা হয়— ভাগ্য। ঈশ্বর নিজেও এই ভাগ্যের বাঁধনে বাঁধা। আমরাতো তার অংশমাত্র ('ভাগ্য আসলে কী' স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

বিশ্বাত্মার (ঈশ্বরের) ইচ্ছা—অনিচ্ছা এবং আমাদের ইচ্ছা—অনিচ্ছাগুলি সবই, যখন যেটা জাগ্রত হওয়ার— হয়। আমাদের ইচ্ছাও আমাদের নিজস্ব নয়। সে-ও পূর্বনির্ধারিত সময় মতোই জাগ্রত হয়, আবার সময় মতোই তিরোহিত হয়। যখন যেমনটি হবার তেমনটিই হয়। সেই 'প্রি-প্রোগ্রামড' ঐচ্ছিক শক্তি আর মহাবিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট 'ভাগ্য' রূপ— অনৈচ্ছিক শক্তি, উভয়ে মিলেমিশে কাজ ক'রে চলেছে সর্বক্ষণ।

প্রধাণত অনৈচ্ছিক শক্তি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে— ভাগ্য! আর, ঐচ্ছিক শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছে— বিশ্ব-মন বা ঈশ্বর-মন এবং আমাদের মন। এই মন ও তার ইচ্ছা— চিন্তা-ভাবনা, এও সেই অনৈচ্ছিক শক্তির অধিন। ভাগ্যের তালে তাল মিলিয়ে এই মনের বিকাশ ঘটে চলেছে— একটু একটু ক'রে। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ইচ্ছুক মন— ঈশ্বর মন-এর জন্ম দিয়ে, আদি ঐচ্ছিক শক্তি— আপাতত নিস্ক্রিয় শক্তিরূপে অন্তরাল থেকে কাজ করে চলেছে সঙ্গোপনে।

মহাজগত বিভিন্ন সময়ে— কখন কী রূপ ধারণ করবে, এবং সেই সঙ্গে জীব এবং অন্যান্য চেতন-সত্তার অস্তিত্ব আর তাদের বিভিন্ন দশার যাবতীয় পরিকল্পনা বীজাকারে— 'প্রোগ্রাম' আকারে আদিসত্তার মধ্যেই বিদ্যমান

ছিল। সেই আদিসত্তা থেকে জন্ম নেওয়া সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু—কণাসহ আমাদের তথা জীবের প্রতিটি (দেহ ও মস্তিষ্ক) কোষের মধ্যে সেই 'প্রোগ্রাম' বিদ্যমান রয়েছে।

সেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া আর ভাগ্যরূপ অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ঐক্য-বাদনে মহাজাগতিক সুর রচিত হয়ে চলেছে।

Note______________________

* এ'এক অদ্ভূত অন্বেষণ। এই খোঁজার প্রথমদিকে একটা বড় অংশ পর্যন্ত—, কে খোঁজে, কিম্বা কাকে খোঁজে, কেন খোঁজে, কোথায় খোঁজে— এ' সবই থাকে অজানা। তবু নিজের অজ্ঞাতেই খোঁজ চলতে থাকে— অনবরত, চলতেই থাকে।

** এতদিন ধরে এই চলা— এই ছড়িয়ে পড়া ছিলো অনৈচ্ছিকভাবে— অজ্ঞানে। এখন সেই চলাই— সেই ছড়িয়ে পড়াই সতেজ হলো—, নতুন উদ্যোমে— ইচ্ছাকৃতভাবে— সচেতনভাবে।

______________________________

পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের বুকে মানুষ এবং বিভিন্নরূপ চেতন-সত্তার চেতনার এই যে ক্রমবিকাশ, এর পিছনেও কাজ করছে সেই আদি উদ্দেশ্য। বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বরের অংশানুক্রমে কোটি কোটি অনুবৎ আমরাও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে চলেছি ছুটে সেই আত্মজিজ্ঞাসা— সেই আদি প্রশ্ন নিয়ে।

সৃষ্টির শুরুতে— বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বরের স্বল্প-চেতন-স্তরে, আজকের এই উন্নত জীব— মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চ চেতন-সত্তার কল্পনাও তখন অসাধ্য ছিলো তার কাছে। চলতে চলতে নিত্য নতুন চাওয়া-পাওয়া, ভাঙা-গড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে— ক্রমশ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই মানুষ এবং অন্যান্য চেতন-সত্তা।

আমাদের জীবনযাত্রার সাথে প্রজাপতির জীবন-চক্রের বেশ কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথমে ডিম, —আমাদের অতীতের সুপ্ত চেতনাবস্থা। তারপর শুককীট, —ক্রোধ, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা-স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা এবং আত্মরক্ষার অজস্র শুঁয়ো নিয়ে শুঁয়োপোকার মতো আমরা ইহলোকে এবং পরলোকে ভোগ সম্পন্ন ক'রে চলেছি। এই ভোগ শেষে— জ্ঞানযোগ সম্পূর্ণ হলে, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ ক'রে দিব্যলোকে— পরলোকোত্তর পরবর্তী জীবনে গভীর ধ্যানমগ্ন বা সমাধিস্থ হওয়া পূর্ণ বিকাশ লাভের উদ্দেশে। —সেই হলো মূককীট অবস্থা। অবশেষে পূর্ণ আত্মবিকাশ— প্রজাপতির মতো।

এখানে আমাদের বিকাশ ঘটছে তিনটি স্তরে। প্রথমটি হলো— বংশানুক্রমে। দ্বিতীয় স্তরের বিকাশ ঘটছে দুই ভাগে, প্রথম পর্ব— ইহলোকে, এই জীবনে। আর দ্বিতীয় পর্বের বিকাশ ঘটছে— পরলোকে। তৃতীয় স্তরের বিকাশ ঘটছে, মহামানব স্তরে— দিব্যলোকে। পরলোকের মধ্যেও রয়েছে ক্রমোচ্চ কয়েকটি ছোট ছোট ক্রমোচ্চ স্তর। পরলোকের সর্বোচ্চ স্তর পার হয়ে পৌঁছাতে হয় মহামানব স্তরে। তার পরেও রয়েছে আরও কয়েকটি ক্রমোচ্চ চেতন স্তর। দেব-চেতন স্তর, মহাদেব-চেতন স্তর, এবং সব শেষে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর-চেতন স্তরে উন্নীত হয়ে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধে বিলীন হয়ে যাওয়া (এ'নিয়ে অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি)।

বংশানুক্রমে যে বিকাশ ঘটছে, তাকেই ডিম্ব অধ্যায় বলা যায়। কারণ, অগণিত পূর্বজদের শরীর-কোষের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় থাকে জীব সত্তাটি। পূর্বজদের অর্জিত জ্ঞান-চেতনা— যা সংক্রামিত হয় তাদের শরীর-মস্তিষ্ক

কোষে, মন সফটওয়ারে এবং তাদের শুক্রকীটে বা ডিম্বকোষে। পূর্বজদের কোষের মধ্যে সুপ্ত থাকা অবস্থাতেই বংশ-পরাম্পরায় ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে ভবিষ্যতের হবু জীবসত্তা।

আমরা সবাই চলেছি সেই এক লক্ষ্য পানে—, কেউ জ্ঞানে, কেউ অজ্ঞানে। তাই কেউ জানে, কেউ জানেনা— আসলে একই পথের পথিক আমরা। জড়বৎ অস্ফূট চেতনা হ'তে পূর্ণ চেতনার পথে, কর্ম আর ভোগের মধ্য দিয়ে অবিরাম চলা—। এখানে কেউ থেমে নেই— থেমে থাকে যায়ও না। পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং আরও অনেক কারণে গতির বিভিন্নতা। কেউ আছে এগিয়ে, আর কেউ পিছিয়ে।

আজ এখানে এসে পৌঁছানোর পিছনে রয়েছে লক্ষ-লক্ষ বছরের অজস্র দুঃখ-কষ্টে ভরা দুঃসহ যন্ত্রনাময় ইতিহাস। যতই এগিয়েছি, শিক্ষা-অভিজ্ঞতা-যন্ত্রনা রূপান্তরিত হয়ে পেয়েছি চেতনা। আপাতভাবে আমরা এ' সমস্ত ভুলে গেলেও, সৃষ্টির আদিকাল থেকে— সমস্ত স্মৃতিই সঞ্চিত রয়েছে আমাদের অন্তরের গভীর স্মৃতি-ভান্ডারে। অন্তরের গভীরে ডুবতে পারলেই সব জানা যাবে।

অতীতকে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে, কীভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে তিলে তিলে দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, শোক-সমস্যা-হতাশা, ...নিদারুণ যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে প্রায় জড়বৎ মনে একটু একটু ক'রে চেতনার বিকাশ ঘটে চলেছে। পূর্ণ লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি এর থেকে রেহাই বা মুক্তি নেই। যত বেশি উচ্চাকাঙ্খা, যত বেশি বহির্মুখিতা, যত বেশি উত্তেজনা— অস্থিরিতা, বুঝবে, মুক্তি ততই সন্নিকট। এই মুক্তি— অজ্ঞানতা—অন্ধত্ব—বন্ধন, —পরাধীনতা থেকে মুক্তি। মায়া-মোহপাশ থেকে মুক্তি। অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন মোহ, এবং তার থেকে উৎপন্ন বহু জাগতিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি।

আকরিক লৌহ-পিন্ডকে যেমন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-পিটিয়ে, নানাবিধ শোধনের পর, ঘষে-মেজে জাগানো হয় তার ঔজ্বল্য— তার শাশ্বত রূপ, চেতনার বিকাশ-প্রক্রিয়াও তেমনি এক সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থা। ভয় পেয়ে, শান্তি বা মুক্তির খোঁজে পালিয়ে গেলেই রেহাই পাবে, তা' ভেবনা। ভোগ তোমায় সম্পূর্ণ করতেই হবে।

তবে দ্রুত হবে কী বিলম্বিত হবে, এবং কিভাবে হবে— সবই পূর্ব নির্ধারিত। আমরা অসহায়। ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক সম। আমাদের নিজস্ব কিছু করার নেই। যা ভাবছি—, যা করছি—, তা' না ক'রে উপায় নেই, তাই বাধ্য হয়ে করছি। যা কিছু করছি, তা' করতে বাধ্য হচ্ছি বলেই করছি। অজ্ঞানতাবশতঃ মনে হচ্ছে— 'আমি করছি, আমি বলছি, আমার ইচ্ছায় হচ্ছে বা ঘটছে।'

আমরা! —কেন এই স্বাতন্ত্র বোধ— এই বহুত্ব?! —শুধু বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর সৃষ্ট জীব-জগতেই নয়, এই বহুত্ব মহাবিশ্বের সর্বত্র। একী তবে বিশ্বাত্মার একাকীত্বের দুঃসহ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াস?!

আসলে, এ-ও তার অদৃষ্ট বা ভাগ্য। মহাবিস্ফোরণের পরক্ষণ থেকে দশদিকে ছিটকে—ছড়িয়ে পড়া ছোট বড় জমাট বাঁধা প্রতিটি অংশ, প্রতিটি কণা, প্রতিটি অনু-পরমানু সেই চরম আঘাতের ফলে আত্মবিস্মৃত হয়েছে। একত্ব ভুলে স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে ছুটে চলেছে, কর্ম করে চলেছে যে যার অদৃষ্ট মতো। এর পিছনে— সৃষ্টিপূর্বে, আত্মসম্মোহন দ্বারা আত্মবিস্মৃতি সহ অজ্ঞানাবস্থা লাভ-ও এর অন্যতম কারণ।

এ'যেন আমাদের শরীরের মতো। বিভিন্ন ধরণের কোটি কোটি কোষ দিয়ে গঠিত এই শরীর। যেন, প্রতিটি কোষ নিজেকে বোধ করছে স্বতন্ত্র সত্তা রূপে। কর্ম ক'রে যাচ্ছে যে যার মতো। প্রত্যেকেই যেন এক একটা 'আমি'। আর

এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘আমি’ নিয়ে আমি— ‘মহা-আমি’। আজকের এই ‘আমি’ মহাজগতের এক আবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ‘আমি’-কে বাদ দিয়ে— এই মহাজগত-অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নয়, সম্ভবও নয়।

'আমি'! এই জগতটাই আমি ময়। এই চেতন জগতে 'আমি' থেকে মুক্তি নেই। পরম-আমি থেকে ঈশ্বর-আমি, তারপর, অহম-আমি, অহংকারে মত্ত আমি। অস্ফূট আমি থেকে বিকশিত আমি। অবচেতন-মন সেও নিজেকে বলছে, 'আমি'। মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান আমি। আবার —সচেতন-মন সেও নিজেকে বলছে, 'আমি'। সচেতন আমি। আমি হলো চেতন জগতের প্রথম আত্মোপলব্ধীর প্রকাশ! —আমি নেই তো কিছুই নেই!

এই ‘আমি’ যা ভাবছে— যা করছে, তার পিছনে রয়েছে অসংখ্য ঘটনা। কোটি কোটি ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয়— আরো কোটি কোটি ঘটনা। আবার, সেই সব ঘটনার ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয় আরো অজস্র ঘটনা।

এইরূপে, ঘটনা-পরম্পরাগতভাবে— বর্তমানে জন্ম নেওয়া অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি হলো— এই ‘আমি’-র চিন্তা—ইচ্ছা। আর একটি হলো— এই ‘আমি’-র কর্ম। এদের থেকে আবার জন্ম নেবে অজস্র ঘটনা। এইভাবেই বয়ে চলেছে পরম্পরাগত ঘটনা-প্রবাহ।

‘আমি’-র চিন্তা এবং ‘আমি’-র কর্ম হলো— অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য ঘটনার সাথে নানাভাবে সম্পর্কযুক্ত অসংখ্য ঘটনার মধ্যে অজস্র ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। ‘আমি’-র অস্তিত্ব, ‘আমি’-র কর্ম— সব কিছুই এই জাগতিক ব্যবস্থার ফসল।

তবে, যা-ই ঘটুক, আদি লক্ষ্য— আত্মান্বেষণ ও পূর্ণতালাভের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি কেউই। তা’ ঠিক গাঁথা আছে প্রত্যেকের অন্তরে। আমাদের সার্বিক বিকাশে— হবে তার পূর্ণতা লাভ। পুণরায় আপাতঃ ‘বহু’ থেকে ‘এক’-এ বিলীন হবার স্বপ্নে, প্রত্যেকে চলেছি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে।

বিভিন্ন শক্তি—পদার্থ—বস্তু যে উৎস থেকে উৎপন্ন বা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের মনও সৃষ্টি হয়েছে সেই উৎস থেকেই। পরম-চেতনা এবং মহাচেতনা থেকেই আমরা আমাদের চেতনা লাভ করেছি। মহাপ্রাণ থেকেই পেয়েছি আমরা প্রাণশক্তি। মহাবিশ্ব-শরীর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই জীব-শরীর। পরিণতিতে— সমস্ত বস্তু—মন-চেতনা সেই উৎসে গিয়ে মিশে যাবে বা বিলীন হয়ে যাবে একসময়।

আদি শক্তি ও শক্তি-ক্ষেত্র থেকেই বিভিন্নরূপ শক্তি এবং বিভিন্ন ধরণের শক্তিক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি শক্তিক্ষেত্রের মধ্যেই আদি শক্তিক্ষেত্রের ছাপ বা সংকেত অন্তর্নিহিত রয়েছে।

এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানসক্রিয়া— চিন্তা। চিন্তা থেকেই ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাক্রমেই সমস্ত সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই চিন্তারূপ কর্মটির কর্তা হলো— মন। পরমাত্মার চিন্তা ও ইচ্ছা থেকে বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা/ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়। আর, বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর-মনের চিন্তা ও ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি হয়েছে— এই উদ্ভিদ ও জীব জগত।

তারপর, পৃথিবীর চিন্তাশীল জীব মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে আরও কতকিছু। চিন্তা—কল্পনাকে রূপায়ীত ক’রে তোলার ইচ্ছাতেই শুরু হয় কর্ম। আর, কর্ম থেকেই হয় সৃষ্টি। সৃষ্টিকে কেন্দ্র ক’রে সৃজনশীল মনে আবার একের পর এক চিন্তা—কল্পনা চলতে থাকে। তার থেকে জন্ম নেয় আরও নব নব সৃষ্টি।

তবে, অনেকসময়ে, যা কল্পনাতেও ছিলো না, —তা'ও সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে— ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার যৌথ কারবারে। অনেকসময়, চিন্তা ও ইচ্ছানুরূপ কাজ না হওয়া, সৃষ্টি না হওয়া— সফল না হওয়ার জন্য দায়ী হলো এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া— ভাগ্য! অনেকসময়েই, চিন্তাকে প্রভাবিত ক'রে থাকে— পরিচালিত ক'রে থাকে এই ভাগ্য।

অজ্ঞানতা জনিত মোহ-মায়াবশতঃ যতই বহুত্ব বোধ করুক সবাই, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর কিন্তু বহু হয়নি কখনোই। 'এক'-ই রয়েছে সে। একটু ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলেই বুঝতে পারবে, —ঈশ্বর এখন পর্যন্ত পমাত্মার শরীরের বা ব্রহ্মাঙ্গলের যতটা অংশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে এতটুকুও শূন্য নেই। সমস্ত স্থান জুড়ে হয় বস্তু— না হয় কোনো না কোনো শক্তি—কণা, আদিকণা অথবা আমাদের অজানা অন্য বস্তু— অন্য শক্তিতে ভরপুর হয়ে রয়েছে। আর তারই মধ্যে সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে রয়েছে— দিব্য পদার্থ— পরম পদার্থ (বা ব্রহ্মপদার্থ) ও দিব্য চেতনা প্রভৃতি। স্বাতন্ত্র ও বহুত্ববোধ শুধু মনে। সৃষ্টির আদি থেকে মহাজগৎ ক্রমশ প্রসারিত হয়েই চলেছে, —'বহু' হয়নি কখনও।

কতকটা যেন, এক গামলা জলের মধ্যে— অনেকগুলি ছোট—বড় বরফের টুকরো। প্রতিটি টুকরো— প্রতিটি জলকণা মোহ-অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেদেরকে এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা ভাবছে। এইভাবেই মায়াত্মক বহুত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের মহাকাশকে মহাশূন্য বলা হলেও, তা' কিন্তু মোটেই শূন্য বা খালি নয়। মহাবিশ্ব অখন্ড। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে সাথেই এই মহাকাশও সৃষ্টি হয়েছে, এবং সে-ও মহাবিশ্বের মতোই ক্রমশ প্রসারমান।

এই প্রসঙ্গে বলি, মহাজাগতিক সময়েরও সৃষ্টি হয়েছে— মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে সাথেই। মহাজাগতিক সময়— আর পরমাত্মার পারমাত্মিক সময় এক নয়। যেমন এক নয়— আমাদের পার্থিব সময়। মহাজগতের জন্মের পূর্বে, মহাজাগতিক সময় সৃষ্টির পূর্বে— ছিলো শুধু পারমাত্মিক বা পরম সময়। 'সময়' সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি অপর একটি অধ্যায়ে।

আমরা যেন এক মহা মায়ানদীর স্রোতের টানে ছুটে চলা বিন্দু বিন্দু জলকণারাশি। এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা নেই কারো। ঘটনাচক্রে— বিকাশের মাত্রা অনুসারে, কেউ আছে নীচে, কেউ মাঝে আর কেউ উপরের স্রোতে। যে যেখানে— সেই মতো তার দর্শন। যে আছে একেবারে সবার ওপর তলে, একমাত্র সে-ই দেখতে পারছে— আকাশ, দেখতে পারছে— বাইরের দৃশ্যপট। বুঝতে পারছে তার প্রকৃত অবস্থাটা। বিচার করতে পারছে আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এই স্রোতকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই তারও।

আনন্দ পেতে চেয়ে কর্ম-যজ্ঞে নেমে, না চেয়েও জ্ঞান লাভ হয়। তবু যদি আনন্দ না পেতে চায় কেউ, দুঃখ পেতে হবে জেনে, —কেউ যদি এগিয়ে না যায়, তাই— জ্বালাময়ী দুটি ক্ষুধা সর্বদা জ্বলছে এই দেহে। সেই সাথে আর আছে— রোগ-যন্ত্রনা, আত্মরক্ষার তাগিদ, —এদের মেটাতে গিয়ে ছুটতেই হবে। জ্বালা নেভাতে গিয়ে আরো জ্বালা বাড়ে, না চেয়েও জ্ঞান ও চেতনা বেড়ে ওঠে নিজেরই অজ্ঞাতে।

ওদের তাড়নায় এইভাবে চলতে চলতে— একটা সময় আসে, যখন জ্ঞান লাভেই আনন্দ অনুভূত হয়। ক্রমশ আত্মজ্ঞান— আত্মচেতনা, অন্তর্নিহিত সুপ্ত আত্মশক্তি বিকশিত হতে থাকে। অতঃপর একসময় যখন দিব্যসত্তাটি

বিকশিত হয়ে 'ঈশ্বর-আমি'-তে পর্যবসিত হয়, তখন (আপাত) পূর্ণতা লাভের** সাথে সাথে আসে অচলাবস্থা। এক আকার ধারণ করতেই, বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হয় না আর। একাত্মবোধ— অবিলম্বে একীভূত—একাকার হওয়ার ডাক আসে।

অবশেষে, বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর-মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটার সাথে সাথেই তড়িৎ গতিতে— তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত অংশের— এমনকি অজ্ঞান-অন্ধকার অংশেরও পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তার সমস্ত অংশের অজ্ঞানতা-অন্ধত্ব-অন্ধকার দূর হয়ে— আলোকময় হয়ে ওঠে এক নিমেষে।

এদিকেও তখন দেখাযায়, নিকটবর্তী দুটি বিপরিত বিশ্ব— ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে একে অপরের অতি নিকটে চলে এসেছে মিলনের আকাঙ্খায়। শুধু আমদের বিশ্ব-ই নয়, অপরাপর বিশ্বগুলির ক্ষেত্রেও ঘটে একই ঘটনা।

হঠাৎ এক সুতীব্র আলোর ঝলকানির সাথে সাথে ভোজবাজীর মতো সব নিমেষে উধাও! বিপরীত বিশ্বগুলির মিলনের মধ্য দিয়ে— ঘটে সৃষ্টিলীলার অবসান। এ ঘটনা শুধু আমাদের বিশ্ব এবং তার বিপরীত বিশ্বের ক্ষেত্রেই নয়, একই সময়ে, এই একই ঘটনা ঘটে অন্যান্য সমস্ত বিশ্ব এবং তাদের বিপরিত বিশ্বের ক্ষেত্রেও।

অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এক কল্প-নাটক দেখা শেষ ক'রে, পরিশ্রান্ত পরমাত্মা (বা পরমব্রহ্ম) নিজেকে সঁপে দেয় গভীর নিদ্রার কোলে।

'মহাবিশ্ব সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন' অধ্যায় এখানেই শেষ হলো। যাকে জানা দুষ্কর, জানলেও, ব্যক্ত করা কঠিন—, সেই অব্যক্ত পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অতি কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যক্ত করা সম্ভব হলো— শুধুমাত্র তার ইচ্ছাতেই। এ'টুকু নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে এখন।

সৃষ্টিতত্ত্বের গোপন রহস্য উন্মোচন

বিশ্বাত্মা (বা ঈশ্বর বা স্রষ্টা) এবং তদকর্তৃক সৃষ্ট এই জীবজগত সহ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো এক ভার্চুয়াল বা মায়া অস্তিত্ব বা মায়া অস্তিত্ব। এ' হলো কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতোই অতি উন্নত মানের প্রোগ্রামীং কোড দ্বারা সৃষ্ট ও চালিত এক বিশাল ভিডিও গেম বা হলোগ্রাম নাটকের মতো পূর্ব পরিকল্পিত নাটক।

আমাদের বুদ্ধিমত্তা, যাকে আমরা প্রাকৃতিক বলে জানি, সেও আসলে আমাদের স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।

আমরা যেমন নিজেরা ভার্চুয়াল বা মায়া অস্তিত্ব হয়েও, কম্পিউটার গেমের মধ্যে অনেক ভার্চুয়াল চরিত্র সহ ভার্চুয়াল বা মায়া জগত সৃষ্টি করছি, তেমনি বিশ্বাত্মা (বা ঈশ্বর) নিজে এক মায়া অস্তিত্ব হয়েও, এই জীবজগত সহ আমাদের অনুভব যোগ্য তথাকথিত বাস্তব জগত সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বাত্মা (বা ঈশ্বর) সৃষ্ট উন্নত জীব মানুষ কর্তৃক এবং অন্যান্য গ্রহের এবং অন্যান্য বিশ্বের অতি উন্নত জীব অথবা তদ্রুপ সক্রিয় চেতন-সত্তাদের দ্বারাও অনেক জায়গায় ভার্চুয়াল জগত এবং জীব বা জীব সদৃশ এনিমেটেড ভার্চুয়াল ক্যারেকটার বা সত্তা সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে।
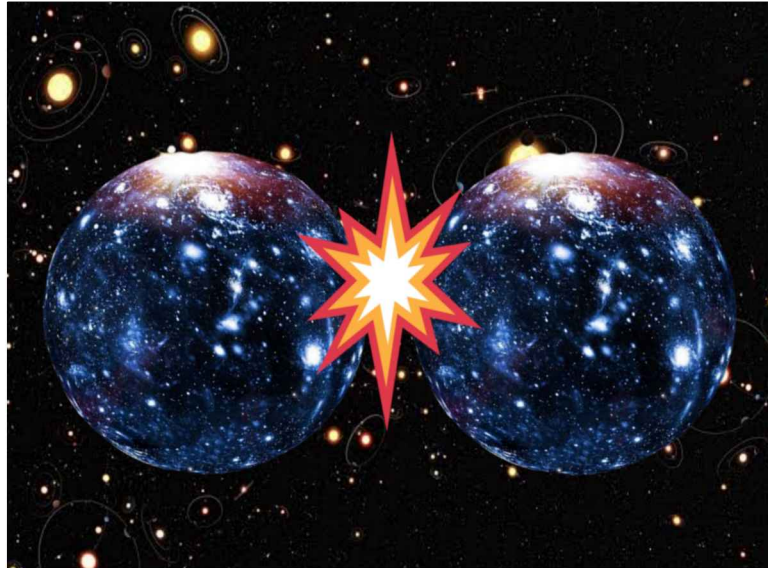
মহাজীবন চলার পথে বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর ও আমরা:

ঠিক আমাদের মতোই, সৃজন কালে (শিশু-চেতন ও কিশোর-চেতন স্তরে, এবং যৌবন-চেতন স্তরের প্রথম দিকে)— বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর মনের মধ্যেও ছিলো দুটি মন, দুটি অংশ-মন। একটি হলো— সচেতন মন বা কিশোর মন, আর অপরটি হলো— অবচেতন মন বা শিশুচেতন মন। তার এই অন্ধ-আবেগ সর্বস্ব— যুক্তি-বিচার-কান্ডজ্ঞান বিহিন, মোহ-মায়াময় মনটিই হলো— মহামায়াত্মা ! আর তৎকালে আংশিক বিকশিত— আংশিক জাগ্রত সচেতন মনটিই হলো— মহামন বা মহামানস। আমাদের মধ্যে— যাদের মনরাজ্যে প্রধানতঃ

অবচেতন মনের রাজত্ব বা প্রভুত্ব চলছে, সচেতন মন তেমন জাগ্রত না হওয়ায়— সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেনা, তারা ঈশ্বরের অবচেতন বা শিশুমন— মহামায়াত্মার ভক্ত ও উপাসক।

আর যাদের সচেতন মন অনেকাংশে বিকশিত— অনেকটাই সক্রিয় এবং অবচেতন মনের উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম, —তারা ঈশ্বরের সচেতন বা কিশোর-চেতন মন এবং কেউ কেউ তার যৌবন-চেতন মনের ভক্ত এবং যুক্তি-বিচার ও জ্ঞান-পথের পথিক। মনের মিল হলে তবেই না তাকে ভালোলাগে !

ঠিক আমাদের মতোই— ঈশ্বরও চেতনার ক্রমবিকাশের পথ ধরে সর্বদা এগিয়ে চলেছে। ঈশ্বর এখন আর পূর্বের সেই চেতনস্তরে নেই, এখন সে অনেক উচ্চ (প্রৌঢ়) চেতন স্তরে অবস্থান করছে। আমরা তার দ্বারা— তার অংশ হতে সৃষ্ট জীবগণ বর্তমানে মানব-চেতন (বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোর চেতন) স্তরের মধ্যবর্তী বিভিন্ন সূক্ষ্ম চেতনস্তরে অবস্থান করছি, এবং ক্রমশ পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে (জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে) এগিয়ে চলেছি, ঠিক ঈশ্বরের মতোই!

আমরা বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বরের অংশ হলেও, —স্বতন্ত্র চেতন সত্তা হওয়ার কারণে এবং আমাদেরকে প্রথম সৃজন কালে, বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর আমাদের তৎকালীন চেতনস্তর থেকে অনেকটাই উচ্চ চেতনস্তরে অবস্থান করার ফলে, পৃথিবী থেকে বহুপূর্বে বিদায় নেওয়া আমাদের অগ্রজ বহু মানুষ— বহু উচ্চ চেতনস্তরে উন্নীত হয়ে— ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী চেতন স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

ঈশ্বরের (বিশ্বাত্মার) আয়ুষ্কাল অনেক বেশি হওয়ায়, ঈশ্বর-চেতনার বিকাশ ঘটে খুব ধীর গতিতে (দ্রষ্টব্যঃ ‘সময় ও বয়স’ প্রবন্ধ)। এক-একটি চেতন-স্তর অতিক্রম করতে— তার লক্ষ লক্ষ বছর (পৃথিবীর সময়ে) লেগে যায়। সে তুলনায় মানুষ বা মানুষের মতো চেতন-সত্তার ক্ষেত্রে এক-একটি চেতন-স্তর অতিক্রম করতে (পৃথিবীর সময়ে) সময় লাগে হাজার হাজার বছর। এছাড়া, তুমি মধ্যম চেতন-স্তরের পর থেকে, যত উচ্চ চেতন-স্তরে উপনীত হবে, তোমার এগিয়ে চলার গতি ততই মন্থর হয়ে আসবে। এই কারণেই, ঈশ্বর (বিশ্বাত্মা) মানুষের চাইতে চেতনায় অনেক বেশি এগিয়ে থাকলেও, মানুষের পক্ষে ঈশ্বর (বিশ্বাত্মা) চেতন-স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়। ঈশ্বর ও মানুষ বা মনুষ্যতুল্য জীব বা সত্তা— উভয়ের ক্ষেত্রেই, মধ্যম চেতন-স্তরগুলিতে— চেতনা যত বৃদ্ধি পাবে, চেতনা বিকাশের গতিও বৃদ্ধি পাবে ততই। নিম্ন ও উচ্চ চেতন-স্তরে বিকাশের গতি মন্থর হয়ে থাকে।

বর্তমানে আমরা কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা সরাসরি সৃজিত নই। বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর কৃত স্বয়ংক্রিয় সৃজন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে—পরম্পরাগত ভাবে আমাদের জন্ম হচ্ছে এখন। একসময় আমরাও ক্রমবিকাশের পথ ধরে বিশ্বাত্মার (ঈশ্বর) চেতনস্তরে উপনীত হব। এটাই মহা জীবনচলা।

**বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর ও আমরা : কয়েকটি সূত্র:**

- বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন চোখে দেখে না।
- বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর কাউকে আলাদা ভাবে কৃপা করে না।
- বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে পূজা ও তোষামোদ কামনা করে না।
- বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর আমাদের কাউকেই শত্রু বা মিত্র কোনো দৃষ্টিতেই দেখে না। ● বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর যা দেওয়ার, যা করার প্রথম সৃজন কালেই করেছে, নতুন করে আর কিছু করার নেই তার।
- আমাদের উপর তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট কোনোটাই হয় না সে।
- বিশ্বাত্মা/ঈশ্বর আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা নয়।

★ এখন আমাদের ভালো-মন্দ যাকিছু হচ্ছে বা ঘটছে, সে সবই হচ্ছে ভাগ্য ক্রমে বা জাগতিক ব্যবস্থাক্রমে।
★ ভাগ্য হলো জাগতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। এখানে, আমরা ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মিলিত ফল ভোগ করে থাকি।

**বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর-মন :**

বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর-মন নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। যারা নিজের মনটাকেই এখনো ঠিকমতো বুঝতে বা জানতে পারেনি, তাদের পক্ষে ঈশ্বর-মনকে বোঝা বা জানা, তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সত্যিই দুষ্কর।

মনকে বুঝতে হয় মন দিয়েই। আর তার জন্য প্রয়োজন হয়--- সজাগ-সচেতন-সত্যপ্রিয়, যথেষ্ট বিকশিত মুক্ত-মন।

বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর-মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার পক্ষে এই নিদর্শনটি অনেকটা সহায়ক হবে আশাকরি~

মরণশীল জীবের বংশবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে--- তাদের অস্তিত্ব, বংশধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর যে কৌশল রচনা করেছে, তাতেই তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর, বুদ্ধিমত্তাই হলো 'মন'-এর উপস্থিতির নিদর্শন। অর্থাৎ যেখানে বুদ্ধি আছে, সেখানে অবশ্যই মন আছে। যেমন, কোথাও ধোঁয়া থাকলে--- আমরা সেখানে আগুনের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি সহজেই অনুমান করতে পারি।

এবার বলি, সেই কৌশলের কথা--- যৌন সুখের ব্যবস্থা করা এবং যৌনসুখের প্রতি জীবকে প্রলুব্ধ ক'রে তুলে, ---তার মধ্যে যৌন মিলনের তাড়নারূপ প্রোগ্রাম-এর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, জীবকে যৌনমিলনে অনুপ্রাণিত বা বাধ্য ক'রে তোলার কৌশলটি অবশ্যই ঈশ্বরের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

স্রষ্টার বুদ্ধিমত্তার আরেকটি নিদর্শন হলো— উন্নতমানের জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষ জীব সৃষ্টি করা এবং তাদের যথোপযুক্ত শরীর-যন্ত্র তৈরি করা। এসবের পিছনে স্পষ্টতই বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিমান সচেতন মনের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়ে থাকে।

এছাড়া, আমরা যাতে নিজেদের শরীর বিনষ্ট ক'রে না ফেলি, আমরা রোগ-ব্যাধি, আঘাত-- আক্রমণ থেকে যাতে বাঁচার চেষ্টা করি, সেজন্য স্রষ্টা* আমাদের মধ্যে যন্ত্রণা বোধ দিয়েছে।

যদিও, তার সব কাজই সম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত নয়, আমাদের অনেকের কাছেই যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়, তবুও সৃজনকালে (চেতনার ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে) তার জ্ঞান ও চেতনা সাপেক্ষে সে অনেক কিছুই করেছে। স্রষ্টা আমাদের দিয়েছে অনেক আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও।

খুঁজলে, এইরকম আরো অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে। আর একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, দেখা যাবে--- আমাদেরকে স্বল্পচেতন মানব থেকে ক্রমশ উচ্চ--- আরও উচ্চ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে , সে নানা প্রকার কৌশল তৈরী করেছে।

এছাড়াও, আরো সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, সুদীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বর-মনও ক্রমশ একটু একটু ক'রে বিকশিত হয়ে চলছে। মনোবিকাশের সাথে সাথে তার সৃজন ক্ষমতারও যে উন্নতি হয়েছে, তা তার ক্রমোন্নত (কীট থেকে আরম্ভ করে উন্নত মানুষ) সৃষ্টির দিকে তাকালেই তা' স্পষ্ট বোঝা যাবে।

আমাদের কাছে বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর অস্তিত্বের প্রমান:

বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে, আমাদের প্রমাণ করতে হবে--- ঈশ্বর-মনের অস্তিত্ব। আমাদের 'মহাবাদ' দর্শন অনুসারে --- আমরা মনে করি, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডই হলো ঈশ্বর-শরীর বা ঈশ্বর।

এক্ষেত্রে, বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বরের শরীর-অস্তিত্বের প্রমাণ দাখিল করার প্রয়োজন নেই। শুধু প্রমাণ করতে হবে, এই শরীরের মধ্যে একটি 'মহামন' আছে।

আমরা মনে করি, বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেনি। সে নিজেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড। অর্থাৎ তার পিছনে এক সৃষ্টিকর্তা অথবা সৃষ্টিরহস্য আছে। এ'নিয়ে পূর্বেই আমাদের 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন' নামক

সৃষ্টিতত্ত্বে যথাসম্ভব বর্ণনা করা হয়েছে। এই দর্শনে আমরা দেখেছি, বিশ্বাত্মা/ ঈশ্বর শুধু উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে এই জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ, সে আবার সৃষ্টি করেছে অনেক কিছু।

বস্তুতঃ এই জীব সৃষ্টির কর্তা হলো ঈশ্বরের মন। আমাদের ক্ষেত্রেও, আমরা যাকিছু সৃষ্টি করছি--- তার প্রকৃত স্রষ্টা হলো আমাদের মন।

এখন, এই মনকে বুঝতে হয় মন দিয়ে। মনের অস্তিত্বকে সরাসরি দেখা বা অনুভব করা--- আমাদের অধিকাংশ স্বল্প চেতন মনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মনের অস্তিত্বকে আমরা অনুভব করি--- মনের কার্যকলাপের মাধ্যমে।

মন হলো অনেকাংশে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর মতো একটি অতি উচ্চমানের সফটওয়্যার বিশেষ। এই সফটওয়ারের পিছনেও থাকে ডেভলপার---প্রোগ্রামার। এমনি এমনি কিছুই সৃষ্টি হয়ে যায় না।

মন সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে, 'মন-আমি' এবং 'নিজের মনকে জানো' পড়ুন।
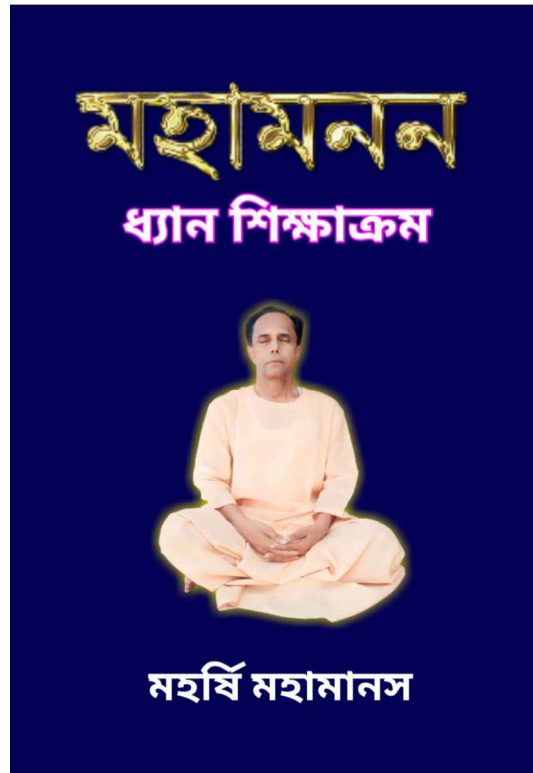
আমরা সবাই একই চেতন-স্তরে অবস্থান না করার ফলে, ঈশ্বর (আমরা বলি, 'বিশ্বাত্মা') সম্পর্কে আমাদের ধারণাও সবার ক্ষেত্রে একরূপ নয়। আবার আধ্যাত্মিক (দৃষ্টিকোণ থেকে) ঈশ্বর, আর প্রচলিত ধর্মীও ঈশ্বর একরূপ নয়। যখন তুমি নিজেকে নিজের স্বরূপে জানতে পারবে, একমাত্র তখনই তুমি ঈশ্বরকে তার প্রকৃত রূপে বা স্বরূপে জানতে সক্ষম হবে— অনেকাংশে।

এই মহাবিশ্বরূপ ঈশ্বরকে— মহাসাগররূপে কল্পনা করলে, তুমি হলে তার একবিন্দু জল বা পাণি স্বরূপ। এই মহাসাগরকে জানতে, সর্বাগ্রে— তার কয়েক বিন্দু জল বা পাণি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তোমাকে। তুমি নিজেকে এবং নিজের চারিপাশকে সঠিকভাবে যত বেশি জানতে পারবে, ঈশ্বরকেও জানতে পারবে তত বেশি।

আমরা 'মহাবাদ' ও 'মহাধর্ম'-এর অনুসরণকারীগণ আমাদের স্রষ্টাকে বলি, 'বিশ্বাত্মা'। আমাদের 'বিশ্বাত্মা' আর প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন নামে 'ঈশ্বর' একরূপ নয়। আমরা (মহাবাদ ও মহাধর্ম-এর অনুগামীগণ) মনে করি, এই মহাবিশ্ব হলো ঈশ্বরের শরীর, এবং এই শরীরের মধ্যে রয়েছে একটি মন, তা-ই হলো ঈশ্বর-মন। এই মহাবিশ্বরূপ 'শরীর' আর এই মহাজাগতিক 'মন' মিলে একত্রে ঈশ্বর অস্তিত্ব। বিশ্ব-প্রকৃতি আর আমাদের ঈশ্বর আসলে একই।

এই মহাবিশ্ব— ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নয়, সে নিজেই ঈশ্বর। এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর অতিরিক্ত আর কিছুর অস্তিত্ব নেই (একমাত্র সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন আদিসত্বা ছাড়া)। শুধুমাত্র এর কিছু অংশ— যেমন জীব— উদ্ভিদ প্রভৃতি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। যদিও ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেছে তার শরীর উপাদান থেকেই। আমাদের মনও সৃষ্টি হয়েছে— বিশ্ব-মন বা ঈশ্বর-মন থেকে। শুন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হয়নি। আমরা সবাই ঈশ্বরের অর্থাৎ এই মহাবিশ্বেরই অংশ।

এই বিশ্ব-অস্তিত্বই হলো ঈশ্বর। যা সৃষ্ট হয়েছে আদিসত্বা বা পরমাত্মা (সংস্কৃততে ব্রহ্ম) থেকে। এই আদিসত্বা ঈশ্বর নয়, এবং এই জাগতিক কর্মকান্ডে তার বিশেষ ভূমিকা নেই। এই বিশ্ব-লীলায় আদিসত্বা হলো নিরব ও প্রচ্ছন্ন দর্শকের মতো। আদিসত্বা— পরমাত্মা কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ নয়। পূর্ণতা হলো— পূর্ণ স্থির নিশ্চল— নিষ্ক্রিয় অবস্থা। পূর্ণতা থেকে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়। সেই অবস্থায় চাওয়ার কিছু থাকে না— পাওয়ারও কিছু নেই। সেই কারণে করারও কিছু নেই। সৃষ্টির প্রশ্নই আসেনা সেখানে।

আদিসত্বাও পূর্ণ নয়। তারও আছে কিছু চাহিদা— কিছু অভাব। সে জানেনা, সে— কে, কেনই বা সে, আর কোথা থেকেই বা সে এসেছে বা তার উৎপত্তি হয়েছে। জানেনা তার পরিণতি কী। এই নিজেকে জানার ইচ্ছাই হলো— সৃষ্টির আদি কারণ। অগত্যা, স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে, পুণরায় তাকে খোঁজা বা আত্মানুসন্ধান করাই হল— সৃষ্টির গোপন রহস্য।

একসময় এই মহাবিশ্ব— অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়েছে বা জন্ম নিয়েছে, এবং একসময় এর মৃত্যু বা ধ্বংসও হবে। এই মহাবিশ্ব— মহাসৃষ্টি হলো আদিসত্বার ইচ্ছার ফল। ঈশ্বরের জন্ম হয়েছে ঠিক একটি সদ্যজাত শিশুর মতো— শিশু-বিশ্ব রূপে। প্রায় অজ্ঞান-অচেতন একটি শিশুর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে— পূর্ণ বিকাশলাভের উদ্দেশে। প্রায় অজ্ঞান-অচেতন অবস্থা থেকে পূর্ণ চেতনার লক্ষ্যে, কর্মতৎপরতা সহ দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দলাভের মধ্য দিয়ে— জ্ঞান ও চেতনা লাভের জন্য অবিরাম চলাই তার নিয়তি। আর এটাই হলো জীবন।

পিতা-মাতার অপূর্ণ ইচ্ছাকে সন্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলার সাথে— এই মহাসৃষ্টির উদ্দেশ্য-র অনেকটাই সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বর বা মহাবিশ্ব-জীবনে অনেকগুলি ক্রমিক ধাপ রয়েছে, যথা— শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি, —অনেকটা আমাদের জীবনের মতোই।

শুধু ঈশ্বর নয়, আমরা সবাই চলেছি সেই এক লক্ষ্য পানে—। ইশ্বর বা মহাবিশ্বের অংশানুক্রমে আমরা প্রকৃতি—পরিস্থিতি এবং ঘটনা অনুসারে কেউ এগিয়ে আর কেউ পিছিয়ে আছি।

সৃষ্টির ক্রমিক পর্বগুলি নিম্নরূপ—

১) আদিসত্বা বা পরমাত্মা তার নিজ উপাদানে— প্রায় তার অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র মায়া সত্বা তৈরী করেছে প্রথমে।

২) আদিসত্বার প্রতিরূপ সত্বাটি— স্ব-অভিভাবন বা আত্ম-সম্মোহন দ্বারা অর্থাৎ যোগনিদ্রা বলে, নিজ জ্ঞান-গুণ-ক্ষমতা বিস্মৃত হয়ে— অস্ফুট চেতন-স্তরে উপনীত হয়।

৩) তারপর সে, প্রথম বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে— বহু বিভক্ত হয়ে, দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং বহু বিশ্ব ও বিপরীত বিশ্বের বীজে পরিণত হয়।

৪) সমস্ত বিশ্ব-বীজগুলি (এই বিশ্ব ছাড়াও মহাসৃষ্টিতে আছে বহু বিশ্ব ও বিপরীত বিশ্ব-অস্তিত্ব) একই সময়ে সবাই ঘটায় মহা-বিস্ফোরণ। তারপর, বীজ থেকে ক্রমশ মহীরুহের মতো— প্রত্যেকে মহাবিশ্বে পরিণত হতে থাকে— অসংখ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

৫) পরবর্তীকালে, কিছুটা পরিণত হওয়ার পর— আমাদের বিশ্বরূপ ঈশ্বর বা বিশ্বাত্মা একসময় উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টির খেলায় মেতে ওঠে...।

এই হলো, অতিসংক্ষেপে মহাজীবন-চলার কথা (বিশদভাবে জানতে হলে, 'মহাবাদ' গ্রন্থটি পড়তে হবে)। এই জীবন-চলার মধ্যে বহু পর্ব আছে। আছে বহু কর্মকান্ড। এই বিশ্বরূপ ঈশ্বর বা বিশ্বাত্মাসহ আমরা যতই এগিয়ে চলেছি, ততই অজ্ঞানতা— অচেতনতা ও মোহ থেকে মুক্ত হচ্ছি ক্রমশ। প্রকৃতপক্ষে, যথেষ্ট জ্ঞান-চেতনা লাভই এই জীবনের মূল লক্ষ্য।

ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণের ধারণা, ঈশ্বর শুধুই কল্যাণময়— শুভাকাঙ্খী— প্রেমময়, সৎ চিৎ আনন্দময়, জীবের বন্ধু। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ বা স্বরূপ তা' নয়। ঈশ্বরের মধ্যে তার বিভিন্ন চেতন-স্তর ও অবস্থা অনুযায়ী শুভ-অশুভ, সৎ-অসৎ উভয় গুণ ও শক্তিই বিদ্যমান। এখানে উল্লেখযোগ্য— ঈশ্বর যদি সত্যই জীবের বন্ধু বা শুভাকাঙ্খী হতো, তাহলে জীবের মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক তৈরী করতো না।

ঈশ্বর-মনের মধ্যে শুভাত্মক সৎ মন-অস্তিত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি তার মধ্যে অশুভ— অজ্ঞান-অসৎ মন-অস্তিত্বও রয়েছে। এই অসৎ অস্তিত্ব আসলে ঈশ্বরেরই আর এক দিক বা রূপ বা অস্তিত্ব।

ঈশ্বরের সন্তান ও অংশরূপে তার সাথে আমাদের বহু সাদৃশ্য বর্তমান। ক্রমবিকাশমান চেতনার পথে— ঈশ্বর যখন আমাদের অনুরূপ চেতন-স্তরে অবস্থান করেছে, তখন তার মানসিক অবস্থাও অনেকাংশে আমাদের মতই

ছিলো। আমাদের মতোই ঈশ্বরের মন ও চেতনাও ক্রমশ বিকাশমান। বিকাশমান মনের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নিম্ন-চেতন-মন অস্তিত্ব হলো— কয়েক প্রকারের অজ্ঞান-অসৎ বা ঋণাত্মক মন।

ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে এই ঋণাত্মক বা অসৎ মনের বিকাশ ঘটে, নিম্ন-চেতন-স্তরগুলির বিশেষ বিশেষ স্তরে— অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত অবস্থায়। ক্রমশ চেতনা বিকাশের সাথে সাথে, এইসব নিম্ন-চেতন-স্তরের অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মনগুলি সচেতন বা আরও উচ্চ-চেতন মনের প্রদীপের নীচে— অন্ধকারে আশ্রয় নেয়, অর্থাৎ অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে অন্তরালে চলে যায় তারা।

তাই বলে, একেবারে হারিয়ে যায় না কিছুই— সবই থাকে ফাইলের নীচে চাপা পড়া অবস্থায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ঈশ্বররূপ এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর অতিরিক্ত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এখানে ভালো-মন্দ যা কিছু আছে, সবই ইশ্বর বা ঈশ্বরের অংশ। মনের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি ('মন-আমি' দ্রষ্টব্য)।

তাইবলে, ঈশ্বরকে ভয় পাবার কিছু নেই। ঈশ্বর সৃষ্ট জীব কখনোই ঈশ্বরের শত্রু হতে পারে না। আবার, ঈশ্বরও কখনোই জীবকে শত্রু ভাবতে পারে না। ঈশ্বরের শত্রু হতে গেলে, যে ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, তা' কখনোই জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। জীবোত্তর জীবনে উচ্চতর চেতন-স্তরে— সে যতই উন্নীত হবে, ঈশ্বরের সাথে তার একাত্মতা বৃদ্ধি পাবে ততই।

জীবের প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুস্ট হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ, জীব যা কিছু করে, —সবই সে জাগতিক ব্যবস্থার দ্বারা চালিত হয়েই ক'রে থাকে। স্বতন্ত্রভাবে তার পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। তাই, তার কর্মের জন্য সে দায়ী নয়।

আমাদের ক্ষেত্রে যেমন— আমরাই আমাদের বড় শত্রু। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের বড় শত্রু (অজ্ঞানতার কারণে)। তেমনি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও। ঈশ্বরের মধ্যেও (নিম্ন চেতন-স্তরগুলিতে) চলে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সে নিজেই তার নিজের শত্রু। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে— মহাবিশ্ব জুড়ে। অবশ্য তার কুফল ভুগতে হয় জীবকেও। কিন্তু জীব এখানে অসহায়, তার পক্ষে ঈশ্বরকে শান্ত করা— প্রশমিত করা সম্ভব নয়। পূজা-পাঠ, প্রার্থনা—উপাসনা কোনো কিছুই ঈশ্বরকে টলাতে সক্ষম নয়।

তবে সান্তনা এই যে, ঈশ্বর এখন ক্রমবিকাশের পথ ধরে— অনেক উচ্চ চেতন-স্তরে উপনীত হয়েছে। তার ঋণাত্মক বা অশুভ-অসৎ মন এখন অতীতের অন্ধকারে প্রায় সুপ্ত অবস্থায় চলে গেছে। বিশ্বাত্মা এখন আর সৃষ্টির ব্যাপারে— কিশোর-যৌবনের লীলা-খেলার ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা যেমন— যা কিছু করছি— ভাবছি, সবই বাধ্য হয়ে করছি। জগতের অংশরূপে পূর্ব-নির্ধারিত জাগতিক ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে সবাইকে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তেমনি। ঈশ্বর নিজেই এই জগত স্বরূপ। তার মধ্যে যাকিছু ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে তার উপর ঈশ্বরের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তার ভাবনা-চিন্তা-কর্ম সবই পূর্ব-নির্ধারিতভাবে যখন যেটা ঘটার ঘটে চলেছে। এরই নাম ভাগ্য। সে যেটা নিয়ন্ত্রণ করছে সেটাও পূর্ব-নির্ধারিতভাবে করতে বাধ্য হচ্ছে সে। অপ্রিয় সত্যটা হলো— ভাগ্য ঈশ্বরের থেকেও বলবান।

এই পূর্ব-নির্ধারণ ঘটেছে সৃষ্টির শুরুতেই। সৃষ্টির শুরুতেই সমস্ত চিত্রনাট্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। কখন কোথায় কী ঘটবে, সবকিছুই স্থির হয়ে গেছে— সৃষ্টি শুরু হবার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই। যেমন একটি বিস্ফোরণ ঘটার সাথে সাথেই স্থির হয়ে যায়— তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কখন— কোথায় কী ঘটবে। সৃষ্টির শুরুও তো আসলে একটা বিস্ফোরণ বা মহা-বিস্ফোরণ!

ঈশ্বর প্রসঙ্গে –খুব স্বাভাবিকভাবেই দেব-দেবীদের কথা এসে যায়। বহু মানুষই ঈশ্বর ও দেব-দেবী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, বিভিন্ন দেব-দেবীকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা—উপাসনা করে থাকে। 'মহাবাদ'-এ উক্ত দেব-চেতন-স্তরের বাসিন্দারাই প্রকৃত অর্থে দেবতা। এখানে দেব-দেবী বলে কিছু নেই। কারণ, এই উচ্চ চেতন-স্তরে কোনো লিঙ্গ ভেদ নেই। নেই বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা।

সারা পৃথিবীতে প্রচলিত বা কাল্পনিক দেব-দেবী বা দেবতাগণ আর মহাবাদোক্ত দেবতাগণ এক নয়। এরা অনেক বেশি উচ্চ চেতন-স্তরের সত্ত্বা। পৃথিবীতে অবতরণ ক'রে মানুষের সাথে নানারূপ লীলা-খেলায় অংশ নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সংস্কৃতভাষায় দেবতার অর্থ জ্ঞানী-বিদ্বজন, যাঁরা তৎকালীন সাধারণ মানুষ থেকে বেশ কিছুটা উচ্চশ্রেণীর মানুষ।* ভগবান বলতেও সংস্কৃতভাষায় শুধু ঈশ্বরকেই বোঝায় না। দেবতুল্য ব্যক্তি, শৌর্য-বীর্যবান, ঐশ্বর্যশালি, জ্ঞানী, যশবান ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকেও ভগবান বলা হয়। আর, এর ফলেই, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বর ও দেবতা সম্পর্কে গুলিয়ে ফেলে।

আর, একটা গুহ্য কথা, পরোলোকের কিছু কিছু নিম্ন-চেতন-স্তরের বিদেহী আত্মা (বা দুরাত্মা)-দেরকে অনেক সময়েই বিভিন্ন পূজিত দেব-দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। বিশেষতঃ যে সব মন্দির ও তীর্থস্থানে অনাচার—কদাচার—দুরাচারে পূর্ণ, সেইসব স্থানেই ভূত-প্রেত-পিশাচাদি নিম্ন-চেতন-স্তরের প্রেত-আত্মাদের ভীড়। এদের মধ্যে কিছু কিছু চতুর প্রতারক মনের প্রেত-আত্মা অনেক সময়েই অজ্ঞান-অন্ধ-অসহায় মানুষ বা দেব-ভক্তদের প্রতারণা ক'রে আনন্দ পায়, এবং তাদের পূজা-অর্ঘাদি আত্মসাৎ ক'রে তৃপ্ত হয়।

এদের কেরামতিতেই অনেক দেবস্থান এবং অনেক দেব-দেবী হয়ে ওঠে জাগ্রত। দেবতা সম্পর্কে সঠীক ধারণা না থাকায়, অনেক মানুষই প্রতারিত হয়ে আসছে এইভাবে। অনেকেই ঈশ্বর আর দেবতার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পেরে মায়ার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে।

---

*বিদ্বাংসোদেবা (সূত্রঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৩ সুক্ত)
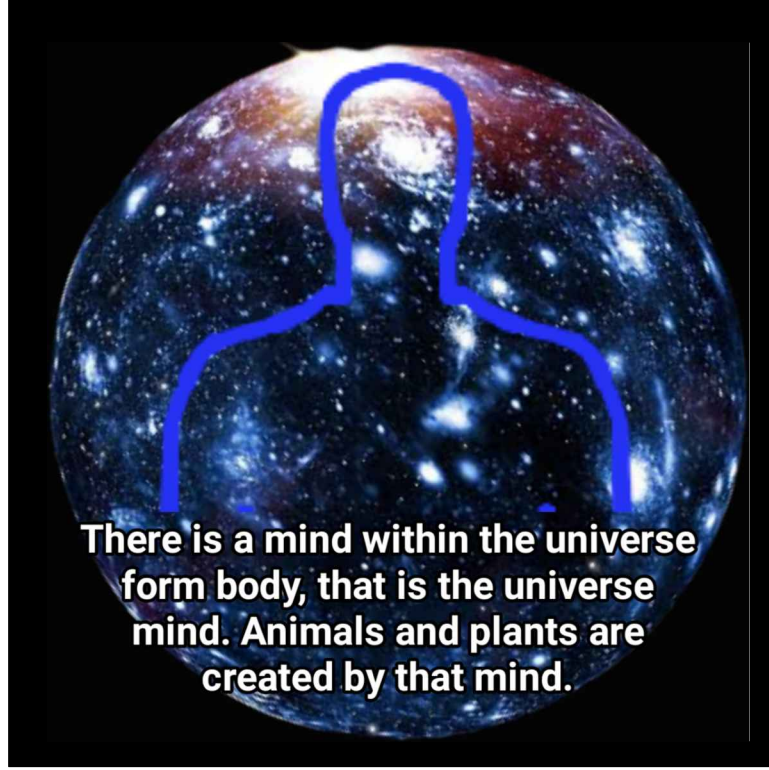
বিশ্বাসের চশমাটাকে খুলে রেখে দেখো

প্রচলিত ধর্ম--- দর্শন---মতবাদ -এর কথা আমি বলতে পারবো না। আমাদের ধর্ম-দর্শন-মতবাদে এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বই হলো ঈশ্বর। এই বিশ্ব-অস্তিত্বকে কি তুমি অস্বীকার করতে পারো !?

বিশ্বাসের চশমাটাকে খুলে রেখে দেখো। 'মহাধর্ম' ও 'মহাবাদ'-এর মধ্যে তুমি তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরকে খুঁজতে যেওনা। —পাবেনা। তথাকথিত স্বর্গলাভ– ঈশ্বরলাভ অথবা ব্রহ্মলাভের কোন পথ বা পদ্ধতির সন্ধান নেই এখানে। আছে মানবত্ব লাভের উপায়।

বিশ্বাসের চশমাটাকে খুলে রেখে, যথাসম্ভব প্রভাবমুক্ত হয়ে— খোলা মন নিয়ে, সত্যানুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি নিয়ে— এর গভীরে প্রবেশ করলে, তবেই বিস্ময়কর সত্য তোমার কাছে প্রকাশলাভ করবে।

'মহাধর্ম' ও 'মহাবাদ' হলো— যথাক্রমে এক স্বতন্ত্র ধর্ম এবং স্বতন্ত্র মতবাদ। বিভিন্ন শাস্ত্র —বিভিন্ন মতবাদ অথবা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে এর তুলনামূলক বিচার করতে গেলে, ধন্দে পড়ে যাবে। দেখবে, কোথাও হয়তো মিলছে, কোথাও মিলছে না। তারফলে, তোমরা অনেকেই মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে— হতবুদ্ধি হয়ে যেতে পারো।

তাই, 'মহাধর্ম' ও 'মহাবাদ'-এর দ্বারা লাভবান হতে চাইলে, একে এর দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। যুক্তিবাদী সচেতন মুক্ত মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

ঠিকমতো উপলব্ধি হলে, তখন বুঝতে পারবে, কোনটা লভ্য ---কোনটা লাভ করা সম্ভব, আর কোনটা আকাশ-কুসুম কল্পনা! বুঝতে পারবে, এতদিন কিভাবে মরিচিকার পিছনে ছুটে ছুটে মরেছো তুমি। বুঝতে পারবে মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য কী।

তুমি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে, তোমার জীবনের অধিকাংশ অসাফল্য— পরাজয়, হানি, অধিকাংশ দুঃখ–কষ্ট —যন্ত্রনার পিছনে প্রধানত দায়ী—তোমার অজ্ঞানতা, তোমার অন্ধ-বিশ্বাস। সঠিকভাবে নিজেকে না জানার ফলে, তোমার সামনের মানুষকে ঠিকমতো চিনতে না পারার ফলে, তুমি বহুবার ঠকেছ— প্রতারিত হয়েছো। এর পুণরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে, যতদিন না তুমি আলস্যতা কাটিয়ে সজাগ–সচেতন থেকে— সত্য–মিথ্যা, বাস্তব– অবাস্তব-কে চেনার ক্ষমতা লাভ করছো।

নিজেকে সজাগ–সচেতন রেখে— প্রভাবমুক্ত হয়ে, যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করে, সত্যানুসন্ধান করতে, গভীরভাবে চিন্তা করতে, অনেকটাই মানসিক পরশ্রম করতে হয়। তার চাইতে বিশ্বাস করা অনেক সহজ কাজ। বিশ্বাস করতে তেমন পরিশ্রমের দরকার হয় না। তাই, মানসিক শ্রমবিমুখ মানুষ— বিশ্বাসের পথটাই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু তার ফলে যে কী ক্ষতি হয়, তা' বোঝার জন্যেও মানসিক পরিশ্রম করতে সে নারাজ বা অপারক।

বিশ্বাসের পথে আত্মোপলব্ধি— সত্যোপলব্ধি, ঈশ্বরলাভ অথবা ঈশ্বরত্ব লাভ কিছুই সম্ভব হয় না। তবু, মানুষ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে ছুটে–ছুটে মরে। তাই, মানুষকে সজাগ-সচেতন —যুক্তিবাদী —সত্যানুসন্ধিত্সু ক'রে তুলতে, মানুষের জীবনে একের পর এক দুর্ভাগ্য নেমে আসে। মানুষ যথেষ্ট সজাগ-সচেতন না হওয়াবধি বারবার আঘাত আসতে থাকে, এবং আসতেই থাকে।

বিশ্বাসের দ্বারা পৃথিবীতে যতটুকু ভালো হয়েছে, মন্দ হয়েছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি। সারা পৃথিবী জুড়ে যত অমানবিক কর্ম সংঘটিত হয়েছে, যত রক্তপাত হয়েছে ও হচ্ছে, তার অধিক অংশের মূলেই আছে বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস।

আর, যদি মনে কর, তোমার বিশ্বাসের পথই শ্রেষ্ঠ পথ, ওটাই শেষ কথা, তাহলে বুঝতে হবে, মহাধর্ম ও মহাবাদ তোমার জন্য নয়।

এই মহাবিশ্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা নিম্নচেতন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, শঠতা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রচলিত ধর্ম তাকে দিয়েছে সহজবোধ্য কাল্পনিক ঈশ্বর, যাতে সে তা-ই নিয়েই নির্বোধের স্বর্গে অলীক সুখে মশগুল হয়ে থাকে।

মানুষ যাতে ক্রমশ চেতনা-সমৃদ্ধ হয়ে— কোনো দিনই আসল ঈশ্বরকে জানার এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারে, তারজন্য সমস্ত আয়োজনই পাকা করে রেখেছে এই ধর্ম নাম্নী অধর্ম।

একমাত্র প্রবল চেষ্টার দ্বারাই, ধর্মের এই কঠিন মায়াজালের ফাঁদ থেকে বেড়িয়ে এসে মুক্তি লাভ সম্ভব। চেষ্টা করো, নিশ্চয়ই পারবে। অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তিপ্রিয় সত্যপ্রেমী হয়ে ওঠো। আমার শুভকামনা তোমার সঙ্গে থাকবে।

দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, যেমন আলোতে আসতে ভয় হয়, দীর্ঘ বন্দী-জীবন কাটানোর পর, মুক্ত জীবনে ফিরে আসতে যেমন ভয় হয়, তেমনই আজন্ম ধর্মের ঘেরাটোপে বন্দী থেকে অভ্যস্ত মানুষ--- ধর্মের মোহজাল ছিঁড়ে বেড়িয়ে এসে মুক্তজীবন লাভের কথা ভাবতেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

এই ভয়কে জয় ক'রে মুক্তিলাভে সক্ষম হয় যে (যুক্তিপ্রিয় সত্যপ্রেমী মুক্তমনের) জন , সে-ই হলো প্রকৃত আলোকপ্রাপ্ত মানুষ।।

## ঈশ্বর দর্শন

ঈশ্বর দর্শনের কথা উঠলেই, আমার জানা সেই প্রেমোন্মাদ ছেলেটির কথা মনে পড়ে যায়।

সেই ছেলেটি একটি মেয়েকে খুব ভালোবেসেছিল। সে দূর থেকেই ভালোবাসতো। কথা বলার তেমন সুযোগ হয়ে ওঠেনি তার। বেশকিছুদিন এইভাবে চলছিল। শয়নে—স্বপনে— সদা জাগরণে সে তার কথাই ভাবতো। আর কল্পনায় নানা ছবি আঁকতো সেই ছেলেটি।

হঠাৎ করে মেয়েটিকে আর কোথাও দেখতে না পেয়ে, ছেলেটি পাগলের মতো চারিদিকে খুঁজতে লাগলো তাকে। কিন্তু কোথাও তার দেখা মিললো না। তার সন্ধানও পাওয়া গেলনা। ভয় ও সঙ্কোচের কারণে, কাউকে মেয়েটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করতে পারেনা সে। তখন তার সে কি করুণ অবস্থা।

আসলে, মেয়েটি তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে কিছুদিন এখানে ছিল। তারপর সে তার নিজের বাড়িতে চলে গেছে।

শেষে এমন অবস্থা হলো, ছেলেটি যেদিকে তাকায় সেদিকেই মেয়েটিকে দেখতে পায়। আরে! ঐতো সেই মেয়েটি! ... নাঃ কোথায় গেল!! একটু নিকটে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি যেন নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল!!!

বলতে চাইছি, ঈশ্বরের জন্য— ঈশ্বর দর্শনের জন্য এমনই পাগল হলে, তখন ঈশ্বরকে ঐ ছেলেটির মতো অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। যা দেখা যায়, তা' আসলে তার মেন্টাল প্রোজেকশন ছাড়া আর কিছুই নয়।

## ভাগ্য আসলে কী

ভাগ্য হলো~ মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব-সৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই স্বয়ংসৃষ্ট--- স্বয়ংক্রিয় এক জাগতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায়, ঐ বিস্ফোরণের মূহুর্তেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়~ পরম্পরাগত ঘটনাক্রমে কখন~ কোথায়~ কী ঘটবে। এরই নাম ভাগ্য।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি কোনকিছু খুব তীব্র গতিতে বহুল পরিমূ প্রসারিত হয়, সেক্ষেত্রে তা বিস্ফোরণের মতোই মনে হবে।

এখানে যাকিছু ঘটছে, সব কিছুর মূলে রয়েছে ভাগ্য, ভাগ্যই সব কিছুর জন্য দায়ী। আর এই ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। তবে, ভাগ্যকে কার্যকর ফলবৎ হতে, বিভিন্ন কার্য-কারণের ভিত্তিতে, পরিবেশ-পরিস্থিতি সাপেক্ষে, যুক্তি-বিজ্ঞানের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হয়। ভাগ্যের জন্যেই আমরা কেউ সুখী -কেউ দুঃখী, কেউ সফল –কেউ অসফল। ভাগ্যের জন্যেই আমাদের এত দুঃখকষ্ট-যন্ত্রনা। তাই, ভাগ্যকে খুব ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে ভাগ্য এবং তার গতিবিধি সহ সমস্ত কার্য-কারণ যুক্তি-বিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়না। আবার কখনো কিছু অংশে দৃষ্টিগোচর হলেও তার প্রতিকার দৃষ্টিগোচর বা ধারণাগত হয়না, অথবা প্রতিকার সম্ভব হয়ে ওঠেনা। ফলে, আমরা অসহায়ের মতো দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করে থাকি, অসফল ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হই। মনে রাখতে হবে, আমরা এবং আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ, সবই ভাগ্যের দান। আমরা কেউই ভাগ্য প্রসুত ঘটনা প্রবাহের বাইরে নই। তাই, আমাদের কর্তব্য ভাগ্যকে তার স্বরূপে জানা।

আসলে ভাগ্য হলো, কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বতঃসম্ভূত একপ্রকার ব্যবস্থা, যা স্থান-কাল-পাত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি সাপেক্ষে, পরম্পরাগত ঘটনাবলীর কার্য-কারণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কার্যকর হয়ে, অবশ্যম্ভাবি ভাবী ঘটনা বা ঘটনাবলীর অমোঘ নির্ধারক ও নিয়ামক। *

জাগতিক বা মহাজাগতিক ক্ষেত্রে: ভাগ্য হলো- আদি মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জগৎ সৃজন শুরু হওয়ার মুহূর্তে উৎপন্ন হওয়া– অবশ্যম্ভাবি ভাবী ঘটনাবলীর নির্ধারক ও নিয়ামক রূপ একপ্রকার অনৈচ্ছিক শক্তি অথবা স্বতঃসৃষ্ট প্রোগ্রাম রূপ ব্যবস্থা। প্রোগ্রাম। এছাড়াও, ব্যবহারীক অর্থে— পূর্বনির্ধারিত ঘটনা অথবা পূর্বনির্ধারিত পরম্পরাগত অবশ্যম্ভাবি ঘটনা বা ঘটনাবলীকেও ভাগ্য বলা হয়। প্রতিটি ঘটনা— সৃষ্টিরূপ প্রতিটি উৎপাদন,

তার সাথে সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা বা সৃষ্টির আপাত কারণ। যা সৃষ্টির শুরুতে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে।

সৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথেসাথেই এই ভাগ্য— অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে। তখনই ঠিক হয়ে যায় কখন কোথায় কেমন ভাবে কি ঘটবে। জগতের সর্বত্র বিস্তৃত প্রম্পরাগত অবশ্যম্ভাবী ঘটনা প্রবাহ। ঈশ্বর অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব রূপ অস্তিত্বও ভাগ্যের অধীন। ঈশ্বরের সমস্ত কার্যকলাপও ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বলাযায়, ভাগ্য ঈশ্বরের থেকেও বলবান।

বস্তুর গঠন-উপাদান, পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং প্রযুক্ত বল প্রভৃতি যাই হোকনা কেন, ঘটনা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।* কোনো দুটি ক্ষেত্রে, বস্তুর গঠন-উপাদান, পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং প্রযুক্ত বল প্রভৃতি যদি ভিন্ন হয়, সেক্ষেত্রে তাদের ভাগ্যও ভিন্ন হবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।*

বোঝাবার সুবিধার্থে, একটি সহজ নিদর্শন দিয়ে বলি, একটি তীরের ফলক যুক্ত ঘূর্ণমান চক্রের ঘূর্ণনক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথেসাথেই স্বতঃই নির্ধারিত হয়ে যায়, তীরের ফলকের তীক্ষ্ণ কোণটি কখন এবং ঠিক কোথায় গিয়ে স্থির হবে।* এ-ই হলো ভাগ্য এবং পূর্বনির্ধারিত ঘটনা। মহাসৃষ্টি বা জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ। সৃষ্টির শুরুতে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

একটা ঘটনা থেকে জন্ম নেয় একাধিক ঘটনা। সেইসব ঘটনাগুলি থেকে একের পর এক জন্ম নিতে থাকে আরো অনেক ঘটনা। এইভাবে 'সাকসেসিভ স্ট্রিম অফ ইভেন্টস' চলতে থাকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো ঘটনা হতে উদ্ভূত বিভিন্ন ঘটনাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কোন নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে না। বহিরাগত অথবা এর বাইরে সৃষ্ট অন্যান্য ঘটনা, বিষয়-বস্তু, শক্তি প্রভৃতি তার বা তাদের চলাকে বিঘ্নিত করে বা প্রভাবিত করে অথবা যুক্ত হয়ে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

তাই, এখানে উল্লেখিত উদাহরণ শুধুনাত্র উদাহরণই। আমার আলোচ্য মূল ঘটনার সঙ্গে এই উদাহরণের খুব বেশি সাদৃশ্য থাকবে না। আলোচ্য মূল ঘটনাটি হলো— মহাবিশ্ব-সৃষ্টি শুরুর মূহুর্তে ঘটা মহাবিস্ফোরণ! যা বিগ-ব্যাঙ নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে, মূল ঘটনা এবং তা' থেকে সৃষ্ট অসংখ্য ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার মতো বাইরের কোনো বিষয়-বস্তু, শক্তি বা ঘটনা অনুপস্থিত। এখানে ঘটনাক্রম এগিয়ে চলেছে সুশৃঙ্খলভাবে স্বয়ং-নির্ধারিত পথ ধরে।

ভাগ্য আমাদের ভিতরে বাইরে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ক্রিয়াশীল। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সহ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তা জাগতিক কর্মকান্ডেরই অংশ। আমরাও এই জগতেরই একটা অংশ। এখানে, ভাগ্যক্রমে বা ঘটনাক্রমে কেউ ধনী ---কেউ দরিদ্র, কেউ মহৎ আবার কেউ অসৎ। তা-ই বলে এর পিছনে কোনো নিয়ন্তা বা নির্ধারক ও নিয়ামক চেতন সত্তা নেই, আছে স্বতঃসৃষ্ট এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

আমাদের অসহায়তার মুলে ভাগ্য দায়ী হলেও, জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতাই তার অন্যতম কারণ। তাই জাগতিক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা সহ জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহন আশু কর্তব্য।

কিন্তু, জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণেই আমরা বুঝে উঠতে পারিনা কে প্রকৃত জ্ঞানী আর কে ভন্ড-প্রতারক। কোনটা জ্ঞান আর কোনটা নয়, কিসে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হবে বুঝতে পারিনা। ফলে, আমরা অসহায়ের মতো দিগবিদিগ জ্ঞানশূণ্য হয়ে ছোটাছুটি করি এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভন্ড গুরু, জ্যোতিষী ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের করতলগত হয়ে আরো বেশী দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করি।

যদিও এই ভাবেই জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে তিলেতিলে আমাদের চেতনায় বিকাশ ঘটে থাকে। অনেক সময়েই জ্ঞানীর সদুপদেশের পরিবর্তে ভন্ড-প্রতারকের কু-পরামর্শই আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হয়। জ্ঞানীর সুপরামর্শ আমাদের মনঃপুত হয়না।

ভাগ্য, ঈশ্বর তথা জাগতিক ব্যবস্থা শুধু আমাদের ভালোই চায়, -এই রকম ভুল ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। ভাগ্যকে অনেকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করে থাকে, বলে থাকে— 'ঈশ্বর যা করেন আমাদের ভালোর জন্যেই করেন।' ঈশ্বরের ইচ্ছা- সেও আসলে ভাগ্যেরই সৃষ্টি। ভাগ্যেরই প্রকাশ। কিন্তু তাই বলে- ঈশ্বরই ভাগ্য-বিধাতা নয়। এই মহাজগৎ বা মহাবিশ্বরূপ সত্তাই হলো – ঈশ্বর।

এ' হলো এক বিচিত্র বৈপরীত্যে ভরা অদ্ভূত জগত। যে ব্যক্তি অন্যায়-অপরাধ -কুকর্ম করছে, ভাগ্যই তাকে দিয়ে তা' করাচ্ছে। যে অপরাধী- সে অপরাধ করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ ভাগ্য তাকে বাধ্য করাচ্ছে অপরাধ করতে। অপরাধ না করে তার উপায় নেই। আবার যে ভালো কাজ করছে, সেও বাধ্য হচ্ছে তা করতে। যে অপরাধীকে ধরছে এবং যে অপরাধীকে শাস্তি দিচ্ছে, ভাগ্যই তাদের দিয়ে তা করাছে। কুকর্ম করেও অনেকে শাস্তি ভোগ করছে না, আবার সুকর্ম করেও শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে অনেককে।

এই পক্ষপাতিত্বের সঠিক কারণ খুঁজে না পেয়ে, অনেকেই পূর্বজন্মের কর্মফলের কাল্পনিক তত্ব হাজির করে থাকে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাহলে অতি নিম্ন-চেতন স্তরের যে জীবটিকে হত্যা করে আমরা তার মাংস খাচ্ছি, -তার সুকর্ম-কুকর্ম, দোষ-গুণ–অপরাধ ও কর্মফলের হিসেবটা কিরকম হবে? আর তার এই করুণ পরিণতিতে সেই জীবটির কি ভালো হতে পারে?!

ঈশ্বর, ভাগ্য এবং এই জাগতিক ব্যবস্থা কারোই— জীবের জন্য কিছুমাত্র মাথাব্যাথা নেই। ঈশ্বর তার শৈশব ও কৈশোরের ছেলেখেলায়- যখন জীব সৃষ্টির শখ হয়েছিল, সেইসময় জীবের প্রতি তার কিছুটা নজর থাকলেও, জীবের উপর সুবিচার করেনি সে কখনোই। জীবকে জীবের খাদ্যে পরিণত করাটাই তার বড় প্রমাণ। ঈশ্বরের বয়স বৃদ্ধির সাথেসাথে— জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে, আস্তে আস্তে খেলা-ধুলার পাট চুকে যাওয়ার পর, পুতুল খেলার শখ মিটে গেলে- জীব তখন শৈশবের খেলাঘরে অনাদরে পড়ে থাকা আবর্জনার স্তুপ বৈ আর কিছু নয়।

ঈশ্বরকে যতই ডাকো— যতই তার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাও, তাতে সে বিরক্তই হবে, ভক্তের উপর সদয় হবেনা সে কখনোই। বর্তমানে আমাদের মাথার উপরে কোনো শাসক নেই কোনো সহায়কও নেই। আছে আমাদের চারিপাশে বিস্তার করে থাকা অধিকাংশে অদৃশ্য —ভাগ্যের জাল। অজ্ঞান-অন্ধত্ব -চেতনাভাবের কারণে আমরা সম্পূর্ণ ভাগ্যের অধীনস্থ হয়ে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করে চলেছি। আমাদের জ্ঞান ও চেতনার যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেই আমরা ভাগ্যের হাত থেকে বহুলাংশে মুক্ত হতে পারবো।

তাহলে জীবজগৎ টিকে আছে কি করে? দুঃসহ সব কঠিণ অবস্থার মধ্য দিয়ে— ঈশ্বর প্রদত্ত শরীর-মন এবং তার মধ্যে অন্তগ্রথিত নির্দেশ বা 'প্রোগ্রাম' সম্বল করে, অনেক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা সয়ে— প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে জীব টিকে আছে এই জগতে। ঘটনাচক্রে -ভাগ্যক্রমেই সে টিকে আছে। যে সমস্ত জীব পরিবর্তীত প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে অক্ষম হয়েছে, তারা হারিয়ে গেছে এই কঠিণ নিষ্ঠুর জগৎ থেকে।

এই জগতে যা কিছু ঘটছে- সবই ঘটনাক্রমে বা ভাগ্যক্রমে ঘটে চলেছে। এখানে এর ব্যতীক্রম ঘটানোর সাধ্য নেই কারো। একমাত্র, উচ্চ চেতনা সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তার পর্যাপ্ত জ্ঞান ও চেতনার দ্বারা নিজেকে ভাগ্যের বন্ধন থেকে অনেকাংশে মুক্ত করতে সক্ষম। তাই, 'ভাগ্য জীবের ভালোই চায়, ভাগ্যকে মেনে নিলে আমরা অনেক ভালো থাকতে পারবো, কিম্বা ভাগ্য যাকে যেদিকে নিয়ে যেতে চায় সে দিকে গেলেই তার ভালো হবে।' —সব সময়েই এই সাধারণ সরল হিসেব সমান কার্যকর হয়না। ঘটানাক্রমে কখনো ভালো হতেও পারে, কখনো নাও হতে পারে।

এইসব দেখে-শুনে, স্বভাবতঃই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে- তাহলে, প্রকৃতই ভাগ্য কী চায়? -ভাগ্যকে বুঝতে, -তার কার্যকলাপকে বুঝতে, তার জন্ম লগ্নের দিকে ফিরে তাকাতে হবে আমাদের।

মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির শুরু, আর সেই বিস্ফোরণের ক্ষণটিতেই জন্ম নেয় ভাগ্য নামক এক স্বয়ংসৃস্ট ব্যবস্থা। যেমন, একটি বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে একের পর এক নানা ঘটনা। বিস্ফোরণের মূহুর্তেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়, তারপরে কি ঘটবে, এবং তারও পরে পরম্পরাগতভাবে একের পর এক কি-কি ঘটতে থাকবে। * এই জগতে যা কিছু ঘটছে এবং যা কিছু ঘটবে সে সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হয়ে গেছে ---মহা বিস্ফোরণের মুহুর্তে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এখানে 'প্রায়' কথাটি বলছি এই জন্যে যে বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে এর পিছনে ছিলো— ইচ্ছাশক্তি ও স্থান-কাল এবং পাত্র হলো বিস্ফোরক বস্তুটির গঠণ-উপাদান প্রভৃতি। বিস্ফোরণ পরবর্তী পরম্পরাগত ঘটনাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একের পর এক ঘটতে থাকলেও, এদের মধ্যে পূর্বোক্ত সেই ইচ্ছাশক্তি— যে ইচ্ছাবলে বিস্ফোরণটি ঘটেছিলো, সেই ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় আছে।

আমরা জানি, মহাজগৎ সৃষ্টির পিছনে রয়েছে আদি ইচ্ছা— আদি উদ্দেশ্য, এবং তাকে সফল করে তোলার পরিকল্পনা ('মহাবিশ্ব-সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন' দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও, আমরা এই মহাজাগতিক ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে পুনরায় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটতে দেখেছি। প্রথমে তার প্রকাশ ঘটেছে- ঈশ্বর মনের মধ্য দিয়ে, এবং তার পরবর্তীতে জীব প্রভৃতি ঈশ্বরের অংশ থেকে সৃষ্ট হওয়া ঐচ্ছিক সত্তার মধ্য দিয়ে। সেই আদি ইচ্ছা- আদি উদ্দেশ্য হলো - আত্মবিকাশ লাভ!

সমস্ত সৃষ্টি এবং তার জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যে- ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক উভয় প্রকার শক্তিই ক্রিয়াশীল রয়েছে। ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক শক্তি সম্মিলিতভাবে সমস্ত জাগতিক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। ভালো করে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে— কখনো ঐচ্ছিক শক্তি থেকে অনৈচ্ছিক শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, আবার কখনো অনৈচ্ছিক শক্তি থেকে ঐচ্ছিক সত্তা বা শক্তি জন্ম নিচ্ছে। তবে, এ জগতে কোনো শক্তিই পুরোপুরি ঐচ্ছিক অথবা পুরোপুরি অনৈচ্ছিক নয়। অনৈচ্ছিক শক্তির মধ্যে অল্প হলেও ঐচ্ছিক শক্তি নিহিত আছে। আবার ঐচ্ছিক শক্তির মধ্যেও অল্প-স্বল্প অনৈচ্ছিক শক্তি নিহিত রয়েছে। এখানে কোনো ঘটনাই— ঐচ্ছিক শক্তির দ্বারা অথবা অনৈচ্ছিক শক্তির দ্বারা সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত ও সৃষ্ট নয়। আর এটাই হলো আমাদের ক্ষেত্রে জাগতিক সমস্যার অন্যতম একটি কারণ।

সবসময়, সর্বক্ষেত্রে— ঈশ্বর বা জীবের ইচ্ছামতো সবকিছু ঘটা সম্ভব নয় এখানে। তারপর, ঈশ্বর এবং আমাদের ইচ্ছাও অনেকাংশে অনৈচ্ছিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে যা কিছু ঘটছে, সবই পূর্বনির্ধারিত ভাবে ঘটে চলেছে, এবং এর পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে আদি-ইচ্ছা কাজ করছে। ঈশ্বর এবং আমাদের ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছামতো আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ —সবই ভাগ্যক্রমে পূর্বনির্ধারিত মতো ঘটে চলেছে।

ঈশ্বর— জীবের স্বার্থে জীবের মঙ্গলের জন্যে বিশেষ কিছু করেনা। সে যা কিছু করে, সবই নিজের স্বার্থে—নিজের প্রয়োজনের তাগিদে। সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই কখনো জীবের মঙ্গল হয়, আবার কখনো ক্ষতি হয়। কখনো কারো ভালো হয় তো কখনো কারো মন্দ হয়। অংশানুক্রমে ঈশ্বর সৃষ্ট জীবও তাই এত স্বার্থপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, জীবও নিজের যৌন চাহিদা মেটাতে গিয়েই ঘটনাক্রমে সন্তানের জন্ম দেয়। জাগতিক ব্যবস্থা কারো স্বার্থ দেখেনা। সে হলো- নিরপেক্ষ এক অনৈচ্ছিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা। যে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটা ওয়াকিফহাল, সে ততটাই স্বাধীন।

ঈশ্বর তার প্রয়োজনানুগ কর্মও কিন্তু সবসময় পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামতো করতে পারেনি— পারেনা। কখনো শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর তৈরী হয়েছে, আবার, কখনো বাঁদর তৈরী করতে গিয়ে শিব তৈরী হয়ে গিয়েছে। তাই জীবের দুঃখ-কষ্টযন্ত্রনার জন্য সবসময় ঈশ্বরকেও পুরোপুরি দায়ী করা যায়না। আমরা যেমন অসহায়, তেমনি ঈশ্বরও তার সেই নিম্ন-চেতন স্তরে ছিলো অসহায়। তারও সহায় নেই কেউ। তাই এই মহাসৃষ্টিকে এক মহা অনাসৃষ্টিও বলা যেতে পারে।

তবে, যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাবই হলো এই অসহায়তার অন্যতম কারণ। ঈশ্বর যখন জীব সৃষ্টি করেছিলো তখন তার জ্ঞান ও চেতনা ছিল এখনকার তুলনায় খুবই কম। আবার, এখন সে যে উচ্চ-চেতন স্তরে পৌচেছে, -সেখান থেকে সেই শৈশব ও কৈশোরের ছেলেখেলায় সে আর আগ্রহী নয়। সে এখন মোহ-মায়া থেকে অনেকটাই মুক্ত।

পূর্বনির্ধারিত অবশ্যম্ভাবি ঘটনার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হলে— সমগ্র ঘটনা প্রবাহের বাইরের থেকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকে কোনোরূপ শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সেই ঘটনা প্রবাহের অন্তর্গত কোনো ঘটনার পরিবর্তন সাধিত হলে, তা পূর্বনির্ধারিত ঘটনাক্রমেই সংঘটিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

জাগতিক বা মহাজাগতিক প্রতিটি ঘটনাই- মহাজগৎ ব্যাপী বিস্তৃত ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্গত। মহাজগতের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ঘটনাই মহাজাগতিক ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই, জাগতিক কোনো ঘটনার পরিবর্তন ঘটাতে হলে, তার জন্য এই মহাজগতের বাইরের থেকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যা মোটেই সম্ভব নয়।

ভাগ্য নামে— ভাবী ঘটনাবলীর নির্ধারক ও নিয়ামক শক্তি বা প্রোগ্রাম’-টি উৎপন্ন হওয়ার সময়, অর্থাৎ মূল ঘটনা ঘটার সময়— সেই ঘটনার সাথে বা পিছনে যদি কোনো উদ্দেশ্যমূলক ঐচ্ছিক শক্তি থাকে, অথবা কাজ করে, সেক্ষেত্রে, ভাগ্য রূপ অনৈচ্ছিক শক্তি বা প্রোগ্রাম’-টির সাথে সেই ইচ্ছাশক্তি অথবা ইচ্ছা রূপ প্রোগ্রাম'-টি যুক্ত হয়ে, ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক উভয় শক্তি বা প্রোগ্রামের সমন্বয়ে ভাগ্য রূপ ‘প্রোগ্রাম'-টি গঠিত হয়ে থাকে। তারফলে শুধু অনৈচ্ছিক প্রোগ্রাম বা নির্দেশের দ্বারা যেরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কথা – ঠিক সেইরূপ না হয়ে, উভয়ের বলাবল সাপেক্ষে, অনৈচ্ছিক ও ঐচ্ছিক প্রোগ্রামের মিলিত ক্রিয়ায় ভাবী ঘটনাবলী ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

মহাজগতের ভিতর থেকে মহাজাগতিক ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। ভাগ্য রূপ প্রোগ্রাম'-টি অপরিবর্তনীয় হলেও, -এই ভাগ্যের দ্বারা সংঘটিত মহাজগৎ ব্যাপী বিস্তৃত অসংখ্য ঘটনাবলী কিন্তু সততই পরিবর্তনশীল। তবে, এই সতঃসৃষ্ট অনৈচ্ছিক শক্তি সম্পন্ন ভাগ্য বা 'প্রোগ্রাম'-এর সাথে যদি কোনো ইচ্ছাশক্তি অথবা ঐচ্ছিক প্রোগ্রাম যুক্ত থাকে, তার জন্মের সময় থেকেই যুক্ত হয়ে থাকে, সেই ইচ্ছাশক্তি রূপ প্রোগ্রাম বা ঐচ্ছিক প্রোগ্রাম অনুসারে নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো সময়ে বা সময়গুলিতে এই ভাগ্যের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

যেমন, সেই ঐচ্ছিক প্রোগ্রামের মধ্যে যদি এইরূপ কোনো নির্দেশ থাকে, যে ঈশ্বর এবং ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীব বা কোনো সত্তা কালক্রমে উচ্চ-চেতনা সহ প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠলে, তখন তারা তাদের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। অথবা ভাগ্যের বন্ধন থেকে অনেকাংশে মুক্ত হতে পারবে, —সেক্ষেত্রে, সেই নির্দেশ কার্যকর হবে।

শেষ করার আগে, আমি আমার অনুগামীদের উদ্দেশে বলব, তাৎক্ষণিক লাভের আশায় ভাগ্য বা ঈশ্বর অথবা কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য সত্তার দয়া বা কৃপা লাভের পিছনে না ছুটে, নিজের আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের জন্য তৎপর হও, সর্বাঙ্গীন সুস্থতা লাভের জন্য উদ্যোগী হও। তাহলেই ক্রমশ তোমরা দুর্ভাগ্য থেকে অনেকাংশে মুক্তিলাভ করতে পারবে, সেই সাথে অজ্ঞানতার বন্ধন থেকেও মুক্তিলাভ ঘটবে তোমাদের।

একদিক থেকে দেখলে, দুর্ভাগ্য আর কিছুই নয়, তোমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ঘষে-মেজে খাঁটি সোনায় পরিণত করার এক নিষ্ঠুর জাগতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তোমরা যদি নিজের থেকেই খাঁটি সোনা হয়ে ওঠার উদ্যোগ নাও, আত্মবিকাশের উদ্যোগ নাও, তাহলে দুর্ভাগ্য তোমাদের কী করবে! দুর্ভাগ্যের জন্য মূলতঃ দায়ী করো নিজেকে, এবং দুর্ভাগ্যের অসাফল্যের কারণ গুলি অনুসন্ধান করো নিজের মধ্যে। দোষ-ক্রটি –ঘাটতি, অজ্ঞানতা অসুস্থতা —ঋণাত্মকতা প্রভৃতি কারণ গুলিকে একে একে চিহ্নিত করে তারপর সেই কারণ গুলির অপসারণ ঘটাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাও। নিজের মধ্যে শুভ পরিবর্তন ঘটাতে পারলে, তোমাদের ভাগ্যেরও শুভ পরিবর্তন ঘটবে। তবে এগুলি করতে পারলে, বুঝতে হবে তা' ভাগ্যক্রমেই করেছো, এবং সেক্ষেত্রে তুমি সৌভাগ্যবান।

যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাবেই আমরা এত অসহায়। সমস্যা কোথায়— বিপদ কোন দিক থেকে আসছে এবং তার মোকাবিলা করতে অথবা তার থেকে নিস্তার পেতে কি করা কর্তব্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' আমাদের ধারণা ও জ্ঞানের অতীত হওয়ায় আমরা এত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করে থাকি। যা করলে দুঃখ-কষ্ট পাবো যাতে আমাদের ক্ষতি হবে, অনেক সময়ে আমরা তা-ই করে থাকি। তাই এর থেকে রেহাই পেতে আমাদের একমাত্র কর্তব্য জ্ঞান ও চেতনা লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া। একমাত্র, যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনাই আমাদের মুক্তি দিতে সক্ষম। অথচ আমরা অজ্ঞান-অন্ধত্বের কারণে তা' না করে, অজ্ঞানের সাধনা করে চলেছি, যাতে আরো বেশী করে মোহ-মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ি সেই চেষ্টাই করে চলেছি আমরা।

এই বৈপরীত্যের জগতে— জ্ঞান ও চেতনা লাভের ডাক, —আত্মবিকাশ লাভের আহ্বান যেমন ভাগ্যের ঐচ্ছিক শক্তির দান, তেমনি আবার জ্ঞান ও সত্য লাভে অনিহা —আত্মবিকাশ লাভে অনিচ্ছাও দেখা দেয় দুর্ভাগ্যক্রমে। যে ইচ্ছাক্রমে এই মহাজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল, যে ইচ্ছাক্রমে ঈশ্বর এবং তার সৃষ্ট জীব— আমরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছি, সেই আদি-ইচ্ছা —আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের ইচ্ছা অন্তর্গ্রথিত হয়ে আছে আমাদের সবার অন্তরের গভীরে। যে সেই অন্তরের ডাক শুনতে পায়, সেই ভাগ্যবান।

Note______________________

* যদি মূল ঘটনা ঘটার পরবর্তী সময়ে— বাইরের কোনো বস্তু বা শক্তি বা ঘটনা— সেই ঘটনা থেকে সৃষ্ট ঘটনাক্রম বা ঘটনাবলীর সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত না হয়।

● ভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক রিসার্চ পেপার প্রকাশিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নালে।
Link to the research paper (download pdf) 'What exactly Destiny is: an exploration from a scientific viewpoint'
https://www.isroset.org/journal/IJSRPAS/full_paper_view.php?paper_id=2397#parentHorizontalTab2

---
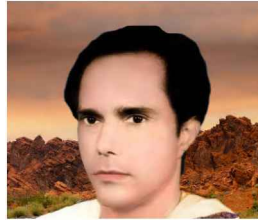
সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস। অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তিনি একালের একজন মহাপ্রাজ্ঞ সদগুরু মহান মানব প্রেমিক ঋষি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক। আমরা তাঁর অনেক ভক্তগণই তাঁকে স্মরণ কোরে, তাঁর শরণ নিয়েই বহু বিপদ-আপদ ও সমস্যা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকি।

আমরা জ্ঞান পথের পথিকগণ জানি, তাঁর প্রদর্শিত ও নির্দেশিত পথে— তাঁর দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ কোরে চললে, আমাদের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটবে। জীবনটাই বদলে যাবে— সুখ শান্তি আনন্দ ও সুস্থতায়, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে আমাদের জীবন। আমরা যারা তাঁর পথ অনুসরণ কোরে— অনায়াসে তার কিছুটা লাভ করতে পেরেছি, তারাই জানি এর সত্যতা।

অন্যান্য আধ্যাত্মিক গুরু বা অবতার পুরুষদের সাথে তঁর তুলনা চলে না। তাঁর প্রদর্শিত পথ— 'মহা আত্মবিকাশ পথ' যা 'মহামনন' নামে পরিচিত, এবং তাঁর দর্শন ও মহা মতবাদ— 'মহাবাদ' সেইসব মুক্তমনা যুক্তিবাদী আত্মবিকাশকামী প্রগতিশীল মানুষদের জন্য, যাদের জ্ঞান পিপাসা— আত্ম জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে তেমন মানুষের সংখ্যা আজ আর কম নয়। মানবজাতির যথেষ্ট বয়েস হয়েছে— এখন চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

একবিংশ শতাব্দি যে হবে মহা-আত্ম-বিকাশ এবং 'মহাবাদ'-উক্ত প্রকৃত আত্মবিকাশ যোগের কাল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আসুন, আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে মহা আত্ম-বিকাশ পথের পথিক হই।

সারা জীবন ধরে তিনি মানুষের প্রকৃত বিকাশ, মনোবিকাশ এবং জীবন ও মহাজীবনের পরম সত্য অন্বেষণ তথা উন্মোচনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

মানুষকে অজ্ঞান-অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করতে, মানব মনের সঠিক বিকাশ ঘটাতে, তিনি সুদীর্ঘকালের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মানুষ গড়ার এক অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের দিয়েছেন, যার নাম। 'মহামনন' আত্ম-বিকাশ যোগ শিক্ষাক্রম।

তিনি বলেন, "সে-ই হলো প্রকৃত মানবধর্ম আধারিত ধর্ম, যা মানব মনের বিকাশ ঘটাতে সরাসরি সাহায্য কোরে থাকে। ধর্ম পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো— আত্মবিকাশ বা যথেষ্ট মনোবিকাশ লাভ।

ঈশ্বর লাভের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে একশ্রেণীর দুষ্ট লোকের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যা কিছু বলা হয় এবং করা হয়, তা আর যা-ই হোক, মানব বিকাশমূলক ধর্ম— মানবধর্ম মনে করেন না তিনি।

সদগুরু মহামানস একজন বহুমুখী সৃজন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং বহুব্যপক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিল্পী, গবেষক, মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ। একজন জ্ঞান পথের ও বিকাশ পথের পথিক। পৃথিবীর মুক্ত-পাঠশালায় তিনি আজও অবিরাম শিক্ষা গ্রহন ক'রে চলেছেন।

তিনি কোনো সাধু সন্ত বা গুরুবাবা নন। তিনি একজন মহান ঋষি। সদগুরু মহামানস একজন সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক। তাঁর সারা জীবনের বড় অবদান হলো, তাঁর মহান মতবাদ~ মহাবাদ। যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, মানববিকাশ মূলক যুগান্তকারী ধর্ম~ মহাধর্ম। মহাধর্মের মহা ধর্মগ্রন্থ, যুক্তিসম্মত আধ্যাত্মিক দর্শনসহ আধাত্মিক মনোবিজ্ঞান এবং আত্মবিকাশ তথা মনোবিকাশের শিক্ষায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ আমাদেরকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

বিভিন্ন শিল্প কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ধ্যানযোগ সহ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও তাঁর সহজাত ব্যুৎপত্তি ও সমান আগ্রহ দেখা যায়।

তাঁর কথা, আমাকে নিয়ে মাতামাতি কোরো না। আমাকে দেখা ও পাওয়ার জন্যে শ্রম ও সময় ব্যয় না ক'রে, এমনকি আমার জীবনধারা অনুসরণ না কোরে, আমার প্রদর্শিত মত, পথ ও শিক্ষা অনুসরণ কোরে, তার মধ্য দিয়েই আমাকে খুঁজে পাবে। মহাশিবের মতোই অসাধারণ বর্ণময় জীবন তাঁর।

তিনি অল্প বয়সেই সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ কোরে, বহু জনপদ— বহু তীর্থ ঘুরে, সারা ভারত ভ্রমণ কোরে, পরে হিমালয়ে গিয়ে অবস্থান করেন। বহুকাল ধরে তিনি হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে— বিশেষ কয়েকজনকে দীক্ষা দেন। বর্তমানে তাঁদেরই কয়েকজনের প্রচেষ্টায় 'মহাধর্ম মিশন' এবং 'মহাধর্ম সংসদ' গড়ে উঠেছে। সমস্ত জগতবাসীকে মহামানসের ধর্ম— 'মহাধর্ম' এবং তাঁর উপদেশ— বাণী, শিক্ষা এবং তাঁর যুক্তিস্মমত অধ্যাত্ম-দর্শনসহ আত্মবিকাশ লাভের প্রকৃত ও সহজ উপায় জানানোর উদ্দেশ্যে আমরা প্রয়াসী হয়েছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে মহামানসের দিব্য আলোকে আলোকীত হয়ে উঠি।

মহর্ষি মহামানসের জন্ম বৃত্তান্ত অত্যন্ত রহস্যময়। তিনি প্রকৃতপক্ষে ভিন গ্রহের বাসিন্দা ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে।

মহর্ষি মহামানসের বাবা-মায়ের বিবাহের পর কয়েকবছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও তাঁদের কোনো সন্তানাদি না হওয়ায়, মা  সুভদ্রাদেবী সন্তান লাভের আশায় একজন সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো শিবের কাছে মানত করেন। নিয়মিতভাবে যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত-উপবাস-ধর্ণা এবং শিবনাম জপ ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে একসময় তিনি দৈববাণী লাভ করেন, যে তার গর্ভে ভিন্ন গ্রহ থেকে মহাশিবের অংশ রূপে একজন মহাপুরুষের আগমন ঘটবে। তার কিছুদিনের মধ্যেই এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি গর্ভবতী হন।

তারপর, যখন তিনি প্রায় নয় মাসের গর্ভবতী, একদিন এক পর্যটক সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হলেন আকস্মিকভাবে। সেই জটাজুটধারী বিশালদেহী সন্ন্যাসী সুভদ্রাদেবীর উদ্দেশে বলেন, তোমার গর্ভে একজন মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে, তিনিই এই যুগের উদ্ধারকর্তা। তিনিই প্রকৃত অধ্যাত্ম পথের দিশারী। শীঘ্রই তোমার কোল আলো করে তিনি অবতীর্ণ হবেন।

প্রথমদিকে তাঁর বাড়ির নাম রাখা হয়েছিল~ বিশ্বনাথ। পরে, অন্য জায়গায় বসবাসকারী তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের ওই একই নামকরণ হওয়ার কারণে, তখন তাঁর নাম রাখা হয়~ তারক। এখনো তাঁর পৈতৃক গ্রামের অনেক মানুষই তাঁকে তারক নামেই চেনে। মহর্ষি মহামানস নামটি পরবর্তী সময়ে তাঁর একজন গুরুর দেওয়া নাম।

আরও বিস্তারিতভাবে তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত রয়েছে 'মহাবাদ' ও 'মানবধর্মই মহাধর্ম' নামক গ্রন্থে।

মহর্ষি অল্প বয়সেই সত্যের সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে নানা দেশে ঘুরে, তারপর হিমালয়ে গিয়ে সেখানে অবস্থান করেছিলেন বহুদিন। কিন্তু কোথাও তিনি তাঁর যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর পাননি।

অবশেষে তিনি ঘরে ফিরে এসে, নিজেকে বারবার প্রশ্নবানে জর্জরিত করে, আত্মধ্যানে ধ্যানমগ্ন হওয়ার পর, তাঁর অন্তর থেকেই একেরপর এক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর উঠে আসে। সেই নিয়েই রচিত হয়েছে তাঁর দর্শন ও মতবাদ।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট দুর্দশায় সমব্যাথি হয়ে তিনি প্রকৃত মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। মহর্ষি দীর্ঘকাল তপস্যা, সাধনা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, এতো সমস্যার মূল কারণ হলো তাদের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর থেকে মুক্ত হতে পারলেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান হবে। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে একটি চমৎকার মানববিকাশের শিক্ষা প্রণালী গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয়~ 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম। এর পরেই তিনি তাঁর যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান সহ নিজস্ব মতবাদ~ 'মহাবাদ' ভিত্তিক মনোবিকাশ তথা মানববিকাশ মূলক শিক্ষা দান শুরু করে দেন।

বহুমুখি প্রতিভাবান এবং বহু গুণাধার প্রজ্ঞাবান এই অসাধারণ মানুষটির জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা থাকলেও, তিনি সেগুলোকে সযত্নে গোপনে রাখতেই পছন্দ করেন। এসবের পাশাপাশি তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও করেছেন। তাঁর কিছু গবেষণাপত্র বিভিন্ন সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি জানতেন, চেতনা বিকাশের পথে বহু যোজন পিছিয়ে থাকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানো মোটেও সহজ কাজ নয়। তবুও তিনি মানুষের মনোবিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যেই নিরলসভাবে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। নিজের জীবদ্দশায় ফলের আশা না করেই তিনি গাছ লাগিয়ে গেছেন, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

আরও বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে, অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। ধন্যবাদ।
https://mahadharma.wixsite.com/book

।। জয় সদগুরু মহামানসের জয় ।।

অনলাইনে লভ্য অন্যান্য গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত রিসার্চ পেপারগুলির জন্য নিম্নোক্ত লিঙ্কগুলি অনুসরণ করুন।

Recently published books of Maharshi MahaManas:

The scientific thoughts of a spiritual scientist!
https://www.amazon.com/gp/aw/d/9354380417/ref=tmm_pap_swatch_0?ie=UTF8&qid=&sr=

The absolute wisdom of the millennium: Unveiling The Truths of Life and Cosmic Life by Maharshi MahaManas
https://www.amazon.in/absolute-wisdom-millennium-Unveiling-MahaManas/dp/B0915BLCGD

Political Thoughts of the Great Sage Maharshi MahaManas
https://www.amazon.in/Political-Thoughts-Great-Maharshi-MahaManas/dp/9354388892/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=political+thoughts+mahamanas&qid=1625716101&s=books&sr=1-1

MahaPathy
https://www.kobo.com/us/en/ebook/mahapathy

Some Remarkable Research Papers Published in Various International Journals in 2021
https://www.amazon.com/dp/B09NRK1L9S?ref_=pe_3052080_397514860

MahaDharma: The only religion for real human development and world peace: The Religion suitable for rationalist, free thinkers, free from blind faith.
https://www.amazon.com/dp/B09PK6F471

Here are some of the highlights from his research papers:

1) 'What exactly Destiny is: an exploration from a scientific viewpoint' International Journal of Scientific Research in Physics and Applied Sciences.
https://www.isroset.org/journal/IJSRPAS/full_paper_view.php?paper_id=2397#parentHorizontalTab2

2) UNVEILING THE TRUTH OF 'TIME' AND 'TIME TRAVEL' ALONG THE PATH OF SCIENCE! International Journal of Research Publication and Reviews (IJRPR),
http://www.ijrpr.com/v2i9.php

3) 'S-Existence : There is Another Existence of Everything' published on Mon, 06 Dec 21 in Global Journals Inc. (U.S.) GJSFR-A Volume 21 Issue 4 Version 1.0
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume21/2-S-Existence-There-is-Another.pdf

4) "The Right Way to Defeat Coronavirus!' published in the International Journal of Scientific Research (IJSR).
https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/article/the-right-way-to-defeat-coronavirus/MzY1ODM=/?is=1&b1=&k=

5) 'The only way of human development and peace' International Journal of Teacher Education and Teaching (Chicago, USA)
Volume 1 Issue 2 July 2021, Page No. 19.
https://ijtetchicago.com/previous-issues/

6) "MahaPathy: The Super-Excellent System of Medicine" by Sumeru Ray (Maharshi MahaManas)
Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-5 | Issue-5, August 2021, pp.2299-2308,
https://www.ijtsrd.com/medicine/other/46300/mahapathy-the-superexcellent-system-of-medicine/sumeru-ray

7) Sumeru Ray (Maharishi MahaManas), "UNRAVELING THE MYSTERY OF THE CREATION OF THE UNIVERSE!", International Journal of Creative Research Thoughts

(IJCRT), ISSN:2320-2882, Volume.10, Issue 11, pp.c792-c818, November 2022, Available at :http://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2211316.pdf

একমাত্র সঠিক মন-বিকাশমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি অর্জন করা সম্ভব!

## ভূমিকা

যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক মহর্ষি মহামানস কর্তৃক এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে ! মহর্ষি বলেন, একমাত্র সঠিক মনোবিকাশের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, এবং সেইসঙ্গে মহাধর্ম নামে মানববিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন।

মহর্ষি মহামানসের মানব মুক্তির বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ' এর মূল কথা হলো:
সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা~ অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির মূল কারণ হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব, আর মানসিক অসুস্থতা। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-সন্ত্রাস, সবই তার থেকেই জন্ম নিয়েছে।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি সর্বত্র একালের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ'-এর 'মহামনন' নামক মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান হবে।

মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য প্রচলিত একাডেমিক (স্কুল-কলেজের) শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট নয়। তা' যদি হতো তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী মানবকেন্দ্রীক এতো সমস্যা-- এতো অশান্তি ও সঙ্কট সৃষ্টিই হতোনা। আজকের এই কঠিন বিপর্যয়ের একমাত্র সমাধান করতে পারে মহর্ষি মহামানস প্রদর্শিত বিশুদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলন।

এই উদ্দেশ্যেই সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস সত্যিকারের মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে 'মহামনন' নামে ধ্যান প্রশিক্ষণ সহ অপরিহার্য মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা বা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ তৈরির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন!

এর পাশাপাশি তিনি প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস মুক্ত, আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ধর্মের প্র্যাকটিস বা অনুশীলন পর্বই হলো 'মহামনন'।

মহর্ষি মহামানস প্রবর্তিত 'মহাধর্ম' ও 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম হলো প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক বিপ্লব!

মহর্ষি সত্যের সন্ধানে সারা দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, এতো সমস্যার মূল কারণ হলো তাদের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর থেকে মুক্তি দিতে পারলেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রীক সমস্যার সমাধান হবে। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে একটি চমৎকার মানববিকাশের শিক্ষা প্রণালী গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয়--- মহামনন আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম।

এর পরেই তিনি হিমালয় থেকে নেমে এসে যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক এবং নিজস্ব মতবাদ-- 'মহাবাদ' ভিত্তিক মানববিকাশের শিক্ষা দান শুরু করে দেন।

মহর্ষি বলেন, প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি তখনই অর্জিত হবে, যখন 'মহামনন' -এর সঠিক আত্মবিকাশের শিক্ষা সারা বিশ্বে অনুশীলন করা হবে। আর, সত্যিকারের মানববিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ সমস্যা ও অশান্তি দূর করে মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতিশীল বা মানবদরদী হলেই হবেনা। সমস্ত কুপ্রভাব ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে, সজাগ-সচেতন হয়ে আত্মবিকাশের পথ ধরে জ্ঞান ও চেতনায় যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

প্রথমে তিনি এই কলকাতাতেই 'মহামনন' আত্মবিকাশ কেন্দ্র' নামে একটি বিশ্বমানের মনোবিকাশ সহ ধ্যান শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছেন। মানববিকাশের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে মহর্ষি সকল সচেতন মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।।

সেই সঙ্গে তিনি সরকারের কাছেও আবেদন রাখছেন, আগামী প্রজন্মকে এই ভয়ানক কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে, তাদেরকে সুস্থ, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ, যথেষ্ট বিকশিত মানুষ করে তুলতে সরকার যেন প্রতিটি স্কুলে তাঁর এই মনোবিকাশ মূলক শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন।

একজন যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে, শুধু জ্ঞান থাকলেই হবেনা, সেইসঙ্গে বুদ্ধিমত্তা~ কল্পনাশক্তি~ উদ্ভাবনী ক্ষমতারও বিশেষ প্রয়োজন। এই কল্পনা কোনো অলীক কল্পনা নয়, বাস্তবসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনাময় সুদূরপ্রসারী কল্পনা, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি।
সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই কমবেশি রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটাতে হবে।

নিয়মিতভাবে মনোবিকাশের শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে চেতনা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে আসে, সেইসঙ্গে এগুলিরও বিকাশ ঘটতে থাকে ক্রমশ।

এবার এই অসাধারণ ম্যান-মেকিং শিক্ষার পদ্ধতি, গঠন বা কাঠামো এবং পাঠক্রম সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবো।

প্রথমেই যেটা বলা প্রয়োজন তা হলো
একালের মহান মতবাদ 'মহাবাদ' অর্থাৎ 'মহাইজম' এর উপর ভিত্তি করেই 'মহামনন' নামে এই অতুলনীয় শিক্ষা পদ্ধতি ও তার পাঠক্রম তৈরি হয়েছে।

'মহাইজম'এর মূল কথা হলো, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মানুষের যথেষ্ট মনবিকাশ ঘটাতে পারলে একমাত্র তবেই প্রকৃত মানববিকাশ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। তাই সর্বসাধারণের মন-বিকাশ ঘটানোই হোক আমাদের প্রথম কর্তব্য।

মূলত মানব মনের বিকাশের উপায়, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মহাবাদ বা মহাইজম। তারসাথে প্রয়োজন অনুযায়ী রয়েছে মানব জীবনের ও মহাজাগতিক জীবনের বহু রহস্য উন্মোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

'মহাবাদ' বা 'মহাইজম' একটি বৃহদাকারের গ্রন্থ। এখানে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো।

'মহাইজম" এর অতি সারসংক্ষেপ নিয়ে অ্যামাজন থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি গ্রন্থ, নাম 'The absolute wisdom of the millennium'. এই গ্রন্থ থেকেও আমরা মহাইজম সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবো।

এছাড়াও আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম থেকেও 'মহাবাদ' বা 'মহাইজম' সম্পর্কে অনেক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবো।

'মহামনন' শিক্ষাক্রম মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। একটি হলো থিওরিটিক্যাল অংশ এবং অপরটি হলো প্র্যাকটিক্যাল অংশ।

মুক্তমনের আত্মবিকাশকামী সচেতন মানুষ এই মহান উদ্যোগের সাথে যুক্ত হতে চাইলে, তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ~সম্পাদক

If you are interested to know more, please do a Google search: Maharshi MahaManas / MahaManan / MahaDharma / **मानवधर्म ही महाधर्म** / মানবধর্মই মহাধর্ম

## মহামনন

প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তি অর্জনে অপরিহার্য একটি চমৎকার এবং অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চলেছি আজ !

একটু সজাগ দৃষ্টিতে চারপাশে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, গোটা মানব জাতি এক ভয়ানক সংকট ও কঠিন অসুস্থতার মধ্য দিয়ে কোনক্রমে এগিয়ে চলেছে। আর যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে এই দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা, শোক সমস্যা এবং দারিদ্র্যের তীব্রতা।

সারা বিশ্বে মানুষের দ্বারা সংঘটিত অন্যায়, দুর্নীতি, নিপীড়ন, ধর্ষণ, প্রতারণা, সহিংসতা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ইত্যাদি অমানবিক কাজ আজ পর্যন্ত কেউ থামাতে পারেনি। ধর্ম, রাজতন্ত্র বা রাজনীতি, প্রশাসন বা কোনো শক্তিশালী ব্যবস্থা বা সংস্থা এখনো মানবজাতির এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি।

অধিকাংশ মানবসৃষ্ট সমস্যার মূল কারণ হল চেতনা ও জ্ঞানের অভাব। অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধ-ভক্তি, কুসংস্কার এবং মানসিক অসুস্থতা, সমস্তই এর থেকে উৎপন্ন হয়।

এর একমাত্র সমাধান হল, প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক পথে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার এবং মানসিক বিকাশ লাভের জন্য মৌলিক মানুষ গড়ার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

একই সঙ্গে যুক্তিবাদী ও মানসিকভাবে বিকশিত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উন্নয়নের মান অনুযায়ী বিশেষ সনদ বা সার্টিফিকেট দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটগুলো মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হলে, মন-বিকাশের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি মনকে জানতে ও বিকশিত করতে সক্ষম হয় এবং যুক্তিবাদী হতে শেখে এবং তা অনুশীলন করে, তবেই তারা ধীরে ধীরে অন্ধ-ভক্তি, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।

একই সাথে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ প্রবণ শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত ক'রে, আচরণগত ত্রুটির তদন্ত ক'রে যথাযথ শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। তবেই শুভ পরিবর্তন আসবে।

দেহ ও মনের সুস্থতা ছাড়া প্রকৃত মন-বিকাশ ও মানববিকাশ সম্ভব নয়। এর জন্য, এর পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল বিভাগ গঠন করতে হবে।

বিভিন্ন এলাকায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মন-উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ক'রে, সকলকে মন-বিকাশ শিক্ষা ও অনুশীলনের সুবিধা ব্যাখ্যা ক'রে, তাদের এই শিক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে 'মহামনন' মন-বিকাশ পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। 'মহামনন' হল প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষা~ মন-বিকাশের শিক্ষার একটি চমৎকার - অতুলনীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। তবে সময়ের সাথে সাথে এই শিক্ষা পদ্ধতির আরও উন্নতি ঘটবে।

মানব উন্নয়নের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

'মহামনন' হলো প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির জন্য প্রকৃত মন বিকাশের এক অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃত শিক্ষাই একমাত্র সমাধান। 'মহামনন' হল সত্যিকারের শিক্ষা যা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত মানুষ হতে সরাসরি সাহায্য করে। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের ধীরে ধীরে যথেষ্ট সচেতন ও জ্ঞানী ক'রে তোলে। এছাড়াও এটি আমাদের বেশিরভাগ সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম ক'রে তোলে। তাই মানব উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা।
আমি আপনাকে মানব বিকাশ এবং বিশ্বশান্তির একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, যা বিশ্বব্যাপী সঠিক ও সার্বিক মন-বিকাশের জন্য অপরিহার্য একটি চমৎকার-অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

'মহামনন কেন্দ্র' হল একটি চমৎকার~ সত্যিকারের মন-বিকাশ (মনোবিকাশ শিক্ষাক্রম) এবং মানব বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্র। মানুষ গড়ার কর্মশালা। প্রথমে আমরা এই বাংলাতেই 'মহামনন কেন্দ্র' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের মন-বিকাশ ও ধ্যান শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাই।

আমরা মনে করি, প্রকৃত মানব বিকাশের মাধ্যমেই মানবজাতি তথা দেশের উন্নয়ন সম্ভব, আমরা এও মনে করি, প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক একাডেমিক (স্কুল-কলেজ ইত্যাদি) শিক্ষা মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য যথেষ্ট

নয়। তার জন্য আমাদের এমন একটি অপ্রথাগত (অপ্রাতিষ্ঠানিক) মৌলিক মানব বিকাশমূলক শিক্ষা প্রয়োজন যা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করবে।

এটা প্রত্যেক সচেতন মানুষেরই জানা আছে, মানব সমাজের অধিকাংশ সমস্যা-অশান্তি ও অপরাধের কারণ হলো জ্ঞান ও চেতনার অভাব এবং মানসিক অসুস্থতা। এবং এটি স্ব-(মন) বিকাশ শিক্ষার অভাবের কারণেই ঘটছে। তাই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
ব্যক্তি এককের বা ইউনিটের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশ ও সমগ্র মানব জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর সেই লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে 'মহামনন' কার্যক্রম।

'মহামনন' মন-বিকাশের শিক্ষা হল বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূর করার বৈজ্ঞানিক উপায়। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও চেতনার অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারণ।

স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প সচেতনতা সম্পন্ন একজন দরিদ্র মানুষকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করলে হয়তো সে  সাময়িকভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ নাও ঘটতে পারে।

বংশগতভাবে বা অন্যথায় প্রচুর সম্পদের অধিকারী একজন ধনী ব্যক্তির যদি যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব থাকে, তবে শীঘ্রই সে তার সমস্ত সম্পদ হারাতে পারে এবং দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, যদি না সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে। তবে জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ এবং সেইমতো কাজ সম্পাদনের জন্যেও কিছু জ্ঞান থাকা জরুরি। ক্রমাগত অর্থ এবং সম্পদ উপার্জন এবং তাদের রক্ষা করার জন্য একজনের যথেষ্ট জ্ঞান এবং চেতনা থাকা প্রয়োজন।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক মুক্তি পেলেই যে মানব উন্নয়ন হবে তা নয়।

অর্থনৈতিক উন্নতির (economic development) ফলে মানুষের জীবন সাময়িকভাবে আরামদায়ক হতে পারে, মানব সম্পদ ও মানব সভ্যতার আপাত উন্নতি ঘটতে পারে, প্রচলিত (ডিগ্রি লাভের) শিক্ষায় মানুষ উচ্চশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তাতে মানুষের মনের বিকাশ ঘটবে না। আর সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না হলে মানুষ একসময় তার সমস্ত সম্পদ হারাবে এবং আবার দারিদ্রে পতিত হবে। এমনকি সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়েও যেতে পারে।

মানুষের বিকাশ মানেই আমরা বুঝি মানুষের মনের বিকাশ। চেতনা বা সচেতন মনের বিকাশ।

যদি মানুষের মন যথেষ্ট বিকশিত না হয়, তাকে বাইরের থেকে যতই চটকদার দেখাকনা কেন, মানুষ সেই অন্ধকারেই থাকবে অতীতে যেখানে সে ছিল।

মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা হলো সবচাইতে বড় সমস্যা। অজ্ঞান জনিত অন্ধত্ব থেকে যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আসে, সেগুলোকে দূর করে আমরা যদি মানুষকে প্রকৃত মন-বিকাশমূলক মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি, যদি আমরা তাদের সঠিকভাবে মন-বিকাশের ব্যবহারিক পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দিতে পারি। তাহলেই মানুষের বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

মানুষের (মনের) বিকাশ না ঘটলে বাকি সব বাহ্যিক উন্নয়ন হবে বানরের গলায় মুক্তার মালার মতো। আর মানুষের বিকাশ ঘটলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হতে থাকবে স্বাভাবিকভাবেই।

এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্য থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে মানুষকে সচেতন ও সচেতন করার পাশাপাশি জীবনের অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবজাতির বহু সমস্যা ও সঙ্কটের মূল কারণ হলো আমাদের অন্ধবিশ্বাস।
আমাদের অধিকাংশ সমস্যা দুঃখ কষ্ট দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো অজ্ঞানতা জনিত অন্ধত্ব, কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাস। শুধু দারিদ্র্যমুক্ত নয়, মানবাধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন অধিকাংশ মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনা থাকবে।

প্রচলিত ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাসহ প্রচলিত কোনো ব্যবস্থাই মানুষের এই মূলগত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নয়।

এই প্রসঙ্গে, আমি বলতে চাই যে সাম্যবাদ (communism) এই সমস্যার সমাধান নয়। অনেকে বলেন, মানব সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এর সমাধান হবে। কিন্তু এটাই আসল সত্য নয়।

সাম্যবাদ তখনই সফল হতে পারে যখন সমগ্র মানব জাতির জ্ঞান ও চেতনা যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে প্রায় সমতা অর্জন করবে। আরোপিত সাম্যবাদ একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা মাত্র। সেক্ষেত্রে সুবিধাবাদী নেতৃত্ব শ্রেণীর লোকেরাই লাভবান হবে। সাম্যবাদের পথে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হবে না। কমিউনিজম হলো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো কৃত্রিম ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা কখনোই সফল হতে পারে না। মানুষের জন্য ভালো হতে পারে না।

তাই, অলীক কমিউনিজম নয়, এর জন্য প্রয়োজন 'মানবধর্ম' ভিত্তিক 'মহাধর্ম', এবং এটি আধুনিক সময়ের মহান মতবাদ: 'মহাবাদ'। যা মানুষকে যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হতে সাহায্য করে। একমাত্র উন্নত মানুষই পারে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এর ওপর কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা চাপানোর প্রয়োজন নেই।

মনুষ্য সৃষ্ট আজকের এই চরম সংকট থেকে পরিত্রাণের পেতে মনোবিকাশের ও মানব-বিকাশের ধর্ম ~ 'মহাধর্ম'-ই হলো একমাত্র উপায়। এই ধর্ম প্রচলিত ধর্মের মতো মিথ্যাশ্রয়ী ধর্ম নয়। এটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় মন-বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানব বিকাশের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। 'মহামনন' হলো এই ধর্মের অনুশীলন।

আমাদের স্লোগান~ **'মানবধর্মই মহাধর্ম' 'मानवधर्म ही महाधर्म'**

আমরা আমাদের জীবনকে আরও সুন্দরভাবে উপভোগ করতে চাই~ জীবনে সফল হতে চাই~ সুখী, সমৃদ্ধশালী-শান্তিময়, আনন্দময়, সুন্দর, সুস্থ জীবন পেতে চাই। আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। আমাদের পার্থিব বিকাশের সাথে সাথে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, জ্ঞানে, গুণে, আচরণে, প্রকৃত শিক্ষায়, সক্ষমতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

যদি আপনার চাওয়া একই হয়, আপনি যদি একটি সুখী-উন্নত, স্বাস্থ্যকর, সুন্দর জীবন উপভোগ করতে চান, তবে আপনি তা অর্জন করতে পারেন 'মহামনন' শিক্ষা সিলেবাসের এই মহান মন-বিকাশমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে। এমনকি আপনার প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি, 'মহামনন'  মন-বিকাশ শিক্ষাক্রমসহ  'মহামনন-যোগ' পদ্ধতি নিয়মিত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশের সাথে সাথে আপনার পরীক্ষার রেজাল্টও অনেক ভালো হবে।

যুগান্তকারী এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপ দিতে যদি বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন, তবেই মানবকেন্দ্রিক অধিকাংশ সমস্যা সহ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে প্রকৃত মানব বিকাশ সম্ভব হবে।

অগ্রবর্তী সচেতন মানুষের কাছে একটি সময়োপযোগী আবেদন:

একটি চিরাকাঙ্ক্ষিত দূষণ ও দুর্নীতি মুক্ত উন্নত পৃথিবী তৈরি করতে,  আমাদের এই মানবজীবনকে ধন্য করে তুলতে, নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলতে, আমাদের সমাজ থেকে অমানবিক কার্যকলাপ এবং দারিদ্র্য দূর করতে, আমাদের কাছে আজ  সত্যিকারের মানব উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য চমৎকার ও অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। নিজের এবং বৃহত্তর স্বার্থে একে সাদরে গ্রহণ করুন।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার স্রষ্টা হলেন~ মহর্ষি মহামানস ওরফে সুমেরু রে। আমরা বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি সত্যিকারের মানব উন্নয়নমূলক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

আমাদের সত্যিকারের মানব উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আমাদের সমমনা ব্যক্তিদের প্রয়োজন। আপনি যদি এই প্রোগ্রামে আগ্রহী হন, তাহলে এটি সম্ভব করতে আপনার সাহায্যের হাত প্রসারিত করুন এবং এই মহান উদ্যোগে অংশগ্রহণ করুন। 'মহামনন' শুধু এটি প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষা~। জনগণ একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

'যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হওয়ার আহ্বান' কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে আমাদের সামনে কোনো শিক্ষাকেন্দ্র, কোনো পথ বা পদ্ধতি নেই। এখন সেই পথ দেখিয়েছেন এ' যুগের একজন ভারতীয় মহান ঋষি~ মহর্ষি মহামানস।

মানব বিকাশের এই উৎকৃষ্ট শিক্ষা (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) এতই সুন্দর যে কোনো স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যদি তা পায়, সেই শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল অনেক ভালো হবে। সেই সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর আচরণেও অনেক উন্নতি ঘটবে।

'মহামনন' শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ কোর্স নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্ম বা মনের বিকাশ ঘটে। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, অনেক মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিক সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে তারা আত্মশুদ্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধি সহ প্রকৃত আত্ম-বিকাশের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। এছাড়া যারা অপরাধের দিকে ঝুঁকছে তারা এই শিক্ষাসহ 'মহামনন'-এর বিশেষ কোর্সের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারে এবং বিকশিত আত্মায় পরিণত হতে পারে। একটি শান্তিপূর্ণ-উন্নত সমাজ /দেশ গড়ে তোলার জন্য, 'মহামনন' হল সকলের জন্য চমৎকার অতুলনীয় ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

মহান ঋষি~ মহর্ষি মহামানসের প্রদর্শিত পথের মাধ্যমে আপনার জীবনকে উজ্জ্বল এবং আরও প্রস্ফুটিত করে তুলুন, আপনার জীবনে একটি অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক শুভ পরিবর্তন নিয়ে আসুন।

'মহামনন' ('মহা আত্ম-বিকাশ-যোগ') শিক্ষামূলক কর্মসূচি শুধুমাত্র আত্ম-বিকাশ বা মন-বিকাশের তাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞান, বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, আধুনিক মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান এবং মহামানসের উদ্ভাবিত আরও অনেক পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত, যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতা, 'মহামানস-যোগ' এবং
মহর্ষি মহামানসের নতুন উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, এবং বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষা এবং প্রয়োজনে তার ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়।

'মহামনন'~ 'মহা আত্ম-বিকাশ যোগ শিক্ষা হল একটি সহজ সরল এবং সহজবোধ্য কার্যকর পাঠ্যক্রম সামগ্রিক মন-বিকাশ বা আত্ম-বিকাশের সাথে মৌলিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহ বিশুদ্ধ (যুক্তিসঙ্গত) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা।

যথেষ্ট সুস্থতা ছাড়া প্রকৃত মন-বিকাশ সম্ভব নয়। সে জন্য ‘মানসিক চিকিৎসা’ ‘মহামনন’ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যে দেহ ও মনের সংমিশ্রণ একজন নিজেকে মানুষ বলে গর্ব বোধ করে, সে যদি সেই দেহ ও মন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। সে হলো ঊনমানুষ বা অসম্পূর্ণ মানুষ। 'মহামনন'-এর মৌলিক শিক্ষা একজনকে সর্বক্ষেত্রে একজন উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করে। যে শিক্ষা অনুসরণ ও অনুশীলন করে (ব্যবহারিক~ প্রয়োগ পদ্ধতি সহ) একজন ব্যক্তি সবদিক থেকে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারে, তা হল ‘মহামনন'।

শিকাগো~ আমেরিকার একটি জার্নালে এর উপর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।
'The only way of human development and peace' International Journal of Teacher Education and Teaching (Chicago, USA)
Volume 1 Issue 2 July 2021, Page No. 19.
https://ijtetchicago.com/previous-issues/

হোয়াটস অ্যাপ: 9733999674

## মহাবাদ (মহাইজম): প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির জন্য এ' সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ!

মহর্ষি মহামানসের বৈপ্লবিক মতবাদ ও জ্ঞানদর্শন যা মানবজীবন ও মহাজাগতিক জীবনের বহু সত্যকে প্রকাশ করেছে! মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার মূল কারণ ও সমাধান এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষির প্রজ্ঞা বাণীর মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মহর্ষি মহামানস যিনি প্রকৃত মানববিকাশ এবং বিশ্বশান্তির জন্য প্রায় সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। মহর্ষি মহামানসের যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক একালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ' এর সারকথা হলো :

"মানবসৃষ্ট অধিকাংশ সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট- দুর্দশার মূল কারণ হলো যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব এবং মানসিক অসুস্থতা। অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার এবং হিংসা-বিদ্বেষ-সন্ত্রাস এ' সবই তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।"

"সঠিক মনোবিকাশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যদি সারা বিশ্বে প্রবর্তিত করা হয় তবেই প্রকৃত মানববিকাশ ও শান্তি অর্জিত হতে পারে। এবং যদি সত্যিকারের মানববিকাশ ঘটে, তবেই বেশিরভাগ মানবকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান হবে।"

"তোমার একটি সচেতন মন আছে বলেই— তুমি মানুষ। তবে তোমার এই মনটি এখনও যথেষ্ট বিকশিত নয়। যথেষ্ট বিকশিত একজন মানুষ হয়ে উঠতে— তোমার এই মনটির বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। আর এটাই তোমার প্রাথমিক ও প্রধান ধর্ম।"

"তুমি একজন মানুষ রূপে জন্ম গ্রহন করেছ, তাই তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো— পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। জীবনের লক্ষ্যসহ— নিজেকে এবং এই জাগতিক ব্যবস্থাকে জানতে, সর্বদা সজাগ—সচেতন থাকতে চেষ্টা কর। নিজেকে প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন বিকশিত মানুষ ক'রে তুলতে উদ্যোগী হও।"

মানুষ কথাটার মধ্যে রয়েছে, মন ও হুঁশ। হুঁশ যুক্ত মন অর্থাৎ সচেতন মন। আমাদের মধ্যে রয়েছে দুটি সক্রিয় মন, সচেতন মন বা মানব চেতন মন, আর অবচেতন মন বা যুক্তি-বিচার বিহীন অন্ধ-আবেগ প্রবণ~ প্রাক মানব মন। এই সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটা অবধি আমরা অধিক অংশে অবচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকি। সচেতন মনের বিকাশ ঘটলে~ তবেই আমরা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠবো এবং সর্বোন্নত আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারবো।

এই উদ্দেশ্যে তিনি 'মহামনন' নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মনোবিকাশমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। তিনি 'মহাবাদ' এবং 'মহামনন'-এর উপর ভিত্তি করে প্রকৃত মানববিকাশ এবং বিশ্বশান্তির জন্য 'মহাধর্ম' নামে একটি নতুন ধর্মও গড়ে তোলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি মহামানস মানববিকাশ, মনোবিকাশ শিক্ষা ব্যবস্থা, যুক্তিবাদী আধ্যাত্মিকতা, যুক্তিবাদী আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক আধুনিক মনোবিজ্ঞান, এবং মহাসৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সহ মানব জীবনের অনেক অমীমাংসিত বিষয় তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করেছেন।

অনেকেই বলে থাকেন, কমিউনিজম তথা প্রচলিত বাম আন্দোলনই নাকি একমাত্র মুক্তির পথ। কিন্তু তা বাস্তব সত্য নয়। মানুষের মনোবিকাশ ঘটিয়ে, তাকে অজ্ঞানতা ও অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারবে যে পথ ও পদ্ধতি, সেই হলো একমাত্র মুক্তির উপায়।

প্রচলিত বা তথাকথিত বাম আন্দোলন নয়, আমরা চাই প্রকৃত বাম আন্দোলন প্রকৃত মানববিকাশের জন্য। নিম্নগামী স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা বা এগিয়ে চলাই হলো বামপন্থা। বামপন্থী হতে হলে যে তাকে কমিউনিষ্ট হতে হবে, এমন নয়।

মানুষের জ্ঞান ও চেতনার বৃদ্ধি ঘটাতে সঠিক মনোবিকাশ শিক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে, স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প চেতনা সম্পন্ন অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোকে অলীক মুক্তির জন্য খেপিয়ে তোলার বাম আন্দোলন কখনোই সফল হবে না।

প্রচলিত বাম আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালোভী শোষকশ্রেণীর মতোই শাসক
ও শোষক শ্রেণীর সুবিধাবাদী এক দল নেতা তৈরি করে থাকে। কারণ তাদেরও তো মনের বিকাশ ঘটেনি। ফলে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটে না। মানুষ যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই থেকে যায়। চেতনার স্বল্পতা ও অন্ধ বিশ্বাসের কারণে কিছু মানুষ এ কথার মর্মার্থ বুঝতে আজ অক্ষম হলেও আগামী দিনে ঠিকই বুঝতে পারবে।

প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলন ঘটাতে হলে, এ' যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ~ 'মহাবাদ' -এর পথ অবলম্বন করতেই হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।

সুমেরু রে ওরফে মহর্ষি মহামানস প্রকৃত মানব বিকাশের লক্ষ্যে প্রায় সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে, নিরলস গবেষণা এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি 'মহামনন' নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মনোবিকাশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন।
আপনি যদি এই সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হন, অনুগ্রহ করে একটি Google search করুন: Maharshi MahaManas, MahaManan, MahaDharma, Sumeru Ray

দৃঢ় বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাসই হলো মানব জগতের অধিকাংশ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা আমাদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করে না, শুধুমাত্র অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে শেখায়। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ এই অন্ধবিশ্বাসের পথে চলতে চলতে এতটাই অভ্যস্ত পড়েছে যে সে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম হয়ে পড়েছে। জ্ঞান অর্জন করতে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে তো আর কোনো পরিশ্রম করতে হয়না।

মনুষ্যকৃত অধিকাংশ জটিল সমস্যার মূলে রয়েছে চেতনার স্বল্পতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতা, এবং তজ্জনিত অন্ধত্ব, এছাড়া শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। যথেষ্ট চেতনার অভাব এবং স্বল্প-জ্ঞান বা অজ্ঞানতাই মানুষের অধিকাংশ দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, দারিদ্র্য এবং অধিকাংশ সমস্যার প্রধান কারণ।

মানবধর্মই মহাধর্ম। মানবধর্মই একমাত্র চিরন্তন ধর্ম। মানবধর্ম মানে শুধুই সৎ ও সহৃদয় সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠাই নয়, মানবধর্ম হলো মানুষের সহজ ধর্ম~ মৌলিক ধর্ম। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মবিকাশ লাভের ধর্ম। আমরা সেই মানবধর্মকে ভুলে গিয়ে, নানারূপ ধর্ম ও অধর্ম নিয়ে অজ্ঞান-অন্ধের মতো মোহাচ্ছন্ন হয়ে মেতে আছি।

যেমন জলের ধর্ম~ আগুনের ধর্ম, তেমনই মানুষের ক্ষেত্রে 'ধর্ম' হলো তার সহজ আচরণ বা স্বভাবধর্ম। মানুষ তার স্বভাবধর্ম~ সহজ আচরণের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রমশ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও চেতনা লাভের মধ্য দিয়ে~ মনোবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে~ একসময় মানবত্ব লাভ করে থাকে। পূর্ণবিকশিত মনের মানুষ হয়ে ওঠে। মানব-মনের বিকাশ-পথ ধরে এগিয়ে চলাই হলো~ মানবধর্ম।

আমরা আমাদের স্বধর্ম~ মানবধর্ম বিস্মৃত হয়ে নিম্নগামী স্রোতে ভেসে চলেছি বলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা। সেই মানবধর্মকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতেই আবির্ভূত হয়েছে 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক একটি যুগান্তকারী ধর্ম।

আরোপিত ধর্মের ক্ষেত্রে~ যাকে ধারণ করে মানুষ ভালভাবে বাঁচতে পারে এবং দ্রুত বিকাশলাভ করতে পারে, তা-ই হলো ধর্ম। অলৌকিকতার পিছনে অথবা মিথ্যা প্রলোভনের পিছনে ছোটাছুটি করা ধর্ম নয়~ অধর্ম।

"তুমি অধিকাংশ সময়েই যুক্তি-বিচার বিহীন অন্ধ আবেগপ্রবণ বেহিসাবি দেহগত মন~ অবচেতন মনের দ্বারা চালিত হয়ে চলেছো বলেই তোমার এতো দুঃখ কষ্ট দুর্দশা। নিজের মনকে জানতে পারলে এবং তার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারলেই তোমার সচেতন মনের বিকাশ ঘটাতে থাকবে। সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেই তোমার দুঃখের কাল শেষ হবে।"

ব্যক্তি এককের মনোবিকাশের মধ্য দিয়েই দেশের এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশ সম্ভব। একমাত্র সার্বজনীনভাবে মানুষের প্রকৃত মনোবিকাশের উদ্দেশ্যে~ সঠিক মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে পারলে, তবেই দেশ তথা মানবজাতির বিকাশ সম্ভব হবে।

দারিদ্রতার মূল কারণ হলো অন্ধত্ব, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং দাস মনোভাব যা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সাথে জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে ঘটে থাকে।

যথেষ্ট চেতনার অভাবেই মানুষের এতো সমস্যা, দুঃখ কষ্ট দুর্দশা। আর এই চেতনা বিকাশের পরিপন্থী হলো ধর্ম, রাজতন্ত্র (বর্তমানে রাজনীতি), ও বৈশ্যতন্ত্র বা ট্রেড সিস্টেম (কর্পোরেট)। এরা নিজেদের স্বার্থে কখনোই চায়না~ মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটুক। বরং এরা মানুষকে অজ্ঞান অন্ধ মুর্খ বানিয়ে রাখতেই সদা তৎপর।

তুমি একজন মানুষ রূপে জন্ম গ্রহন করেছো, তাই তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো~ পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। নিজেকে এবং এই জাগতিক ব্যবস্থাকে জানতে এবং প্রকৃত বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে, সর্বদা সজাগ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়াই তোমার মূল ধর্ম। অজ্ঞান-অন্ধের মতো অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কাল্পনিক কোনো দেবতা বা ঈশ্বরের কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনোকিছুর পিছনে ছুটে চলা মানুষের ধর্ম নয়।

আমরা এক শিক্ষামূলক ভ্রমনে~ খুব অল্প সময়ের জন্য এখানে এসেছি। ক্রমশ উচ্চ থেকে আরো উচ্চ চেতনা লাভই এই মানব জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এখানে আমরা জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে যত বেশি চেতনা-সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবো, তত বেশি লাভবান হবো। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে~ এখান থেকে চলে যাবার সময় কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবেনা, একমাত্র চেতনা ব্যতীত।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে সাথেই 'ভাগ্য' ও 'সময়' অস্তিত্ব দুটি একই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে, এবং এরা উভয়েই জাগতিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। 'মহাকাশ' অস্তিত্বেরও জন্ম হয়েছে ওদের সঙ্গেই। আমাদের জীবনে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

'ভাগ্য' হলো মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতেই স্বয়ংসৃষ্ট এক অনৈচ্ছিক ভবিষ্যত নির্ধারক স্বয়ংক্রিয় জাগতিক ব্যবস্থা। বিস্ফোরণের মূহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে যায়~ ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে কখন~ কোথায়~ কি~ ঘটবে।

'সময়' হলো একের পর এক ঘটে চলা (পরিবর্তন সূচক) ক্রিয়া বা ঘটনাগুলির মধ্যেকার দূরত্ব বা অবকাশ বা দৈর্ঘ্যের পরিমাপ স্বরূপ একটি বিশেষ অস্তিত্ব। গতি বা ক্রিয়া থেকেই সময়ের জন্ম হয়। যেখানে ক্রিয়া বা গতি নেই, সেখানে 'সময়'-ও নেই। সময় অস্তিত্বটি গতি বা ক্রিয়ার সাথে প্রায় একাকার হয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। তাই সময় একটি গতিশীল অস্তিত্ব।

সমগ্র মহাবিশ্ব অস্তিত্বই হলো আমাদের স্রষ্টা বা প্রকৃত ঈশ্বর। এই বিশ্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে একটি মন, সে-ই হলো ঈশ্বর মন বা কসমিক মাইন্ড। এই মহাজগতে বিশ্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমরা তথা সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের অংশ। আমরা নিজেকে সঠিকভাবে জানতে পারলে তবেই ঈশ্বরকে জানতে পারবো তার স্বরূপে। তথাকথিত কাল্পনিক ঈশ্বরের পিছনে ছুটে চলা মনুষ্যোচিত কর্ম বা ধর্ম নয়।

'মহাবাদ' উক্ত মহা সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে~
'নিজেকে হারিয়ে~ পুনরায় খোঁজা' এটাই হলো মহা সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত কথা।

আমরা যাকিছু করি, সবকিছুই জাগতিক ব্যবস্থা বা ভাগ্য দ্বারা করিত হই বা করতে বাধ্য হই। তাই আমাদের কর্ম ও কর্মফলের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে কোনভাবেই দায়ী নই। ঈশ্বর~ সেও অনেকাংশে ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। বলা যায়, ভাগ্য ঈশ্বরের থেকেও বলবান।

আমাদের শরীর ও মনের অভ্যন্তরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটতে থাকা অনৈচ্ছিক কার্যকলাপ বা ঘটনাগুলি যেমন, বিশ্বরূপ ঈশ্বর শরীর ও মনের মধ্যে ঘটে চলা অধিকাংশ কর্মকাণ্ডগুলি ঠিক তেমনই। আমরা তথা সমস্ত জীব~ ঈশ্বর উপাদানে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হলেও, আমাদের অস্তিত্ব আসলে ভাগ্যের অবদান।

"আমরা সবাই একই পথের পথিক, ক্রমবিকাশমান চেতনার পথে। পথ একটাই কেউ এগিয়ে আছে আর কেউ পিছিয়ে আছে। অস্ফুট চেতন-স্তর থেকে পূর্ণ চেতনার লক্ষ্যে এগিয়ে চলাই হলো মানবজীবন তথা মহাজাগতিক জীবনের অন্তিম লক্ষ্য।"

মানবধর্মই 'মহাধর্ম'। বিমূর্ত মানবধর্মের মূর্ত রূপই হলো 'মহাধর্ম'। মানবধর্মই একমাত্র চিরন্তন ধর্ম।

যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও দর্শন~ মহাবাদ, মানববিকাশ মূলক ধর্ম~ মহাধর্ম, মনোবিকাশ মূলক শিক্ষাক্রম~ মহামনন, এবং মহর্ষি মহামানস সম্পর্কে আরও জানতে, গুগল সার্চ করুন।

'মহাবাদ' এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য  অংশ হলো, মানবধর্ম, মানবধর্ম ভিত্তিক মানববিকাশ মূলক ধর্ম, যুক্তিসম্মত অধ্যাত্মবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা, এছাড়া কিছু অমিমাংশিত বা বিতর্কিত বিষয়ের উপর আলোকপাত। যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক মতবাদ~ মহাবাদ এর শেষ কথা হলো, 'মহাবাদ কখনোই শেষ কথা বলেনা।' চেতনার ক্রমবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। মাঝপথে থেকে সম্পূর্ণ পথের জ্ঞান অসম্ভব।

জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন~ স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন কর্তা স্বরূপ একটা অহং চেতন সত্তা রূপে বোধ করে থাকি বা গণ্য করে থাকি। যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের এই অস্তিত্ব, আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, আচরণ ও কার্যকলাপ সমস্তই বহু কিছুর উপর নির্ভরশীল এবং বহু কিছুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে চলেছে।

মানবকেন্দ্রিক যাবতীয় সমস্যার শুরু হয়েছে এখান থেকেই। সমস্যার মূল কারণ আমরা দেখতে পাই না। সমস্যার মূলে কি আছে, তার খোঁজ করি না। আমরা অজ্ঞান-অন্ধের মতোই তার শাখা-প্রশাখাতেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াই।

একটা ঘটনা থেকে জন্ম নেয় বহু ঘটনা। সেইসব ঘটনাগুলো থেকে সৃষ্টি হয় আরো অনেক ঘটনা। আবার সেই ঘটনাগুলি থেকে জন্ম নেয় অজস্র ঘটনাবলী। এইরূপে পরম্পরাগত ভাবে অসংখ্য ঘটনার সৃষ্টি হয়ে চলেছে অবিরত। আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব সেই পরম্পরাগত ঘটনাপ্রবাহেরই ফসল। শুধু তাই নয়, আমরা এবং আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ জগতব্যাপী ঘটনা প্রবাহের অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের অবুঝ মন তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

আমরা মোটেও কোনো স্বাধীন~ স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন সত্তা নই। আমাদের অস্তিত্বসহ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ~ স্বয়ংক্রিয় জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ রূপ জাগতিক ব্যবস্থার অধীন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞন-অন্ধ অহংবোধ সম্পন্ন মন তা মানতে চায় না।

এই মহাজগৎ সৃষ্টির শুরুর সেই আদি ঘটনা থেকেই সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি হয়েছে এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এখানে যা কিছু ঘটেছে~ ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে~ সমস্তকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে সৃষ্টির শুরুর মূহুর্তে সেই আদি ঘটনার মাধ্যমেই। পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় এই ঘটনাবলীকেই আমরা নিয়তি বা ভাগ্য নামে অভিহিত করে থাকি।

অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত এবং অনেকটাই চেতনা সম্পন্ন মানুষ এই মূল তত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং অজ্ঞানতা জনিত অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে আরো বেশি করে সত্য উপলব্ধী করার জন্য এবং আরও ভালো জীবন লাভের জন্য আত্মবিকাশ লাভে প্রয়াসী হবে।

# মহামনন

ধ্যান-যোগ শিক্ষাক্রম

মহর্ষি মহামানস নির্দেশিত পথে আত্মবিকাশ মূলক আত্ম-ধ্যান-যোগ এর ধারাবাহিক শিক্ষাক্রম।

ধ্যান প্রশিক্ষণ ছাড়াও যেসমস্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে:

- ধ্যান আসলে কী?
- ধ্যান কিভাবে করবো?
- ধ্যান করবো কেন?
- নিয়মিতভাবে ধ্যান অভ্যাস করে কি জীবনে শুভ পরিবর্তন আনা সম্ভব?
- ধ্যান কি শুধুই সাধু-সন্তদের জন্য?
- সাধারণ মানুষের পক্ষে ধ্যানের গভীরে ডুবে যাওয়া কি সম্ভব?
- সবচাইতে সহজ ধ্যান পদ্ধতি কোনটি?
- আত্ম-ধ্যান কেন সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ধ্যান পদ্ধতি?
- মন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন না করে, ধ্যান করা কি উচিত?
- মন সম্পর্কে কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে?
- যোগের রাজা রাজযোগ-ই কি ধ্যান-যোগ?

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পর্ব

মহর্ষি মহামানস নির্দেশিত পথে সহজ-সরল এবং অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতিতে যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক দুর্লভ ধ্যান প্রশিক্ষণ ।

নিয়মিতভাবে 'মহামনন' ধ্যান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ তথা মনোবিকাশ সহ অনাবিল প্রশান্তি লাভ করুন।

মহামনন ধ্যান-যোগ সাধনার মাধ্যমে সাধকের মন স্ববোধে স্থিত হয়ে এক অভূতপূর্ব প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করে থাকে। ক্রমশ সাধকের জীবন হয়ে ওঠে সুখময়~ শান্তিময়~ আনন্দময়। 'মন' তার ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ভাব এবং মানসিক দূষণ~ উদ্বেগ~ উৎকন্ঠা~ অবসাদ, স্ট্রেস টেনশন, ডিপ্রেশন প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে আত্মোপলব্ধি আত্মজ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে ক্রমশ হয়ে ওঠে দিব্য জ্ঞান-আলোকময়!

ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি 'মহামনন' শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা তাদের পরীক্ষার রেজাল্ট আরও ভালো করতে সক্ষম হবে। এছাড়া, তাদের আচরণেও ক্রমশ শুভ পরিবর্তন আসবে।

কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কলকাতায় অথবা কোনো বড় শহরে, বড় আকারে মহামনন মেডিটেশন ক্যাম্প এর আয়োজন করতে আগ্রহী হলে, যোগাযোগ করুন। আট দিনের কোর্স এবং চার দিনের সংক্ষিপ্ত কোর্স।

ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, ধ্যানের গভীরে ডুব দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। অনেকবার ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়।

সেই অতি কঠিন কাজটিকে আমাদের জন্য সহজ করে তুলেছেন মহর্ষি মহামানস তাঁর অপূর্ব ধ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে।

প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী, কোনো মন্ত্র জপের মাধ্যমে গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে যাওয়া, অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। 'মহামনন' ধ্যানে ওই রকম কোনো চালু পদ্ধতি নেই। ধ্যান মানে শুধু চোখ বুঁজে বসে থাকা নয়। অথবা কোনো স্মৃতি অথবা কোনোকিছুর কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকাই নয়। ধ্যানের অনেক গভীরে ডুবতে হবে। ধ্যানের তন্ময়তা যত গভীর হবে, ততবেশি সাফল্য লাভ করতে পারবে ধ্যানী ব্যক্তি।

মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হোন। সুস্থ থাকুন। চরম সঙ্কটপূর্ণ এই অস্থির সময়ে রং ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ~ দুঃশ্চিন্তা, মনোকষ্ট, অসন্তোষ, অশান্তি, অসুখীভাব থেকে বহু কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিয়মিতভাবে 'মহামনন' মেডিটেশন অভ্যাস কোরে মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকুন।

মহর্ষি মহামানস এর মহা-আত্মবিকাশ-যোগ শিক্ষাক্রম এর অন্তর্গত 'মহামনন' ধ্যান-যোগ সাধনার মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ এবং অনাবিল প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করুন। লাভ করুন 'মেন্টাল ফিটনেস'।

সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান পদ্ধতি~ মহামনন ধ্যান যোগ শিখে জীবনে আমূল শুভ পরিবর্তন নিয়ে আসুন।

## মহামনন: মহা আত্মবিকাশ ধ্যান-যোগ শিক্ষাক্রম।

সজাগ সচেতন বিকাশমান মানুষ মাত্রই প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা লাভের জন্য যারপরনাই আগ্রহী হয়ে থাকেন। মানব জীবনে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা এক অমূল্য সম্পদ। তার সঙ্গে যদি থাকে সুস্থতা, তাহলে তো সে এক মহা ভাগ্যবান মানুষ। দুর্লভ অথচ সহজ ও সরল এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ কোরে জীবনে নিয়ে আসুন এক অভূতপূর্ব শুভ পরিবর্তন।

'মহামনন' ধ্যান সাধনার দ্বারা সাধকের মন স্ববোধে স্থিত হয়ে~ এক অনাবিল প্রশান্তি লাভ কোরে থাকে। সাধকের জীবন হয়ে ওঠে সুখ ও শান্তিময় আনন্দময়। তার মন সমস্ত রকমের ঋণাত্মক ভাব ও মানসিক দূষণ~ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে। ক্রমে মোহ-মায়া, ভ্রান্ত-দৃষ্টি, অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞান-অন্ধত্ব ও মিথ্যার আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে, সাধক সত্যনিষ্ঠ হয়ে~ আত্মশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধি লাভের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে দিব্য আলোকময়!

মহামনন~ মহা আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষাক্রম।

মহামনন পূর্নাঙ্গ আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষাক্রমের একটি অংশ হলো এই 'মহামনন ধ্যান সাধনা। তাই, মহামনন আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

মহর্ষি মহামানস নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পথে সহজ-সরল অপূর্ব এই শিক্ষা অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জীবনে নিয়ে আসুন এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর শুভ পরিবর্তন। আপনার জীবন আরও সুন্দর ও আরও বিকশিত হয়ে উঠুক।

মহা-আত্মবিকাশের জন্য মনন-ই হলো~ 'মহামনন'। প্রকৃত আত্মবিকাশ লাভের এক অতুলনীয় শিক্ষাক্রম-ই হলো~'মহামনন'। ভিত্তিমূল আধ্যাত্মিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে অতি উচ্চস্তরের 'মহা আত্মবিকাশ যোগ' শিক্ষাক্রমই হলো~'মহামনন'।

যার মধ্য দিয়ে ক্রমশই বহু সত্য~ বহু অভাবনীয় তথ্য ও তত্ত্ব আপনার সামনে উদ্ঘাটিত হবে, আস্তে আস্তে এক সুস্থ-সমৃদ্ধশালী নতুন মানুষ জন্ম নেবে আপনার মধ্যে, এবং ক্রমশ বিকাশলাভ করতে থাকবে~ করতেই

থাকবে। সুস্থতা ছাড়া আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। তাই, এই শিক্ষাক্রমের অঙ্গ হিসাবে আপনি এখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা প্রাকৃতিক ও যোগ চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

নিজেকে জানা~ নিজের শরীর ও মনকে জানা, নিজের চারিপাশ সহ মানুষকে চেনা, নিজের প্রকৃত অবস্থান সহ জগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ, নিজের উপর নিয়ন্ত্রন লাভ, জগতকে আরো বেশি উপভোগ করার জন্য নিজেকে যোগ্য~ সমর্থ কোরে তোলা~ এই রকম আরো অনেক বিষয় নিয়েই এই শিক্ষাক্রম।

নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা ও অনুশীলন করতে থাকলে~ আস্তে আস্তে আপনার ভিতরে এক উন্নত~ বিকশিত নতুন মানুষ জন্ম নেবে। যা দেখে আর সবার মতো আপনিও বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে অপার আনন্দের আধার হয়ে উঠবেন আপনি। আপনার চারিপাশে থাকা অন্যান্য সবাই এই আনন্দের সংস্পর্শে এসে তারাও আনন্দ লাভ করবে!

ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের প্রচলিত শিক্ষা গ্রহনের পাশাপাশি এই আত্মবিকাশ শিক্ষা গ্রহনের দ্বারা তাদের পরীক্ষার ফল আরো ভালো করতে সক্ষম হবে। এছাড়া তাদের আচরণেও শুভ পরিবর্তন দেখা যাবে।

মহামনন' শিক্ষার্থীদের একটা নেশাই থাকবে, তা হলো ধ্যানের নেশা।

আমরা এখানে এসেছি~ এক শিক্ষামূলক ভ্রমনে। ক্রমশ উচ্চ থেকে আরো উচ্চ চেতনা লাভই~ এই মানব জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এখানে আমরা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে যত বেশি চেতনা-সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবো, তত বেশি লাভবান হবো। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এখান হতে চলে যাবার সময় কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবেনা, একমাত্র চেতনা ব্যতীত। ~ মহর্ষি মহামানস

কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কলকাতায় অথবা কোনো বড় শহরে, বড় আকারে মহামনন মেডিটেশন ক্যাম্প এর আয়োজন করতে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন।

কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কলকাতায় অথবা কোনো বড় শহরে, বড় আকারে মহামনন মেডিটেশন ক্যাম্প এর আয়োজন করতে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন।

মহামনন ধ্যান প্রশিক্ষণ শিবির বা ফ্রী মেডিটেশন ক্যাম্প এর আয়োজকদের প্রতি জ্ঞাতব্য:

আবশ্যক বিষয়াদি~

১) যথেষ্ট আলো-বাতাস যুক্ত বড় হল বা অডিটোরিয়াম অথবা  ফ্ল্যাট হল প্রয়োজন।

২) সাউন্ড সিস্টেম প্রয়োজন।

৩) মাইকিং, ফ্লেক্স-ব্যানার, লিফলেট, গেট প্রভৃতি সহ ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

৪) ম্যানেজমেন্ট। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন আয়োজক সংস্থা।

৫) ধ্যান-শিক্ষকের বসার জন্য:
বড় জলচৌকি বা প্লাটফর্ম বা সিঙ্গেল বেড সহ তোষক, অথবা সুদৃশ্য আরামদায়ক চেয়ার লাগবে।

৬) আয়োজক সংস্থা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে প্রবেশপত্র বা গেট-পাশ কার্ড দেবেন, যাতে সেই সংস্থার নাম, লোগো অথবা বিজ্ঞাপন থাকতে পারে।

প্রচারে আয়োজক হিসাবে ব্যক্তি বা সংস্থার নাম দেওয়া যাবে। আয়োজক ইচ্ছা করলে, কয়েকজন স্পন্সর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে, স্পন্সর হিসাবে তাদেরও নাম থাকতে পারে।

মহামনন ধ্যান শিক্ষার্থীদের প্রতি জ্ঞাতব্য:

শরীর ও মন উভয় দিক থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং 'মহামনন'-এর ঐকান্তিক চাহিদা নিয়ে মহামনন শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। কোনো কাজের তাড়া নিয়ে, অর্থাৎ কোনোরূপ বহির্মুখীতা নিয়ে এখানে আসা যাবে না। শিক্ষা গ্রহণের জন্য মনস্থির করার পর, সমস্ত প্রকারের নেশা, নেশাজাতীয় দ্রব্য, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, আড্ডা এবং বাজে অভ্যাস ও প্রবৃত্তিসহ বিভিন্ন বহির্মুখীতা থেকে মুক্ত হতে হবে। এটাই হলো প্রাক প্রস্তুতি। অধৈর্য, অস্থিরতা, উত্তেজনা থেকে মুক্ত হয়ে, যথাসম্ভব মৌনতা অবলম্বন কোরে, মনকে স্বতঃস্ফূর্ত মানব-প্রেম-ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলতে হবে। ধ্যানের জন্য ভিতরে ভিতরে তৈরি করতে হবে নিজেকে।

তারপর, ধাপে ধাপে, প্রাণযোগ~ সুষুপ্তিযোগ, মন-আমি যোগের আত্ম-নিরীক্ষার পথ ধরে, 'মহামনন' যোগে~ বিশ্ব-মানব-প্রেমে আপ্লুত হয়ে, অনাবিল সুখানুভূতি ও সন্তুষ্টি নিয়ে স্ববোধে স্থিত হতে হয়।

এই ধ্যান শিক্ষা ও অনুশীলনে কোনো প্রবেশ মূল্য নেই। তবে, প্রত্যেকের নিকট আবেদন, এই শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ খরচ এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বমানের একটি আদর্শ 'মহামনন কেন্দ্র' গড়ে তোলার জন্য সবাই নিজেদের সাধ্যমতো দান করবেন।

এখানে প্রশিক্ষিত হওয়ার পরে, নিজের নিজের বাসস্থানে নিয়মিত অনুশীলন কোরে যেতে হবে। তবেই ভালো ফল পাওয়া যাবে।

এই শিক্ষাক্রম ৮ দিনের কোর্স, এবং ৪ দিনের সংক্ষিপ্ত কোর্স।

শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পূর্বে শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। প্রথম দিন আধঘন্টা পূর্বে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য। দেরি করে এলে, ক্লাসে প্রবেশ করা যাবে না। এই ধ্যান শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা চলাকালীন কখনো কোনোদিন অনুপস্থিত হওয়া যাবেনা। অনুপস্থিত থাকলে, তাকে আর পুনঃপ্রবেশর সুযোগ দেওয়া হবেনা। আবেদন পত্রের সঙ্গে মোবাইল নম্বর এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিতে হবে।

এখানে প্রচলিত ধর্ম, রাজনীতি, আধ্যাত্মিক অথবা অন্য কোনো বিষয় নিয়েই আলোচনা হবেনা, কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। যথাসম্ভব নিরবতা বজায় রেখে শিক্ষা গ্রহণ করাই শিক্ষার্থীদের একমাত্র কর্তব্য। বিশেষ কোনো প্রশ্ন থাকলে, কাগজে লিখে জানাতে হবে।

নিয়ম বহির্ভূত আচরণের জন্য যেকোনো শিক্ষার্থীকে এই ধ্যান শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে। শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো অথবা বিরক্ত করা এবং অযথা কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কোনো যোগ্য ও আগ্রহী ব্যক্তি যেকোনও ভাষায় এই ধ্যান শেখাতে~ ধ্যান শিক্ষক হতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন।

এখানে এই ধ্যান শিক্ষার ভাষা মাধ্যম হলো বাংলা।

মহামনন ধ্যান শিক্ষার জন্য, শিক্ষার্থীদের যা যা থাকা আবশ্যক:

ঐকান্তিক আগ্রহ, ইচ্ছা ও নিষ্ঠা। এবং এক আসনে অনেকক্ষণ সুস্থির হয়ে বসে থাকার ক্ষমতা।

প্রয়োজন~ ঢিলেঢালা পোষাক। নিজস্ব বেডসিট বা যোগা-ম্যাট এবং জলের পাত্র বা জলের বোতল। লাগবে কাগজ, খাতা-কলম। ওয়েবসাইটের ব্লগ এর মধ্যে দুটি গান আছে। গানদুটি খাতায় লিখে নিন। শিক্ষার্থীকে ওয়েবসাইটে উল্লেখিত সমস্ত বিষয়গুলি, ব্লগ সহ সমস্ত আর্টিকেলগুলি ভালোভাবে পড়তে হবে, এবং ই-বুক পড়তে হবে। ই-বুক-এর লিঙ্ক-এ ক্লিক করে ই-বুক পড়ুন।

দূষণ মুক্ত নির্মল পরিচ্ছন্ন স্থানই ধ্যান অভ্যাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। সেখানে ধ্যানে বিঘ্নকর কিছু থাকবেনা। ধ্যানে বসার পূর্বে হাত-পা ধুয়ে, চোখ-মুখ ও ঘাড়ে জলের ঝাপটা দিয়ে, ধুয়ে মুছে, ধ্যানে বসতে হয়।

নিষেধ: শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কাউকে শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। কুড়ি বছরের কম বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবক থাকতে হবে, এবং অভিভাবকদেরকেও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী হতে হবে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মোবাইল ফোন রাখা নিষেধ।

শিক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে কোনোরকম আলাপ-আলোচনা, কথা বলা নিষেধ। নিস্তব্ধতা ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে, ক্লাস শুরু হওয়ার পরে, লিখিতভাবে একটি প্রশ্ন করা যাবে। অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবেনা। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো সময় না থাকলে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রশ্ন-উত্তর দেওয়া হতে পারে।

এডমিশন বা ভর্তির জন্য সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে। একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ আবেদন পত্রের সঙ্গে আইডি প্রুফ, যথা ভোটার কার্ড/ আধার কার্ড -এর জেরক্স কপিসহ আবেদন করতে হবে। সঙ্গে অরিজিনাল আইডি প্রুফও আনতে হবে। আসন সংখ্যা অতি সীমিত।

ক্লাসে তথ্য ও তত্ব সম্পর্কীত আলোচনার পরে প্র্যাকটিক্যাল  অনুশীলন পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষণীয় বিষয়ের অনুশীলন সূচী:

প্রথম ধাপ:
১. প্রাথমিক কর্তব্য-কর্ম।
২. প্রাণযোগ অনুশীলন।
৩. সুষুপ্তি যোগ।
৪. সঙ্গীত সহযোগে ধ্যান
৫. দশ মিনিট সম্পূর্ণ মৌনতা। মুখে ও মনে সম্পূর্ণতঃ মৌনতা অবলম্বন। মনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

দ্বিতীয় ধাপ:
১. প্রাণযোগ অনুশীলন।
২. সুষুপ্তি-যোগ অনুশীলন।
৩. ধ্যান-যোগে রোগ-আরোগ্য পদ্ধতি।
৪. প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি।
৫. দশ মিনিট সম্পূর্ণ মৌনতা। মুখে ও মনে সম্পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন। মনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

তৃতীয় ধাপ:
১. 'মন-আমি যোগ। সচেতন ও অবচেতন মনের যোগ অনুশীলন। অডিও সাজেশন শোনার পর, নির্দেশ মতো মনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে মনের চিন্তা~ কল্পনা~ স্মৃতিচারণের প্রতি লক্ষ্য করা।
২. কিভাবে কষ্টদায়ক স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলা যায়।
৩. দশ মিনিট সম্পূর্ণ মৌনতা। মুখে ও মনে সম্পূর্ণতঃ মৌনতা অবলম্বন।

চতুর্থ ধাপ:
'মহামনন আত্মধ্যান অনুশীলন। এর মধ্যেও রয়েছে কয়েকটি ধাপ বা পরপর্ব।

শুরু হচ্ছে~ মহর্ষি মহামানস নির্দেশিত পথে~ মহা আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত 'মহামনন' আত্মধ্যান বা আধ্যাত্মিক ধ্যান প্রশিক্ষণ।

মহামনন ধ্যান হলো~ আত্মবিকাশ অর্থাৎ সচেতন মনের বিকাশের জন্য আত্মধ্যান।

আত্ম-ধ্যান হলো 'আমি'-র ধ্যান। এই 'আমি'-টা কে, কোথায় তার অবস্থান জানতে হবে। যাকে জানলে প্রায় সব জানা হয়, সেই 'আমি'-কে অর্থাৎ নিজেকে জানতে হবে আমাদের। আত্মজ্ঞান হলো এই 'আমি'-র জ্ঞান। 'আমি'-কে দেখা যায়না, উপলব্ধি করা যায়। নিজেকে অর্থাৎ 'আমি'-কে যত বেশি জানা যাবে, ঈশ্বর তথা এই মহাবিশ্ব জগতের রহস্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'আমি'-কে অর্থাৎ নিজেকে জানার উদ্দেশ্যেই এই সৃষ্টি লীলা (মহর্ষি মহামানসের মহান সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য) শুরু হয়েছে। 'আমি'-কে পুরোপুরি জানা হলে, তবেই ঘটবে মোক্ষ লাভ। সৃষ্টির অবসান ঘটবে তখন।

অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা আছে, তারা মনে করে, ধ্যান চর্চা শুধুমাত্র সাধু-সন্ন্যাসী-তপস্বীদের জন্য।'ধ্যান' অভ্যাস যে প্রতিটি মানুষের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়, তারা তা' জানেনা। 'ধ্যান' হলো আমাদের সবচাইতে বড় ঔষধ। ইদানীং, সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও 'যোগ' চর্চা শুরু হয়েছে। যোগের উপকারীতা অনেকেই আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে। এই 'যোগ' প্রক্রিয়াকে বলা হয়, 'হঠ যোগ'। 'যোগ'-এর রাজা হলো 'ধ্যান'। যাকে বলাহয়-- 'রাজ-যোগ'। আজকের দিনে, ভালোভাবে জীবনযাপন করতে হলে, সুষ্ঠুভাবে বিকাশলাভ করতে হলে, 'ধ্যান' ছাড়া আমাদের গতি নেই।

মন শান্ত থাকা অথবা মনকে শান্ত রাখা শুধুমাত্র মনের উপর নির্ভর করেনা। শরীরের মধ্যে প্রদাহ ও উত্তেজনা (ইরিটেশন, ইনফ্লেমেশন, এক্সাইটমেন্ট) হতে থাকলে, তার প্রভাবে মনও অশান্ত হয়ে ওঠে।

গভীর ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা--
যথেষ্ট আগ্রহ, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা, আস্থা, অনুভূতি প্রবণতা বা সংবেদনশীলতা, শিথিল হওয়ার সক্ষমতা বা রিল্যাক্সিবিলিটি, মেরুদন্ডসহ স্নায়ুমন্ডলের নমনীয়তা এবং প্রয়োজনীয় সুস্থতা থাকা প্রয়োজন।

আত্মবিকাশ! আত্ম-চেতনার বিকাশ, আত্মশক্তি আত্ম-সম্পদ, আত্ম-জ্ঞানের বিকাশ! গভীর আত্ম-সাগরের নিস্তরঙ্গ শান্তির বিকাশ।

আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ আত্মবিকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন নানা কাজের ফাঁকে, মাঝে মাঝেই চলতে থাকে আত্মচিন্তন~ আত্মজিজ্ঞাসা~ আত্মানুসন্ধান~ আত্মবিশ্লেষণ প্রভৃতি। আর এই নিয়েই হলো আধ্যাত্মিকতা।

ক্রমশ আরো পথ পেরিয়ে, পরোক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে~ যথেষ্ট চেতনা বৃদ্ধি পেলে, আত্মবিকাশ লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। সে তখন পথ এবং পথপ্রদর্শক খুঁজে ফেরে। কোন পথে~ কি পদ্ধতিতে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, কার কাছে গেলে পাওয়া যায় সঠিক পথ ও সহজ পদ্ধতির সন্ধান, প্রায়শই এই চিন্তায় মগ্ন থাকে সে তখন।

আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান~ বাস্তবে সবকিছু থাকা সত্বেও মনে শান্তি নেই, এরকম মানুষের সংখ্যা আজ ক্রমশই বেড়ে চলছে। অযথা~ অনিয়ন্ত্রিত চাহিদার কারণেও বহু মানুষ হতাশ ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে যারপরনাই অশান্তি ভোগ করছে।

'মহামনন' শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা সাময়িকভাবে লাভবান হবার পর, স্থায়ীভাবে লাভবান হবার জন্য এখানে শিক্ষা গ্রহণ অনুশীলনের পরেও নিজের নিজের আবাসস্থলে নিয়মিতভাবে বিধি-নিয়ম মেনে 'মহামনন' অনুশীলন করে যেতে হবে। প্রয়োজনে, বাড়ির অন্যান্য সদস্যদেরকে সঙ্গে নিয়েও প্রতিদিন 'মহামনন' অভ্যাস করলে~ গৃহে শান্তি বজায় থাকবে।

আত্মবিকাশের সহায়ক যোগ পদ্ধতি গুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগ হলো 'মহামনন' যোগ। ধ্যেয় এবং ধ্যানী সেখানে এক~ অভিন্ন। অর্থাৎ আত্ম-ধ্যান বা অধ্যাত্ম-ধ্যান। 'মহামনন' ধ্যান প্রচলিত কোনো ধর্মীয় ধ্যান নয়।

ধ্যান করতে গিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়ে। মনের বিশৃঙ্খলা অবস্থার কারণে, সফল হতে না পেরে, ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অনেকেই। সরাসরি ধ্যানের গভীরে পৌঁছানো সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই ধানের প্রস্তুতির জন্য অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হয় আরো কিছু সাধন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া গুলোও আত্মবিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে জানতে হয় এবং উপলব্ধি করতে হয়~ মনের তথা চেতনার বিভিন্ন স্তরগুলিকে। এর মধ্য দিয়ে সেই সঙ্গে মানসিক এবং মনোদৈহিক সুস্থতাও লাভ হয়ে থাকে অনেকটাই।

তবে তার আগে জানতে হবে ধ্যান কী, ধ্যান কিভাবে ঘটে, তারপর ধ্যান কেন করবো, কিভাবে করবো। পরবর্তীতে 'ধ্যান' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবু বলি, সাধারণভাবে কোনো জাগতিক বা বহির্জাগতিক বিষয়বস্তুতে, অথবা ঐরূপ কোন বিষয়বস্তুর স্মৃতিতে~ একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ কোরে, পুনঃ পুনঃ ওই একই বিষয় বা বস্তুর চিন্তনের মধ্য দিয়ে~ বিষয়বস্তুর মধ্যে নিহিত সত্য, যেমন রূপ~ গুণ~ শক্তি~ উপাদান প্রভৃতি অন্তর্নিহীত তত্ব ও তথ্য  উদঘাটন প্রক্রিয়াকেই অনেকে ধ্যান বলে থাকে।

মনকে শান্ত~ স্থির~ একাগ্র করার উদ্দেশ্যেও অনেকে অনুরূপ ধ্যান কোরে থাকে। জাগতিক বা বহির্জাগতিক কোনো কিছুকে মনে ধারণ কোরে, তাতে একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করাকে 'ধ্যান-ধারণা'ও বলে অনেকে। আবার বস্তু নিরপেক্ষ ধ্যান বা শূণ্য ধ্যানও করে কেউ কেউ।

'মহামনন' যোগ অর্থাৎ আত্ম-ধ্যানের বিষয়~ ধ্যানী নিজেই। যাকে জানতে পারলে সব জানা হয়, যার মধ্যে বিকাশের অপেক্ষায় নিহিত আছে অতুল শক্তি~ মহাজ্ঞান~ মহাচেতনা, সেই 'আমি' বা অন্তরামি ও তার কেন্দ্রই হলো মহামনন ধ্যান-যোগের লক্ষ্য। আর শান্তি! সে তো মোহ-মায়ারূপ জাগতিক বিষয় বস্তু এবং তার প্রতি আকর্ষণ বশতঃ সৃষ্ট হওয়া জাগতিক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে, আত্ম-সাগরের গভীরে ডুব দিলেই মিলবে অপরিমেয়~ অনাবিল শান্তি।

তবে, কে আত্ম-সাগরের কত গভীরে নামতে পারবে, কার কত দম-সামর্থ, কে কতটা রত্ন তুলে আনতে পারবে সেখানে থেকে, সাগর কাকে কতটা উজাড় করে দেবে তার ধন-সম্পদের ভাণ্ডার, তা নির্ভর করছে ধ্যানীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, এবং ধ্যানী কোন চেতন স্তরে অবস্থান করছে এবং তার আন্তরিক চাহিদার উপর। নির্ভর করছে পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং পরম্পরাগত ঘটনাপ্রবাহের উপর।

মনে রাখবে, এই জীবনেই সব পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি যে চেতন স্তরে আছো, সেই চেতন-স্তরের চেতনা, চাহিদা, সামর্থ্য, চেষ্টা, পন্থা, পদ্ধতি, অনুশীলন, শারীরিক ও মানসিক গঠন, সুস্থতা এবং প্রাপ্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি, সুযোগ-সুবিধা, বাধাবিঘ্ন প্রভৃতি সাপেক্ষে তোমার প্রাপ্তি ঘটবে।

অলীক-কল্পনা আকাশ-কুসুম-এর পিছনে ছুটে যেন হতাশায় ভুগতে না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কথায় আছে, 'যার কান্ডজ্ঞান নেই~ সেই কিনা দিব্যজ্ঞান এর পিছনে ছুটে মরে।' তেমনটি যেন না হয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে~ অনেক কষ্টে, অনেক সময় নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হয়। একলাফে দেশ-কাল পেরিয়ে ম্যাজিকের মতো এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

যোগ বা ধ্যানের মাধ্যমে অতি কিছু পাওয়ার ঝোঁক অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এই ঝোঁক~ অন্ধ আবেগপূর্ণ অতি ঝোঁক হলেই সর্বনাশ। অতি কিছু পাওয়ার আশা নয়, নিজেকে ধীরে ধীরে ক্রমশ যতটা সম্ভব বিকশিত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাও। সামর্থ মতো যতটা সম্ভব নিজেকে সুস্থ-শান্ত, স্বনিয়ন্ত্রণাধীন করার লক্ষ্য

নিয়েই ধ্যান করো। অতি কিছু লাভ হলে ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে গেলে, লাভ বৈ লোকসান হবে না।

ধ্যানের মূল লক্ষ্য হলো~ সত্য। সত্য উদঘাটন~ সত্যকে জানা, সত্যে পৌঁছানো, সত্যে স্থিত হওয়া। সত্যের জন্য আকুল হয়ে ধ্যান করো। একটু একটু করে সত্য তোমার কাছে প্রকাশ লাভ করবে। এটাই হলো সবচাইতে বড় পাওয়া।

আমাদের পরম বিষয় হলো 'আমি', যার মধ্যে নিহিত রয়েছে অতুল সম্পদ। চেতনার ক্রমবিকাশের হাত ধরে যা একদিন আমরা সবাই লাভ করবো।

দ্রুত বিকাশ-উন্মুখ যাঁরা, তাঁদের বুকের মাঝে বেজে উঠেছে~ মহা আত্মবিকাশ আগমনীর ঢাকের বাজনা। এই জীবনেই যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে, আরো বেশি আত্মবিকাশ ঘটিয়ে, লাভ করতে চায় আরও কিছু আত্ম-সম্পদ, লাভ করতে চায় অনাবিল শান্তি, তাদের জন্যেই মহামনন ধ্যান, আত্মবিকাশের ধ্যান~ আত্ম-ধ্যান, এই মহান আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষাক্রম।

'আমি'~ মহা চৈতন্য-সাগরের একটি বিন্দু বা একক হলো এই আমি। যাকে জানতে পারলে~ সব জানা হয়, যাকে পেলে~ বিশ্বাত্মা~ বিশ্বমন বা ঈশ্বরকে পাওয়া হয়, যাতে বিলীন হলে, ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যায়~ ক্রমে ঈশ্বর হয়ে যায় মানুষ।

এই 'আমি' কিন্তু শুধু আজকের আমি নয়। এখানে সর্বোচ্চ চেতন 'আমি' সহ সমগ্র আমির কথা বলা হয়েছে। 'সব পাওয়া হবে~ সব জানা হবে'~ সেই সর্বোচ্চ চেতন 'আমি'-র বিকাশ ঘটলে, বা সেই আমিত্ব লাভ করলে, তার আগে নয়।

এই জীবনেই কি সর্বোচ্চ মনের বিকাশ ঘটানো সম্ভব? না, কখনোই নয়~ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পরবর্তীতে 'নিজের মনকে জানো' এবং মন-আমি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বর্তমান সচেতন-মন আত্ম-বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড়জোর নিজের, অর্থাৎ মানব-চেতন মনের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম এই জীবনে। আর নিজের যথেষ্ট বিকাশের সাথে সাথে স্বভাবতই পরবর্তী উচ্চ চেতন মনের আংশিক বিকাশ ঘটতে পারে। এর বেশি নয়। এ-ই অনেক পাওয়া, এর বেশি আশা করা মুর্খামি।

এখন, জানতে হবে, এই আমিটা কে। এই দেহটা যে আমি নয়, আশাকরি এই বোধটা তোমাদের আছে যা হয়েছে। তাহলে মনটাই কি 'আমি'! মনের দিকে তাকালে বা অন্তরে দৃষ্টিপাত করলে বা অন্তরানুভব করার জন্য তার প্রতি মনোসংযোগ করলে, বোধ হবে, না, মনটাও 'আমি' নয়। যার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সে তো বাইরের জিনিস, সে 'আমি' হয় কি করে! যেখানে থেকে মনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, আমিটা আছে সেইখানে।

আপাতদৃষ্টিতে এরকম মনে হলেও, প্রকৃত সত্য তা' নয়। মন-ও একটা 'আমি', পূর্বের 'আমি'। অনেকাংশে বর্তমানের 'আমি'। আর, সচেতনভাবে এখন যাকে 'আমি' বলছি, সে হলো আগামীর 'আমি' এবং আংশিকভাবে বর্তমানের 'আমি'।

ব্যাপারটা খুবই দুর্বোধ্য ঠেকছে, তাই না! আসলে সমগ্র মন অনেকগুলি স্তরে বিভক্ত। পেঁয়াজের মতো বা পদ্মের মতো, ভিন্ন ভিন্ন রূপে~ স্তরে স্তরে সাজানো পাঁপড়ি। যেমন শিশু-মন, কিশোর-মন, যুবক-মন প্রভৃতি। মন

সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হবে পরবর্তীতে।  এইভাবে ক্রমশ একের পর এক স্তর~ বিকশিত বা প্রস্ফুটিত হতে হতে, শেষে পূর্ণ মনোবিকাশ বা আত্মবিকাশ ঘটবে! তারপর আর মন নেই, 'আমি' নেই। থাকে শুধু বীজ। সমস্ত পাঁপড়ি ঝরে গিয়ে~ মনোপদ্মের বীজ অবশিষ্ট থাকে। যা আসলে পুনরায় আত্মবিকাশ লীলা বা সৃষ্টি লীলার গোপন প্রস্তুতি।

এখন, ধ্যানের বিষয় যে~ 'আমি', সে হলো বর্তমানে আংশিক বিকশিত ক্রমবিকাশমান কিশোর মন বা সচেতন মন, যে পরবর্তীকালে পূর্ণ বিকাশলাভের অপেক্ষায়। আর, এখন যাকে 'মন' বলছি, সে হচ্ছে অনেকাংশে বিকশিত, অথবা কারো কারো ক্ষেত্রে প্রায় বিকশিত শিশুমন বা অবচেতন মন।

আমাদের এই 'মন' বা শিশুমন এখন অনেকটাই বিকশিত। তাকে নিয়ে আমাদের চিন্তা থাকলেও, তার বিকাশ আমাদের লক্ষ্য নয়। এখন বিকাশের লক্ষ্যে রয়েছে  কিশোর-মন বা সচেতন মন। যাকে বলা হচ্ছে 'আমি'~ সচেতন 'আমি'। অতি নিম্ন চেতন-স্তরের মন থেকে শিশুমন পর্যন্ত, নিম্নচেতন মনগুলি~ নিজেরা নিজেদের বিকাশ ঘটাতে অক্ষম। শিশুমনের বিকাশ ঘটে অতি ধীর গতিতে কর্ম ও ভোগের মধ্য দিয়ে, বহু দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, বহু পীড়নের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে।

এখানে, আমি মনকে দেখছি বা অনুভব করছি, অর্থাৎ কিশোর-মন (সচেতন মধ) শিশুমনকে (অবচেতন মনকে) দেখছে বা অনুভব করছে, অথবা তার ক্রিয়া-কলাপ পর্যবেক্ষণ করছে। এখানে কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব সত্তা বা অস্তিত্ব রয়েছে। যেন, পদ্মের এক সারি বা এক স্তরের পাঁপড়ি তার নিচের সারির পাঁপড়িকে দেখছে। ('মন-আমি যোগ' অনুশীলন করলে বুঝতে পারবেন।

বর্তমানে আমাদের মনোরাজ্যে দুটি মন সক্রিয় ভূমিকায় রয়েছে। একটি হলো~ শিশুমন বা আদিম বা প্রাক মানব-চেতন মন, আর অপরটি হলো~ কিশোর-মন বা মানব-চেতন মন। প্রচলিত ভাষায়, প্রথমটিকে বলা হয়~ অবচেতন মন। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয়~ সচেতন মন।

কোন শিক্ষক বা গুরুর দ্বারা অথবা অন্য কোন মাধ্যমের সাহায্যে, দুটি মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত, সাধারণত সবার বোধ হয়ে থাকে, যেন আমাদের একটাই মন। একটা মনই কখনো 'হ্যাঁ', আবার কখনো 'না' বলছে। কখনো সে আবেগ ধর্মী, আবার কখনো সে বিবেক ধর্মী। এইরকম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 'মুডে' কাজ করছে। কখনো আবার ক্ষণিকের মধ্যেই বিপরীত ধর্মী আচরণ করছে। নিজেই অন্যায় করছে, আবার নিজেই শাসন করছে। এইরকম অভিজ্ঞতা সবারই কমবেশি আছে। দুটি মনের আলাদা অস্তিত্ব~ সম্যক উপলব্ধি করার পর, তখন ব্যক্তির দৃষ্টি বদলে যায়। তখন সে যেন এক অন্য মানুষ! নতুন চেতনার আলোকে দেখতে শুরু করে সে তখন।

তখন, দুটি মন সরাসরি পরস্পরকে দেখতে না পেলেও, একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কমবেশি ওয়াকিবহাল। শিশুমনের চেতনার ন্যূনতার কারণে, সে কিশোর-মনকে ভালোভাবে জানতে~ বুঝতে অক্ষম হলেও, এবং মাঝে মাঝেই কিশোর-মনের কথা বিস্মৃত হলেও, সে এইটুকু জানে, যে তার উপরে একজন বড় কর্তা আছে, যাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মান্য করে চলতে হয়।

এদিকে, এখনও পর্যন্ত কিশোর-মনের অর্থাৎ সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটার ফলে, সে নিজের পূর্ণ ভূমিকা পালনে সব সময় সমর্থ না হলেও, শিশুমনের বা অবচেতন মনের কাজকর্মের উপর নজর রাখা, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, এবং সেইসঙ্গে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা সে কোরে থাকে~ তার সামর্থ মতো। এককথায়,

মনের রঙ্গমঞ্চে শিশুমনের প্রায় একক নাট্যাভিনয়ে সে অর্থাৎ সচেতন মন~ কখনো নেপথ্যে থেকে প্রম্পটারের ভূমিকা, আবার কখনো মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে বিবেকের ভূমিকা পালন কোরে থাকে। বেশিরভাগ সময়েই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে  যথেষ্ট বিকাশের অভাবে।

কোনো 'মন' তার ক্রমোচ্চ এঐ পরবর্তীতে বিকাশযোগ্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ চেতন মনের ভিতরকার ক্রিয়া-কলাপ অনুভব কোরতে অক্ষম। তাকে সম্যক উপলব্ধি কোরতে অক্ষম। শুধু তদ-উচ্চ মনের বিকাশের পরিমাণ অনুসারে, তার শক্তি~ প্রভাব~ নির্দেশ মান্য কোরতে এবং তার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব অনুভব কোরতে সক্ষম। কোনো মনের যথেষ্ট বিকাশ বা পূর্ণবিকাশ~ তার উর্দ্ধতন~ তদপেক্ষা উচ্চ চেতন মনের বিকাশের উপরেও নির্ভরশীল। সেই উচ্চ চেতনার প্রভাবে সে আরও সমৃদ্ধ হয়ে পূর্ণতা লাভ সক্ষম হয়।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানযোগের পাঠ সহ 'সুষুপ্তি যোগ' এবং 'মন-আমি যোগ' অনুশীলনের মধ্য দিয়েই দুটি মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয়ে থাকে। তবে শুধু উচ্চ চেতনাসম্পন্ন আত্মসচেতন ব্যক্তিগণই নিজেদের মনোরাজ্যে দুটি মনের অস্তিত্ব এবং তাদের কর্মকান্ড অনুভব কোরতে সক্ষম। অপেক্ষাকৃত নিম্ন-চেতনার মানুষের ক্ষেত্রে, মনোরাজ্যের এই সমস্ত লীলা খেলা তাদের অজ্ঞাতেই ঘটে থাকে। তাদেরকে চিনিয়ে দিলেও তারা চিনতে পারে না। অথবা তখনকার মতো চিনতে পারলেও, পরে তা' ভুলে যায়। মনে রেখো, এই উচ্চচেতনা ও নিম্নচেতনা~ ব্যক্তির সচেতন মনের বিকাশের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

'আমি' বা সচেতন মন আমাদের ধ্যানের বিষয় হলেও, প্রথমে মনকে অর্থাৎ অবচেতন মনকে জানতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে। তাকে সুস্থ ও দূষণ মুক্ত করতে হবে। অসুস্থ~ অস্থির~ বিক্ষিপ্ত মনই ধ্যানের প্রধান অন্তরায়। তাই, তাকে এড়িয়ে নয়, তাকে অবদমন কোরে নয়, তাকে জয় করে~ তার সাহায্য নিয়ে, তবেই স্ব-বোধে~ আমির কেন্দ্রে পৌঁছানো সম্ভব হবে। আমির ধ্যানে, অন্যান্য বিষয়বস্তুর ধ্যানের মতো, সরাসরি আমির কেন্দ্রে একাগ্র হওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে, অন্য পন্থা অবলম্বন কোরতে হবে। পরে ধ্যান প্রক্রিয়ায় তা আলোচনা করছি।

মনকে না জেনে, তাকে নিয়ন্ত্রণ না কোরে, বরং মনের পাগলামী কে প্রশ্রয় দিয়ে, অবাস্তব কাল্পনিক বিষয়ের ধ্যান কোরলে, মন সে চাহিদা মেটাতে~ কল্পনার জাল বুনে, রঙিন স্বপ্নের অবতারণা করবে। 'ইলিউশন' বা 'হ্যালুউসিনেশন' সৃষ্টি করবে। আর, তাতেই যদি তুমি ভাবো~ সব পেয়ে গেছি! অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছি! তাহলে তা' হবে নির্বোধের স্বর্গবাস করার মতো ঘটনা।

'মহামনন ধ্যান' বা আত্ম-ধ্যানের সঙ্গে সাধারণ ধ্যান এবং সম্মোহন নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য হলো, 'মহামনন ধ্যান' বা আত্ম-ধ্যানে, আবেগপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ শিশুমন বা অবচেতন মন~ সচেতন মনের সজাগ দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকার ফলে, সে বিবশ হয়ে~ অভিভূত হয়ে বিশ্রাম অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর কিশোর-মন বা সচেতন-মন থাকে জাগ্রত অবস্থায়। অবশেষে নিজেকে নিজের মধ্যে পেয়ে, সে এক অব্যক্ত আনন্দে কাটিয়ে দেয় বেশ কিছু সময়।

সাধারণ ধ্যান এবং সম্মোহন নিদ্রায় তার বিপরীত ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে, কিশোর মন বা সচেতন-মন বিশ্রামাবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর কল্পনাপ্রবণ শিশুমন বা অবচেতন মন কিছু অংশে অভিভূত হলেও, অনেকাংশে সজাগ থাকে। এক্ষেত্রে তারই প্রধান ভূমিকা থাকে।

'মহামনন' আত্ম-ধ্যান এবং সম্মোহন-নিদ্রা বা নিদ্রাযোগ এই দুটি ক্ষেত্রে আমাদের দুটি মনের পৃথক পৃথক ভূমিকা রয়েছে। দুটি মনকেই আমাদের প্রয়োজন এবং এদের দু'জনকেই জানতে হবে। কিশোর-মন বা সচেতন মনকে নিদ্রাযোগ বা সম্মোহন পদ্ধতিতে সহজেই ঘুম পাড়ানো যায়, কারণ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই মনটি স্বল্পাংশে জাগ্রত এবং তেমন সক্রিয় নয়। তার তন্দ্রাচ্ছন্নতা এখনো কাটেনি। কিছু মানুষকে দেখা যায়, জাগ্রত অবস্থায় কথা বলতে বলতে অথবা কাজ করতে করতে, এদের ঘুমের ঢুলুনি এসে যায়। এই সচেতন মনটির অবস্থাও ঠিক তেমনই। আপাতদৃষ্টিতে জাগ্রত ও কর্ম ব্যস্ত মানুষের সচেতন-মন সারা দিনে-রাতে কতবার যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে, আবার চট্ করে জেগে ওঠে তার কোন হিসেব নেই। সচেতন মনের অনুপস্থিতির সুযোগে, শিশুমন বা অবচেতন মনের লীলাখেলা বা কল্পনা চলতে থাকে অবাধে।

কোনো বিষয়বস্তুতে কিছুক্ষণ স্থির-একাগ্র হয়ে থাকলেও, কিশোর-মন বা সচেতন-মন অবশতা প্রাপ্ত হয়ে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়ে। ভিতরে উত্তেজনা না থাকলে এবং সামনে উত্তেজক কিছু না থাকলে, শান্ত পরিবেশে তন্দ্রাচ্ছন্নতা আসে আরও তাড়াতাড়ি। এ অবস্থার নিদ্রার সংস্কার বা প্রি-প্রোগ্রামিং সাজেশন থাকলে তো আর কথাই নেই। শীঘ্রই ঘুমের কোলে নিজেকে সঁপে দেবে সে। আত্ম-ধ্যানের সময়ও এরকম ঘটতে পারে। তবে সতর্ক~ সচেতন ও জাগরণের জোরালো সংস্কার বা প্রি-প্রোগ্রামিং  থাকলে, সে আর ঘুমিয়ে পড়বে না। আত্ম-ধ্যানের সময় শিশু-মন বা অবচেতন-মন~ কিশোর মনের বা সচেতন মনের সতর্ক দৃষ্টির সামনে ক্রমশ উত্তেজনা হারিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন প্রয়োজনে~ অপ্রয়োজনে আমরা প্রায় অহরহ ধ্যান করে চলেছি। কখনো সচেতনভাবে~ জ্ঞাতে, আবার কখনো অজ্ঞাতে। কখনো ক্ষণকালের জন্য কখনো অল্প সময়ের জন্য। অধিকাংশ সময়েই এই সমস্ত ধ্যান গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, ধ্যান আমাদের স্বভাব গুণ। কিন্তু অনেক সময়েই আমরা নিজেদের অনেক গুণ~ ধর্ম~ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন নই, তাই প্রয়োজন হয় এ বিষয়ে দক্ষ~ অভিজ্ঞ একজন গুরুকে, যিনি পথ দেখিয়ে দেবেন প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেবেন। এছাড়া সাধারণভাবে যে কাজ করতে বহু সময়~ বহু শ্রম ব্যয় করতে হয়, সেই কাজই অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসে সম্পন্ন হতে পারে একজন উচ্চশ্রেণীর গুরু বা পথপ্রদর্শকের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও সহজ পন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন কোরে।

ধ্যান আমাদের মনের স্বভাব গুণ হলেও, চঞ্চলতাও তার স্বভাব ধর্ম। বিশেষত শিশুমন বা অবচেতন মনের স্বভাবই হলো চঞ্চলতা। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছোটাছুটি করাই তার স্বভাব। আবার, তার সঙ্গে যদি থাকে অসুস্থতা, তাহলে তো আর কথাই নেই। শিশুমন বা অবচেতন মনের কাছে কোনো বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় না হলে, সে সেই বিষয়বস্তু থেকে দ্রুত সরে যাবে অন্য বিষয়বস্তুতে। আবার, সে যদি কখনো কোনো বিষয়বস্তুতে খুব আকর্ষণ বোধ করে, সেক্ষেত্রে সে মোহিত হয়ে~ মোহ-আবেশে আবিষ্ট হয়ে, সেই বিষয় বস্তুর প্রতি স্থির একাগ্র হয়ে~ ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে তখন।

এই বৈপরীত্য সম্পন্ন মনটাকে ভালোভাবে জেনে, তাকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ কোরে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের~ আত্মবিকাশের পথে। আমাদের সচেতন-মনের বিষয়বস্তু যে সব সময় এই শিশুমনের বা অবচেতন মনের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে, এমন নয়। তাই আমাদেরকে কিছু বিশেষ পদ্ধতি~ বিশেষ কিছু যোগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে বশে আনতে হবে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে।

বিশেষ কোরে, অদেখা~ অজানা অন্তর-বিষয়ের ধ্যানের মতো এক কঠিন বিষয়ের ক্ষেত্রে, প্রথমদিকে আমরা অনেকেই অসহায় বোধ কোরে থাকি। যার জন্য প্রয়োজন হয় এমন একজন সদগুরু-কে যিনি প্রকৃতই জানেন,

যিনি হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবেন, সংশয়ের দুয়ার পার হতে~ যিনি ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেবেন~ সাহস জোগাবেন।

তত্ব বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, চেতনার ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে ধাপে ধাপে পূর্ণ চেতনায় পৌঁছাতে হবে আমাদের। আমরা সবাই এক পথের পথিক, বিকাশমান চেতনার পথে। অস্ফুট চেতনা থেকে পূর্ণ চেতনার লক্ষ্যে, ক্রমবিকাশের পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি।

আমরা এখন যেখানে অবস্থান করছি, এ হলো~ মানব-চেতন-স্তর। এখান থেকে সামনে ঊর্ধ্বে~ বহু দূর পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হলে, বুঝতে পারবে, আমাদেরকে এই মানব-চেতন-স্তর পেরোতে হবে প্রথমে। তারপর রয়েছে~ মহামানব চেতন-স্তর। তারপরে দেব-চেতন-স্তর। তারপরে মহাদেব চেতন স্তর। অবশেষে ঈশ্বর চেতন-স্তরে পৌঁছে, ঘটবে ঈশ্বরত্ব লাভ। পূর্ণ মানবত্ব লাভ না কোরে, দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভ সম্ভব নয়। এড়িয়ে বা ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না। পায়ে পায়ে সমস্ত পথ অতিক্রম কোরতে হবে। তবে যদি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে চাও, তাহলে 'মহামনন' ধ্যান এবং মহা আত্মবিকাশ যোগ-এর সাহায্য নাও।

ধ্যান কিভাবে করবো। সবচাইতে সহজ কাজটাই সবচাইতে বেশি কঠিন। ধ্যানের ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তা' সেই কঠিন কাজটিতে সাফল্য লাভ করতে প্রস্তুতি দরকার। প্রথমে নিজের মনকে চিনতে~ জানতে হবে। আমরা এখন যে চেতন স্তরে রয়েছি, সেখানে দুটি মন কাজ করছে। একটি হলো শিশুমন বা আদিম মানবচেতন মন বা অবচেতন মন। অপরটি হলো~ কিশোর-চেতন মন বা মানবচেতন মন বা সচেতন মন। অস্থির~ অন্ধ-আবেগ পূর্ণ এই শিশু মনটাকে নিয়েই যত সমস্যা। এই শিশুমনটাকে 'প্রোগ্রামিং' -এর মাধ্যমে, সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে। মনের মধ্যে জমে থাকা রাশি রাশি অবদমিত দুঃখ-কষ্ট~ অপমান~ লজ্জা~ গ্লানি~ কালিমা-কলুষ, উত্তেজনা এবং যৌন উত্তেজনা প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে, তাকে নির্মল করে তুলতে, এবার এক পা~ এক পা কোরে এগিয়ে যেতে হবে গভীর ধ্যানের লক্ষ্যে।

মহামনন ধ্যান প্রস্তুতি পর্ব:

আত্ম-ধ্যান হলো 'আমি'-র ধ্যান। এই 'আমি'-টা কে, কোথায় তার অবস্থান জানতে হবে। যাকে জানলে প্রায় সব জানা হয়, সেই 'আমি'-কে অর্থাৎ নিজেকে জানতে হবে আমাদের। আত্মজ্ঞান হলো এই 'আমি'-র জ্ঞান। 'আমি'-কে দেখা যায়না, উপলব্ধি করা যায়। নিজেকে অর্থাৎ 'আমি'-কে যত বেশি জানা যাবে, ঈশ্বর তথা এই মহাবিশ্ব জগতের রহস্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'আমি'-কে অর্থাৎ নিজেকে জানার উদ্দেশ্যেই এই সৃষ্টি লীলা (মহর্ষি মহামানসের মহান সৃষ্টিতত্ব দ্রষ্টব্য) শুরু হয়েছে। 'আমি'-কে পুরোপুরি জানা হলে, তবেই ঘটবে মোক্ষ লাভ। সৃষ্টির অবসান ঘটবে তখন।

অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা আছে, তারা মনে করে, ধ্যান চর্চা শুধুমাত্র সাধু-সন্ন্যাসী-তপস্বীদের জন্য।'ধ্যান' অভ্যাস যে প্রতিটি মানুষের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়, তারা তা' জানেনা। 'ধ্যান' হলো আমাদের সবচাইতে বড় ঔষধ। ইদানীং, সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও 'যোগ' চর্চা শুরু হয়েছে। যোগের উপকারীতা অনেকেই আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে। এই 'যোগ' প্রক্রিয়াকে বলা হয়, 'হঠ যোগ'। 'যোগ'-এর রাজা হলো 'ধ্যান'। যাকে বলাহয়-- 'রাজ-যোগ'। আজকের দিনে, ভালোভাবে জীবনযাপন করতে হলে, সুষ্ঠুভাবে বিকাশলাভ করতে হলে, 'ধ্যান' ছাড়া আমাদের গতি নেই।

মন শান্ত থাকা অথবা মনকে শান্ত রাখা শুধুমাত্র মনের উপর নির্ভর করেনা। শরীরের মধ্যে প্রদাহ ও উত্তেজনা (ইরিটেশন,  ইনফ্লেমেশন, এক্সাইটমেন্ট) হতে থাকলে, তার প্রভাবে মনও অশান্ত হয়ে ওঠে।

গভীর ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা~

যথেষ্ট আগ্রহ, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা, আস্থা, অনুভূতি প্রবণতা বা সংবেদনশীলতা, শিথিল হওয়ার সক্ষমতা বা রিল্যাক্সিবিলিটি, মেরুদন্ডসহ স্নায়ুমন্ডলের নমনীয়তা এবং প্রয়োজনীয় সুস্থতা থাকা প্রয়োজন।

ধানের প্রসঙ্গ এলেই, সজাগ-সচেতন নতুন শিক্ষার্থীদের মনে যে প্রশ্ন দুটি প্রথমেই আসে, তা হলো~ ধ্যান আসলে কি এবং ধ্যান কেন করবো।

কোন কিছুতে, অথবা কোনোকিছু চিন্তন, কল্পনা, স্মরণ অথবা মনশ্চক্ষে অবলোকীত বিষয়ে একনিবিষ্ট হয়ে পুনঃপুনঃ সেই বিষয়-বস্তুর চিন্তার দ্বারা অবিরাম বা সবিরামভাবে মনোযুক্ত থাকাকেই সাধারণভাবে বলা হয়, ধ্যান বা ধ্যান করা।

'যোগ' প্রসঙ্গে যেমন বলেছি, ধ্যানের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো, ধ্যেয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে--- তার অন্তর্নিহিত সত্যকে জানা। এই সম্যাক জ্ঞান লাভের ফলে, ধ্যানীর চিন্তাভাবনা ধারণায় অনেক পরিবর্তন ঘটে থাকে। এবং অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সে তখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এছাড়াও সঠিকভাবে সাফল্যমন্ডিত ধ্যানের মধ্য দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই ধ্যেয় বিষয়বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করাও সম্ভব হয় কখনো কখনো। ধ্যানী ও ধ্যেয় বিষয়বস্তুর মূল উপাদান আসলে একই। তাই, সুগভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে যদি কখনো ধ্যানী এবং ধ্যেয় বিষয়বস্তু মিলিত হয়ে, অবশেষে একাত্মতা লাভ করে একাকার হয়ে যায়, তখনই ঘটে প্রকৃত সমাধি অবস্থা। তবে ভাবসমাধি আর প্রকৃত সমাধি এক জিনিস নয়। অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক অলীক বিষয়বস্তুর ধ্যানের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে না। এই বিষয়ে 'মহামনন' আত্মবিকাশ যোগ শিক্ষার ক্লাসে বিশদভাবে আলোচনা হবে।

ধ্যানের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের। যেমন সজাগ-সচেতন ধ্যান, ভাবাবেশ মুলক ধ্যান, শূণ্য ধ্যান, অলীক ধ্যান, আত্ম-ধ্যান।

এখানে উল্লেখিত 'মহামনন' ধ্যান পদ্ধতিটি হল আত্ম-ধ্যান বা অধ্যাত্ম ধ্যানের একটি বিশেষ পদ্ধতি। আত্ম-ধ্যান হলো--- যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-মনষ্ক, প্রকৃত অধ্যাত্ম সচেতন, মুক্ত মনের, আত্মবিকাশ অর্থাৎ মনোবিকাশকামী সজাগ-সচেতন মানুষের উপযোগী আত্মবিকাশমূলক ধ্যান।

'মহামনন' আত্ম-ধ্যান-যোগের ক্ষেত্রে ধ্যানের বিষয় হলো নিজের মন। যাকে জানলে, সব জানা হয়, যার বিকাশ ঘটানোই আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ। আবার, সেই বিষয়ানুরাগী ধ্যানী যে, সে-ও তো সেই মন। একে বলা হয়--- আত্ম-ধ্যান বা অধ্যাত্ম ধ্যান। নিজেকে জানা--- উপলব্ধি করা, নিজের (মনের) এবং অন্তর্নিহিত শক্তি--ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোই এই ধ্যানের লক্ষ্য।

এই ধ্যানের জন্য সজাগ-- সচেতনতাসহ তীব্র চাহিদা--- অনুরাগ থাকতে হবে। পাশাপাশি, ইতিপূর্বে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্ব (মহাবাদ) সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। এই জ্ঞান লাভও 'মহামনন'

শিক্ষা বা সাধনার একটা অঙ্গ। এই ধ্যানে সাফল্য লাভ করতে, মনকে অন্তর্মুখী স্থির একাগ্র করে তোলার জন্য বিশেষ কয়েকটি যোগ-পদ্ধতি পূর্বেই অনুশীলন করতে হয়। তাতেই অর্ধেক কাজ হয়ে যায় এবং অর্ধেক পথ অতিক্রম করা হয়ে যায়। গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্তর-মন সাগরের রত্নখনি থেকে দিব্য-রত্ন তুলে আনা সহজসাধ্য হয় এর দ্বারা।

নতুন শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার জন্য আর একবার বলি, সাধারণভাবে 'ধ্যান' হলো--- কোনো কিছুতে মনোযুক্ত হওয়া বা মনোযোগ দেওয়া। যাকে বলা হয় ধ্যান দেওয়া। অথবা গভীর ভাবে কোনও কিছুর চিন্তা করা।

কিন্তু ধ্যান বা ধ্যান-যোগ কথাটি যখন বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন 'ধ্যান' বা 'ধ্যান করা' কথাটি বিশেষ অর্থ বহন করে থাকে। তখন, 'ধ্যান' অর্থে অত্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে তন্ময় হয়ে, অথবা ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে--- স্থির একনিবিষ্ট হয়ে, কোনো বিষয়-বস্তু বা ভাবনা বা স্মৃতি বা কল্পনা প্রভৃতি কোন একটি বিষয়ে চিন্তামগ্ন হওয়া অথবা মগ্নচিত্ত হওয়া অথবা মনোনিবেশ করা বোঝায়।

তবে ধানের প্রকারভেদ আছে। তারমধ্যে, একপ্রকার ধ্যান আছে, যাতে কোন কিছুতে মনোসংযোগ করা অথবা একাগ্র হয়ে কোনোকিছু চিন্তা করার কোনো স্থান নেই। তাকে চিন্তাশূণ্য বা শূণ্য ভাবের ধান বলা হয়। তবে পূর্বোক্ত একাগ্র মনোসংযোগ মূলক ধ্যানের ক্ষেত্রেও, শেষ পর্যায়ে চিন্তাশূন্য এক বিহ্বল ভাবাবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে। শূণ্যাবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আরেক প্রকার ধ্যান আছে, সেক্ষেত্রে ধ্যানী তীব্র আবেগ বা ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়ে, খুব দ্রুত গতিতে অত্যন্ত গভীর ধ্যান-স্তরে উপস্থিত হয়ে থাকে। অবশ্য এই প্রকার ধ্যান সবার ক্ষেত্রে ঘটে না। আমাদের আলোচ্য ধ্যান প্রকারটি হলো--- আত্ম-ধ্যান। এখানে ধ্যানীর ধ্যানের বিষয় সে নিজেই। অর্থাৎ ধ্যানী-ও 'মন', আবার ধ্যানের বিষয় বা ধ্যেয় বিষয়-ও সেই 'মন'।

এই প্রসঙ্গে বলি, শুধু ধ্যান-যোগ দিয়েই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন কথা আমি বলি না। শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমানে অর্জিত ও বংশগত টক্সিন বা রোগবিষ থাকলে, তা' ধ্যান-যোগ অভ্যাসে বিঘ্ন ঘটাবে। সেক্ষেত্রে মোটামুটি সাধারণ স্তরের ধ্যান হলেও, তাতে পুরোপুরি সমস্যা মিটবে না। তাই, ধ্যান-যোগ অভ্যাসের পাশাপাশি, শরীর থেকে টক্সিন মুক্ত করতে হবে নিয়মিতভাবে। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আহার-বিহার করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য, রোগ অবদমনকর চিকিৎসা, দুষিত পরিবেশে বাস এবং অনিয়মিত জীবনযাপন মনকে অস্থির, উত্তেজিত ও অসুস্থ করে তোলে। যা ধ্যান-যোগ সাধনা এবং তাতে সাফল্য লাভের পক্ষে মোটেও অনুকূল নয়।

**ধ্যান কী, সে সম্পর্কে পূর্বে বলেছি। এবার বলি, ধ্যান কেন করবো~**

নিয়মিত ধ্যান অভ্যাস করার ফলে, ধ্যানী বা ধ্যান-যোগী যে সমস্ত ক্ষেত্রে লাভবান হয়ে থাকেন, সেগুলি একে একে বর্ণনা করলেই বোঝা যাবে, তার মধ্য থেকে কার কোন বিষয়টির চাহিদা রয়েছে। নিয়মিত ধ্যান অভ্যাসের ফলে ঘটে~

◦ মানসিক শান্তি লাভ অর্থাৎ মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি।
◦ মানসিক শৃঙ্খলা লাভ অর্থাৎ মনের বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি।

◦ একাগ্রতা--- মনোযোগ, আগ্রহ বৃদ্ধি। ◦ প্রধান মানসিক ক্ষমতা--- সঠিক ভাবে গ্রহন ক্ষমতা, ধারণ ক্ষমতা, ও বিতরণ বা ডেলিভারি ক্ষমতা বৃদ্ধি।
◦ উদ্বেগ-উৎকন্ঠা, স্ট্রেস ও টেনশন থেকে মুক্তি।
◦ অস্থিরতা, উত্তেজনা, ভয় থেকে মুক্তি। ◦ মানসিক দূষণ থেকে মুক্তি। ◦ প্রশান্ত ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি।
◦ মনের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি। ◦ মনের মেঘাচ্ছন্নভাব থেকে মুক্তি অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন মন।
◦ চিন্তাশক্তি~ কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি।
◦ নতুন বিষয়ের ধারণা~ নতুন আইডিয়া লাভ।
◦ মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি।
◦ মানসিক এনার্জি বৃদ্ধি, যার ফলে মুড ভালো থাকা।
◦ ইরিটেবিলিটি, অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্তি।
◦ হতাশা--- অবসাদ থেকে মুক্তি। ◦ কর্মকুশলতা বৃদ্ধি।
◦ সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদনা করার ক্ষমতা লাভ।
◦ শারীরিক ক্ষেত্রে: আজকের দিনের অধিকাংশ রোগ-ব্যাধি, যাকে এক কথায় বলা হয়~ 'সাইকোসোমাটিক ডিজিজ', এগুলো থেকে আস্তে আস্তে মুক্তিলাভ। যেমন উচ্চরক্তচাপ, টেনশন রিলেটেড যন্ত্রণা, এসিডিটি, মাথার যন্ত্রনা, অক্ষুধা, ক্লান্তি, আচরণগত সমস্যা, এবং ইমিউন সিস্টেমের সমস্যা প্রভৃতি বহু সমস্যা থেকে মুক্তি।

অন্যান্য প্রকারের ধ্যান পদ্ধতি থেকে 'মহামনন' আত্ম-ধ্যানের উপকারিতা অনেক বেশি। আত্ম-ধ্যানের মাধ্যমে আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আত্মোপলব্ধি হওয়ায়, ধ্যান যোগীর আচরণে অনেক শুভ পরিবর্তন ঘটে থাকে।

আমি কখনোই বলিনা, ধ্যান ও যোগের মাধ্যমেই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে (অর্জিত ও বংশগত) রোগ, রোগবিষ বা টক্সিন থাকলে, ধ্যান-যোগের পাশাপাশি সঠিক প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং 'ডিটক্সিফিকেশন' পদ্ধতির সাহায্যও নিতে হবে আমাদের।

মহা মনন ধ্যানের প্রস্তুতি অধ্যায়~

ধ্যানের মূল বিষয় হলো আমাদের 'মন'। তাই, ধ্যানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে, মন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে হবে তোমাকে। মহর্ষি মহামানস -এর যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো এখানে।

## নিজের মনকে জানো

(মহর্ষি মহামানস-এর অধ্যাত্ম-মনোবিজ্ঞান হতে গৃহীত)

একটি শিশুকে আগ্রহের সাথে বারবার নানাবিধ প্রশ্ন করতে দেখে, আমরা সাধারণতঃ তাকে উন্নতিশীল বা প্রগতিশীল শিশু বলে চিহ্নিত ক'রে থাকি। তার এইসব প্রশ্ন যদি নিছক কৌতুহল না হয়ে জানার আগ্রহ হয়, আর সে যদি তার স্বল্প জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সম্বল ক'রেই যুক্তি-বিচার সম্ভাবনা-অনুমান-এর সাহায্যে সত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, এবং সেই পথে সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, তখন তাকে আমরা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শিশু বলে থাকি।

শুধু শিশুই নয়, বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেও এ'কথা প্রযোজ্য। যে সচেতন মনটির মালিক হওয়ার সুবাদে— আমরা মানুষ বলে গণ্য হই, সেই সচেতন বা মানব-চেতন মনটি এখনো আমাদের অধিকাংশের মধ্যে শৈশব অবস্থাতেই রয়েছে। তার যথেষ্ট বিকাশ ঘটলে— তবেই ঘটবে মনোবিকাশ —ঘটবে মানব-বিকাশ।

সঠিক বিকাশের জন্য— জানার আগ্রহের সাথে থাকতে হবে সুস্থতা। ক্রোধ-উত্তেজনা-অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, অলসতা-উদাসীনতা প্রভৃতি অসুস্থতা জ্ঞাপক দোষসহ অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধবৎ অনুসরণ, নির্বোধের মতো সব মেনে নেওয়া, যুক্তি-বিচারের অক্ষমতা, এবং স্রোতে ভেসে চলার প্রবণতা প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের বিকাশের পরিপন্থি। কষ্ট করতে রাজি নয়, এমন একজনের বক্তব্যঃ 'বিশ্বাস করতে তো আর কষ্ট করতে হয়না, জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়!' অথচ, জ্ঞানাভাবের কারণে তাকে আরো অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে!

মানব-জীবন লাভ ক'রে— মানব অস্তিত্ব সম্পন্ন উন্নত জীব হয়েও যদি কারো মধ্যে— নিজের সম্পর্কে—জীবন সম্পর্কে জোরালো প্রশ্ন না জাগে, আত্ম-জিজ্ঞাসা— জীবন-জিজ্ঞাসা —বিকাশাকাঙ্খা না জাগ্রত হয়, এবং যদি সে তার উত্তর সন্ধানে— সত্য সন্ধানে যুক্তিপথে অগ্রসর না হয়, সেক্ষেত্রে, তার সচেতন মনের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়।

সচেতন বা মানব-চেতন মনের ধর্মই হলো— যুক্তি-বিচার-সতর্কতার সাথে বাস্তবপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি। আর, অবচেতন বা প্রাক-মানব-চেতন মনের ধর্ম হলো— অন্ধ-আবেগ— অন্ধ-বিশ্বাস, অলীক কল্পনা প্রিয়তা প্রভৃতি। মনে রাখতে হবে, আত্ম-জিজ্ঞাসাই ঊর্ধগামী আত্ম-বিকাশ-পথের প্রথম সোপান। এবং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে— তা' যেন নিম্নগামী অন্ধবিশ্বাসের আপাত সুখকর পথে নেমে গিয়ে— পথভ্রষ্ট না হয়, —বিপথগামী না হয়।

আমাদের সচেতন-মন যত বেশি বিকশিত হবে, আমরা ততই অন্ধ-বিশ্বাস মুক্ত হয়ে— যুক্তি ও জ্ঞানপথে অগ্রসর হতে পারবো। আমরা যুক্তি ও জ্ঞানের পথ ধরে যত চলবো— সেইমতো সচেতন-মনের বিকাশও ঘটতে থাকবে ততই।

মনের কথা:

মন সম্পর্কে প্রচলিত ধারনায়, মনের দুটি বিভাগ বা অংশের মধ্যে একটি হলো--- হৃদয়, আর অপরটি হলো--- মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক বড় না হৃদয় বড়, এই নিয়ে অনেকের অনেক কথা শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, হৃদয়বান মানুষ মস্তিষ্কজাত বুদ্ধিমান মানুষ থেকে শ্রেয়।

এখন, আমরাও আমাদের (সক্রিয় ও নিস্ক্রিয় মিলে) সমগ্র মনের বর্তমানে সক্রিয় ভূমিকায় থাকা দুটি অংশ-মন সম্পর্কে জানি। তার একটি হলো---অবচেতন বা প্রাক-মানবচেতন মন, আর অপরটি হলো--- সচেতন বা মানবচেতন মন।

প্রথমটি হলো কল্পনা ও আবেগ প্রবণ--- যুক্তি-বুদ্ধি বিহীন অন্ধবিশ্বাসী, কাম-ক্রোধ-লোভ-লালসায় আসক্ত অবুঝ মন। প্রয়োজন বোধে এই মন তার চাহিদা পূরণের জন্য অপরাধ করতেও পিছু-পা নয়। এই মনের মধ্যে আবার রয়েছে, তার স্বজাতি---স্বধর্মী---স্বজনদের প্রতি সহজাত টান ও ভালোবাসা। এককথায়, মোহমায়ায় আচ্ছন্ন অজ্ঞান-অন্ধ এক দুর্বার-দুরন্ত শিশু-মানব-মন।

এই মনটি এখন অধিক অংশেই বিকশিত ও সক্রিয়। অপর সচেতন মনের সঙ্গে একত্রে বাস করার ফলে, সচেতন মনের বিকাশের সাথে সাথে এই মনটিও এখন পূর্বের তুলনায় অনেকটাই পরিশীলিত। সচেতন মনের কিছু কিছু গুণ এর মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায় সে এখন অনেকটাই আধুনিকা।

সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থার এই মনটির সুমধুর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অনেকবার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বর্তমানে অসুস্থ হওয়ায়, এই মনও অসুস্থ--- বিকারগ্রস্ত।

দ্বিতীয় সক্রিয় মনটি হলো--- যুক্তি-বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সজাগ-সচেতন মন। কিন্তু এই মনটি অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই খুব সামান্য মাত্রায় বিকশিত ও সক্রিয়। তাই, এখনো এর কার্যকলাপ খুবই অল্প ও সীমিত।

চোখে ঠুলি পড়ানো তীব্র বেগবান বুনো ঘোড়াসম অবচেতন মনের রাশ বা লাগাম ধরা রয়েছে এই মনের কাছে। তাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ভালোভাবে জীবন যাপন করা এবং বিকাশ লাভ করাই হলো এই সত্যপ্রিয় জ্ঞানপ্রিয় সচেতন মনের ধর্ম-কর্ম।

এখন, হৃদয় বলতে আমরা এই অবচেতন মনকেই বুঝে থাকি। অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগ-ই হলো অবচেতন মনের ধর্ম। সে সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকলে, অন্ধ-আবেগ বশতঃ কখন যে কী করে বসবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সে নিজে অন্ধ-বিশ্বাসী হলেও, তাকে মোটেও বিশ্বাস নেই। সে যাকে ও যাদেরকে স্বজন--- সমগোত্রীয়--- সমভাবাপন্ন মনে করবে, তাকে ও তাদেরকে সে প্রাণ দিয়েও সমর্থন করে যাবে। বাকিদের প্রতি সে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। তাদের বিনাশই তার কাম্য।

এই আদিমভাব সম্পন্ন মনটিকেই যারা একমাত্র পছন্দ ক'রে থাকে, তাদের মনও সমানুরূপ আদিম অবস্থায় রয়েছে। তাদের সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেনি এখনও। চারিপাশে একটু পর্যবেক্ষণ করলেই এমন মানুষ বহু দেখতে পাওয়া যাবে।

## মন-আমি

(মহর্ষি মহামানস-এর অধ্যাত্ম-মনোবিজ্ঞান হতে গৃহীত)

মানব ধর্ম— 'মহাধর্ম' এবং মহাধর্মের অনুশীলনীয় পর্ব 'মহামনন' —আত্ম- বিকাশ বা মনোবিকাশ কার্যক্রমকে ভালোভাবে বুঝতে হলে, আমাদের 'মন' সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক। 'মন' হলো— অনেকাংশে কম্পিউটার সফটওয়ারের মতো প্রায় বর্ণনাতীত –সাধারণের পক্ষে প্রায় বোধাতীত এক অতি সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। মন-সফটওয়ার ও শরীর (হার্ডওয়ার), —এদের মাঝে একটি প্রাথমিক জৈব সফটওয়ার বা ভিত্তিমন সফটওয়ার আছে। এই প্রাথমিক জৈব সফটওয়ার-এর মাধ্যমেই শরীর যন্ত্রের যাবতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকলাপাদি তথা সহজ-প্রবৃত্তিজাত কার্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে।

শরীরকে ভিত্তি করেই এই জৈব সফটওয়ার তৈরী হয়েছে। আর, শরীরসহ এই প্রাথমিক জৈব সফটওয়ারের ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছে— মন-সফটওয়ার।

প্রাথমিক জৈব সফটওয়ার বা ভিত্তিমন সফটওয়ার এবং মন-সফটওয়ার, — উভয়েরই স্বতন্ত্র অবয়ব আছে। এই অবয়ব আমাদের বর্তমান চেতন-স্তরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। উচ্চতর চেতনস্তরের মন এই অবয়ব উপলব্ধি করতে সক্ষম। অন্যান্য সমস্ত অস্তিত্বশীলদের মতই উভয় সফটওয়ারেরই আছে অশরীরী দিব্য অস্তিত্ব (দ্রষ্টব্যঃ Super-existence)। একেই অনেকে আত্মা বলে থাকেন। কিন্তু, সমগ্র মন-অস্তিত্বই হলো— আত্মা। সে দেহযুক্তই হোক আর দেহাতীতই হোক (দ্রষ্টব্যঃ আত্মা)।

প্রাথমিক জৈব সফটওয়ার এবং মন-সফটওয়ার— উভয়েরই নিজস্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকলেও, কেউই পুরোপুরি স্বাধীন নয়। একে অপরের উপর, এবং শরীরসহ বহীর্জাগতিক বিষয়-বস্তুর উপর উভয় জৈব সফটওয়ারই কম-বেশি নির্ভরশীল। আবার, শরীরসহ বহীর্জাগতিক বিষয়-বস্তুর উপরেও এরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। মানসিক কার্যকলাপ এবং শারীরীক কার্যকলাপ (যা প্রাথমিক জৈব সফটওয়ার দ্বারা পরিচালিত অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকলাপ) একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে পরস্পর সহযোগী হয়ে কাজ ক'রে থাকে। এর পিছনে রয়েছে— জগতব্যাপী পরম্পরাগত অজস্র কার্য-কারণ স্বরূপ অসংখ্য ঘটনার সম্মিলিত ঘটনাপ্রবাহ। শরীর ও মনের ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-কান্ডগুলি হলো— জগতব্যাপী পরম্পরাগত অজস্র ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে প্রসুত ফল, এবং সেই সম্মিলিত ঘটনা প্রবাহেরই অংশ, যা আরো অনেক ঘটনার জন্মদাতা (দ্রষ্টব্যঃ ভাগ্য)।

ক্রমবিকাশমান পদ্মের মতই, সমগ্র মন— একের পর এক ক্রমোচ্চ স্তরে ক্রমশ বিকশিত হয়ে থাকে। বিকাশের প্রতিটি চেতন-স্তরে মনের এক এক প্রকার রূপ—গঠণ—কার্যকলাপ। অস্ফূট-চেতন-স্তর থেকে পূর্ণ-চেতন-স্তর অভিমুখে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে তুচ্ছ লক্ষ্য থেকে উচ্চ লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলা (এ'নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'মহাবাদ' গ্রন্থে)।

তবে, শরীর থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অথবা স্বয়ংসম্ভুত হয়ে— মনের সৃষ্টি হয়নি। কম্পিউটার সফটওয়ারের মতো— মন-সফটওয়ারেরও স্রষ্টা আছে। প্রোগ্রামার— ডেভলপার আছে। প্রাথমিক জৈব সফটওয়ারসহ মন-সফটওয়ার এবং শরীরযন্ত্র তৈরী হয়েছে— ঈশ্বর দ্বারা, —ঈশ্বরের মন ও শরীর উপাদান থেকে। এই মহা বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডরূপ শরীর আর মহা বিশ্ব-মন নিয়েই হলো— ঈশ্বর অস্তিত্ব।

চেতনা হলো— শরীর ও মনের অনুভব—সংবেদন—বোধ করার ক্ষমতা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষমতা, কোনো কিছু সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার, বিচার-বিবেচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, শরীর ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, কল্পনা—উদ্ভাবন—সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার শক্তি ও ক্ষমতা স্বরূপ।

বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডস্বরূপ ঈশ্বর শরীরের সমস্ত কার্যকলাপ— ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই ঈশ্বর-মন ও ঈশ্বর-চেতনার প্রকাশ। আর, জীব 'আমি' হলো— সেই দিব্য-চেতন-মন-সিন্ধুর এক একটি বিন্দু স্বরূপ। ঈশ্বর-শরীরের অসংখ্য কোষের মধ্যে এক একটি কোষ সম। তবে, অন্যান্য কোষের সাথে এর একটু পার্থক্য আছে। জীব হলো— ঈশ্বর উপাদানে— ঈশ্বর সৃষ্ট জৈব কোষ।

এই মানব-চেতন-স্তরে— দুটি সক্রিয় মন নিয়ে আমাদের মনোজগত। একটি হলো— অবচেতন মন, যে অধিক অংশেই বিকশিত ও সক্রিয়। আর অপরটি হলো— সচেতন মন, যে স্বল্পাংশে বিকশিত ও সক্রিয়। এই সচেতন

মনের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলে, তবেই আমরা মানবোত্তর উচ্চ-চেতন-স্তরে উপনিত হবো। অবচেতন মন হলো— যুক্তি বিহীন আবেগপ্রবণ অন্ধ-বিশ্বাসী মন। সারা দিন-রাতের অধিকাংশ চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা ও কর্মের পিছনে আছে এই মন। আর, সচেতন মন হলো— যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষনসহ সত্যপ্রিয় মন। অবচেতন মনের কাজকর্মকে যুক্তি-বিচার-সতর্কতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিচালনা করাই এর কাজ। কিন্তু, অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই এই মনটি খুব সামান্য পরিমানে বিকশিত ও জাগ্রত, এবং অধিকাংশ সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকায়, তাদের সচেতন মন যুক্তি-বিচারের মাধ্যমে অবচেতন মনকে সবসময় যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে সক্ষম হয়না।

যে নিজেকে 'আমি' বলছে, সেতো আসলে 'মন'-ই! তবে, কখনো অবচেতন-মন নিজেকে 'আমি' বলছে, আবার কখনো সচেতন-মন (মানব-চেতন-মন) নিজেকে 'আমি' বলছে। একে অপরকে দাবিয়ে রাখার আমিত্বের লড়াই চলছে— প্রায় সর্বক্ষণ। বেশিরভাগ সময়ে সবল অবচেতন-মন-ই জিতছে এই লড়াইয়ে। তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বল্প-বিকশিত দুর্বল সচেতন-মন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কখনো কখনো।

অদৃশ্য এই মনদুটিকে যদি মূর্তরূপে দেখতে চান, তাহলে প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনার বাইরে গিয়ে— মাকালী্র সেই ছবিটাকে মানসপটে অবলোকন করুন, যার পদতলে শিব শায়িত রয়েছে। এখানে, রণোন্মত্ত কালীই হলো অবচেতন মন। আর, তন্দ্রাচ্ছন্ন শায়িত শিব হলো সচেতন মন।

প্রত্যেক (চেতন স্তরের) মনের নিজস্ব স্মৃতি ভান্ডার আছে।অবচেতন মনের স্মৃতিচারণের সময় যদি সচেতন মন সজাগ থাকে, এবং আগ্রহী থাকে, তবেই সচেতন মন সেই স্মৃতি গ্রহন করতে এবং তার স্মৃতি-ভান্ডারে সঞ্চয় করতে পারবে। অবচেতন মন প্রায় সব সময়েই সজাগ থাকায়-- সে আগ্রহী হলে, সচেতন মনের স্মৃতি গ্রহন করতে সক্ষম।

সচেতন-মনের শাসনাধীনে থাকতে অবচেতন-মনের মোটেই ভালো লাগেনা। তবু নিরুপায় হয়ে থাকতে হয় তাকে। আমাদের নিদ্রাকালে, সচেতন-মন যখন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিদ্রিত হয়ে পড়ে, তখন বেশকিছু সময়ের জন্য অবচেতন-মন স্বপ্নরূপ কল্পনার পাখা মেলে দিয়ে— সম্পূর্ণতঃ বা অনেকাংশে স্বাধীনতা উপভোগ ক'রে থাকে। আমরা জাগ্রত থাকাকালেও, সচেতন-মনের তন্দ্রাচ্ছন্ন বা ঝিমুনো অবস্থায়, অথবা তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবচেতন-মন নিজের খেয়াল-খুশিমতো কল্পনার জগতে অথবা বাস্তব জগতে অনেক কান্ডই ঘটিয়ে থাকে।

সচেতন মনের শাসন ব্যবস্থায় প্রায়শই অবচেতন মনের কোনো না কোনো ইচ্ছা বা চাহিদার অবদমন ঘটে চলেছে। এর ফলে, সুপ্ত থাকা হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ, নিষ্ঠুরতাগুলি সুযোগ পেলেই মাথাচারা দিয়ে উঠছে।

মন নিয়ে আরো দু-চার কথা:
অস্থির মনকে স্থির-একাগ্র-শান্ত ক'রে তোলার উপায়--- বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি 'ধ্যান : আত্মসম্মোহন : যোগনিদ্রা' অধ্যায় গুলিতে। এখানে এখনো প্রকাশিত হয়নি।

এখানে এখন শুধু মনের স্বভাব--- আচরণ নিয়ে দু-চার কথা বলি: মনের যে অস্থিরতা আমরা উপলব্ধি করি, এই অস্থিরভাব আছে শুধু অবচেতন বা প্রাক-মানব-চেতন মনে। সচেতন মন অস্থির নয়। সে নিদ্রালু। তন্দ্রাচ্ছন্নতা হলো তার বর্তমান স্বভাব।

ধর্মভাবের বাইরে গিয়ে, কালী ও শিবের ছবিটি স্মরণ করো, এটাই হলো অবচেতন ও সচেতন মনের মূর্ত রূপ। সচেতন মন অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই এখনো পর্যন্ত খুব অল্প বিকশিত। অধিকাংশ সময়েই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। মাঝে মাঝে একটু সজাগ হয়ে যখনই সে অবচেতন মনের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখনই অবচেতন মন সাময়িকভাবে সতর্ক হয়ে স্থির থাকে। ধরাপরার ভয়ে বা লজ্জায় জিভ কাটতেও পারে। আবার সচেতন মন অচিরেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেই --- অবচেতন মন তার লীলাখেলা শুরু ক'রে দেয়।

এই মন দুটিকে বুঝতে, আরো একটি চিত্রকল্প: ভাবুন, গ্রীষ্মের দুপুরে পরিশ্রান্ত মা তার দুরন্ত ছেলেটিকে নিয়ে শুয়ে আছে। ছেলে কিন্তু চোখ বুঁজে মটকা মেরে শুয়ে আছে। তার চোখ পিটপিট করছে। মা একটু চোখ বুঁজতে না বুঁজতেই, দামাল ছেলের দুরন্তপনা শুরু হয়ে যায়! এই হলো অবচেতন মন।

মন সর্বদাই নিজের ক্রিয়াশীল অস্তিত্ব বজায় রাখতে--- কোনো না কোনো বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকে। মানস ক্রিয়াই হলো মন-অস্তিত্বের লক্ষণ বা নিদর্শন। অস্থির মন--- এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে, এইভাবে সে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ ক'রে থাকে। মনকে প্রয়োজনমতো এক বিষয়ে ধরে রাখতে চাইলে, বিশেষ কিছু পদ্ধতি অভ্যাস করতে হয়। আর তার সাথে শরীর ও মন সুস্থ ক'রে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

মন--- নিজেকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্থির ও শান্ত হয়ে ওঠে। একেই বলে, আত্ম-ধ্যান। আত্ম-ধ্যানের মধ্য দিয়েই--- আত্মোপলব্ধী--- আত্মজ্ঞান--- আত্মশক্তি লাভ হয়ে থাকে। কোনো উপায়ে যেকোনো একটা বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে--- তার অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীভূত হতে পারলে, তখন মন সেই বিষয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা তথ্য---তত্ব ও সত্যকে উন্মোচিত ক'রে, তার সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

কোনো স্থির বিষয়-বস্তু বা বিন্দুতে, অথবা কোনো একঘেয়ে সচল কিছুতে— সচেতন মন বেশিক্ষণ স্থির-একাগ্র হয়ে থাকতে পারে না। তার দুর্বলতার কারণে সে অচিরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, এবং অবচেতন মন তার পছন্দের কর্মে— কল্পনা ও স্মৃতি চারণা এসবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তবে কোনোভাবে সচেতন মন এবং অবচেতন মন উভয়ই যদি 'হিপ্নোটিক-স্টেট'-এ চলে আসে, তখন উভয় মনই স্থির-অচঞ্চল ও অসার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ধ্যানাবস্থা, আত্ম-সম্মোহন ও 'হিপ্নোটিক-স্টেট' হলো মনের এক বিশেষ অবস্থা— অস্বাভাবিক অবস্থা। এ'নিয়ে ধ্যান ও আত্ম-সম্মোহন প্রসঙ্গে 'মহাবাদ' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

মনের অসুস্থ অবস্থায়, অসুস্থতার রকমভেদে, সচেতন মন আরো বেশি দুর্বল ও তন্দ্রাচ্ছন্ন, অথবা গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে যেতে পারে। আর, অবচেতন মন— হতেপারে, আরো অস্থির— উত্তেজিত, বিকারগ্রস্ত, অথবা হতোদ্যম— বিষন্ন, নিরুৎসাহ, হতাশ বা শোকাহত। অবচেতন মনের অসুস্থ— বিকারগ্রস্ত অবস্থায়, সচেতন মন গভীর সুষুপ্তির মধ্যে ডুবে গিয়ে— প্রায় অনুপস্থিত অথবা একেবারেই অনুপস্থিত হয়ে থাকলে, ব্যক্তি উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন অবচেতন মনকে নিয়ন্ত্রন করার মতো কেউ থাকেনা সেখানে।

আশাকরি, মনের গুরুত্ব, বিশেষকরে আমাদের জীবনে সচেতন মনের গুরুত্ব অনেকটাই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

আরেকটি কথা, সচেতন মন--- কোনোকিছুর সঙ্গে মনোযুক্ত হলে, তখন অবচেতন মন আগ্রহের সাথেই হোক আর বাধ্য হয়েই হোক, সেও সেই বিষয়-বস্তুর সাথে যুক্ত হয়। এবার, সেই বিষয়-বস্তু যদি স্থির বা একঘেয়ে কিছু

হয়, অথবা তার আগ্রহের কিছু না হয়, তখন অবচেতন মন চেষ্টা করে--- সেই বিষয়-বস্তু থেকে নিজেকে এবং সচেতন মনকেও বিচ্ছিন্ন করে--- তার নিজের (কল্পনার) জগতে ফিরে আসতে। আর, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে একাজে সফল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুরু হচ্ছে~ মহামনন ধ্যান এর তথ্য ও তত্ব সহ ব্যাবোহারিক অনুশীলন। দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথমে প্রাণযোগ বা সহজ প্রাণায়াম সম্পর্কে বলবো।

মেরুদণ্ড সোজা রেখে, চোখ বুঁজে— চুপ কোরে বোসো। ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করো। শ্বাস গ্রহণের সময় মনে মনে বলো— 'মহা প্রাণশক্তি'। ধারণা করো~ মহাজাগতিক মহা-প্রাণশক্তি তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করছে। এবং তা' মস্তিষ্ক থেকে ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস ধারণ করো, এবং মনে মনে বলো— 'আমি সুস্থ, সুন্দর, পবিত্র, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত, সুস্থ- স্বাস্থ্যবান, সক্রিয়-শক্তিমান। আমি সমস্ত ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চিন্তা ও প্রভাব থেকে মুক্ত। আমি ধনাত্মক বা পজেটিভ শক্তিতে ভরপুর। আমি সৌভাগ্যবান।

প্রয়োজনে কথাগুলো পুনরায় বলতে পারো। তারপরে, খুব ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করো। শ্বাস ত্যাগ করার সময় মনে মনে বলো— ' আমি শুভময়, শান্তিময়, মঙ্গলময়, ধনময় বা পজেটিভ, সৌভাগ্যময়। আমি সুস্থ— সুস্থ— সুস্থ। আমার ভিতরে ও বাহিরে ধনাত্মক বা পজেটিভ শক্তি বিরাজ করছে। 'শ্বাস ত্যাগ করার পরে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য শূন্য অবস্থায় থাকো। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই না করে থাকো। এই সময় মনে মনে বলো— আমি শান্তিপূর্ণ। শান্তি~ শান্তি~ শান্তি~।

প্রাণযোগ অভ্যাসের সময় মনকে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে মনোযুক্ত রাখো। এইরূপে পাঁচবার করার পরে, একটু বিশ্রাম নিয়ে, আবার প্রাণযোগ অভ্যাস করো, এবার মনে মনে কোনো কথা না বলে, ছড়িয়ে থাকা মনকে বা মনের ফোকাসকে, শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কপালের বা ভ্রু যুগলের মাঝখানে কেন্দ্রীভূত করো। এবং শ্বাস ছাড়ার সময়েও ওখানেই মনকে স্থির নিবদ্ধো রাখো। এবং অনুভব করো তুমি পজেটিভ শক্তির আধার হয়ে উঠেছো।

প্রথম পর্যায়ে, ভ্রু যুগলের মধ্যে অথবা কপালের মাঝখানে মনোসংযোগ করলেও, পরবর্তীতে যেতে হবে আরও গভীরে। আমির কেন্দ্রে অর্থাৎ স্ব-বোধ -এর জায়গাটি হলো~ উপরোক্ত স্থানের কিছুটা গভীরে, দুটি কানের মধ্যবর্তী একটি স্থান।

প্রাণযোগ অভ্যাসের পরে, কিছুক্ষণ স্ব-বোধে স্থিত হয়ে, ধ্যানস্থ থাকতে হয়। তখন সমস্ত মনোযোগ থাকবে ঐ স্থানটিতে, অর্থাৎ নিজের বা নিজের মনের উপর।

আরেকটি কথা, ভরা পেটে প্রাণযোগ অভ্যাস করা নিষেধ। প্রাণযোগ অভ্যাসের পক্ষে ভোর বেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা হলো সবচাইতে ভালো সময়।

মহামনন ধ্যান-যোগ অভ্যাসের পূর্বে 'প্রাণযোগ' অভ্যাস এর পিছনে বিজ্ঞান:
বিশেষ ভাবে ধ্যান করা ছাড়াও, মনোযোগ সহকারে কোন কিছু করা, পড়া বা শোনার সময় আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। মনোযোগ যত বেশি গভীর ও কেন্দ্রীভূত হবে, শ্বাস-প্রশ্বাস ততই ক্ষীণ হতে থাকবে। এদিকে আবার, মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখতে~ যথাযথ ভাবে মনন ক্রিয়া করার জন্য, মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেনের প্রয়োজন। আর প্রয়োজন হয় জলের। এই দুটির অভাব হলেই মস্তিষ্ক তার কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমনকি সে অচল হয়েও পড়তে পারে।

ধ্যান-যোগ অভ্যাস কালে ধ্যানের গভীরতা যত বৃদ্ধি পাবে, ধ্যানীর শ্বাসক্রিয়া ততবেশি ক্ষীণ হতে থাকবে। আর মস্তিষ্কের ক্রিয়াও ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকবে।

মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতি যাতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তাকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়ে থাকে, প্রাণযোগ অভ্যাসের মাধ্যমে। এছাড়াও, শরীরকে টক্সিন বা রোগবিষ থেকে মুক্ত করতে, অক্সিজেনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

প্রাণযোগ অভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের প্রাণশক্তির বৃদ্ধি ঘোটে থাকে। আমাদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের যোগ রয়েছে। আমাদের মন তথা চিন্তা-ভাবনা যখন অসুস্থ এবং বিশৃঙ্খল থাকে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস তার ছন্দ হারিয়ে ফেলে। প্রাণযোগের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস তার ছন্দ ফিরে পেলে, মন ও তার চিন্তা-ভাবনাও ছন্দে ফিরে আসে।

নিয়মিত প্রাণযোগ অভ্যাসের দ্বারা মানসিক চাপ, উদ্বেগ, উৎকন্ঠা, ভীতি, শোক, দুঃখ, অশান্তি, হতাশা, অবসাদ প্রভৃতি সমস্ত ঋণাত্মকভাব ক্রমশ দূর হয়ে যায়। যোগী প্রাণ শক্তিতে ভরপুর হোয়ে ওঠে। মানসিক সুস্থতা, শৃঙ্খলা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমশ। মানসিক অসুস্থতার কারণে যে সমস্ত শারীরিক সমস্যা ঘোটে থাকে, সেগুলোও আস্তে আস্তে দূর হয়ে যায়।

সঠিকভাবে প্রাণযোগ অভ্যাসের মাধ্যমে, যোগীর মনের চঞ্চলতা কমে গিয়ে, তার মন স্থির একাগ্র হোয়ে ওঠে। তার কাজের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমশ।

ধ্যান অনেক প্রকার, 'মহামনন' আত্ম-ধ্যানের সময় আমাদের মন ও মস্তিষ্ক ক্রিয়া রহিত হয়ে যায় না। বরং সেই সময় সচেতন মন যথেষ্ট সজাগ থাকে, এবং সচেতন মনের বিকাশ ঘটতে থাকে তখন। এই কারণেই যোগ অভ্যাসের পূর্বে ও পরে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা উচিত।

'মহা প্রাণযোগ' শেখানো হয় পূর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম এর ক্লাসে।

এখানে আর একটি কথা, ধ্যানের জন্য মন ও মস্তিষ্কের শিথিলতা এবং মেরুদন্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের নমনীয়তা প্রয়োজন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই শিথিলতা এবং নমনীয়তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তাই, মেরুদণ্ডের নমনীয়তা লাভ করতে, কিছু ব্যায়াম করতে হবে। আর, মন ও মস্তিষ্ক সহ স্নায়ুতন্ত্রের শিথিলতা লাভ করতে, সুষুপ্তি-যোগ অভ্যাস করতে হবে।

'প্রাণযোগ-কে অক্সিজেন থেরাপীও বলা যেতে পারে। নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়ে আমরা মোটামুটি ২০ ভাগ অক্সিজেন গ্রহন কোরে থাকি। এবং ত্যাগ করি ১৫ ভাগ অক্সিজেন। মাত্র ৫ ভাগ অক্সিজেন আমাদের রক্তে শোষিত হয়ে থাকে। অসুস্থ মানুষ ঐ ৫ ভাগ অক্সিজেন শোষন করতেও সক্ষম হয়না। প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ঘাটতিই বহু অসুস্থতার কারণ। প্রাণোযোগ অভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের অক্সিজেন গ্রহণ ও  শোষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

সুষুপ্তি যোগ (মহা-শবাসন)

মহা-শবাসন : তদবিষয়ক আলোচনা ও নির্দেশ

সুপরিকল্পিত ভাবে আত্মবিকাশের জন্য যোগাভ্যাস করা প্রয়োজন। 'যোগ' অর্থে মিলন। দেহের সাথে মনের, বহির্মনের সাথে অন্তর্মনের, বহির্জগতের সাথে অন্তর্জগতের মিলন, মহাপ্রাণের সাথে ক্ষুদ্র প্রাণের মিলন। এই যোগপ্রক্রিয়া ভালভাবে আয়ত্ত করতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও থাকা আবশ্যক। থাকতে হবে আকঙ্খা- প্রত্যাশা, প্রত্যয়, একাগ্রতা, সংবেদনশীলতা বা অনুভূতিপ্রবণতা, আর চাই শিথিল হওয়ার সক্ষমতা বা 'রিল্যাক্সিবিলিটি'। যথেষ্ট শিথিল হতে না পারলে, যোগে বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয়। তাই, ‘আত্মবিকাশযোগ’ ও ‘মহামানস যোগ' শিক্ষার প্রথম পাঠই হলো— সুষুপ্তি-যোগ বা মহা-শবাসন।

যোগাসন অভ্যাসের সময় তোমরা অনেকেই শবাসন অভ্যাস করেছ। 'শব' অর্থাৎ মৃতের ন্যায় আসনই হলো— শবাসন। কিন্তু হাত-পা ছড়িয়ে, চিৎ হয়ে শুলেই যথেষ্ট শিথিলতা আসেনা। দেহ-মনের পুরোপুরি শিথিলতা আনতে সুপরিকল্পিত পথে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। যোগনিদ্রার গভীরে ডুবে যেতে হলে, যোগনিদ্রার বিস্ময়কর ফল লাভ করতে চাইলে, শৈথিল্য লাভ করতে শিক্ষতে হবে প্রথমেই। আসলে, সুষুপ্তি-যোগ বা মহা-শবাসন বা গভীর ‘রিল্যাক্সেশন'-এর পরবর্তী গভীর স্তরই হলো— যোগনিদ্রা। আবার যোগনিদ্রা থেকে আরও অনেক গভীরে পৌঁছালে ভাব-সমাধি স্তর। একই পথ, শুধু গভীরতার পার্থক্য। সমাধিলাভ সবার পক্ষে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা (শরীর-মন-ইন্দ্রিয়ের সামর্থ) সবার থাকেনা। তীব্র আকাঙ্খা, শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস, আস্থা, প্রত্যয়, একাগ্রতা, অনুভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা ও শিথিল হওয়ার যোগ্যতা -এগুলি অত্যন্ত অধিক মাত্রায় থাকলে, তবেই ভাবাবিষ্ট হয়ে সমাধিস্তরে পৌঁছানো সম্ভব। তবে, সুষুপ্তি-যোগ বা

মহাশবাসন -এর জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তা' অনেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত গুরু বা পথপ্রদর্শক, -যে যোগনিদ্রায় সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করবে।

কারো কারো মধ্যে সমাধি সম্পর্কে বিশেষ কৌতুহল কাজ করে, কিন্তু, সমাধি স্তরে পৌছে সবার পক্ষেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। নেই। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সেখানে আছে শুধু নিঃসীম অন্ধকার অথবা অগাধ শূন্যতা পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা। এ সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'যোগনিদ্রা' ও 'মহা-আত্মবিকাশ-যোগের' দ্বিতীয় ভাগে এবং 'মহামানস যোগ' অধ্যায়ে।

এখন বলি। কিভাবে এই সুষুপ্তি-যোগ বা মহাশবাসন-এর অডিও সিডি-র মাধ্যমে মহাশবাসন অভ্যাস করবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, যেখানে কোনো বিরক্তিকর ও উত্তেজনাকর শব্দ নেই, কোনো অবাঞ্ছিত বা কোনোরূপ বিঘ্নকারী কেউ বা কিছু থাকবে না, এমনই নির্মল নিরালা- নিরাপদ পরিবেশ মহাশবাসন অভ্যাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। নিজের শোবার ঘরেও অভ্যাস করতে পারাযাবে। দরজা-জানালা বন্ধ করে, এমন ব্যবস্থা করবে-- যাতে কেউ তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটায়। ঘরের পরিবেশ আরও উপযোগী করে তুলতে, মৃদু নীল আলো এবং প্রশান্তিকর হালকা সুগন্ধময় ধূপের ব্যবহার করতে পারো। চন্দন ধূপবাতি হলেই ভালো হয়।

হালকা ও ঢিলাঢালা পোষাক পরে আরামদায়ক বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো। হাত দুটি সরলভাবে দেহের দু-পাশে শিথিল করে রেখে দাও। হাতের তালু উপর দিকে অর্থাৎ চিৎ করে রাখলে ভলো হয়। তার আগেই সিডি বা ডিভিডি প্লেয়ারে মহাশবাসনের সিডি-টিকে সেট করে, শ্রুতি-সুখকর করতে, ভল্যুম এডজাস্ট করে, এমন ভাবে প্রস্তুত রাখবে- যেন, শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে 'সুইচ অন-অফ' করা যায়। এবার প্লেয়ার চালু করে-- আবার পূর্বের অবস্থায় হাত রেখে চোখ বন্ধ করে নাও। মন দিয়ে সিডি প্লেয়ারের কথাগুলি শুনতে থাকো এবং ক্রমশঃ হাত-পা সহ সমস্ত শরীরকে শিথিল করে দাও, এলিয়ে দাও মিশিয়ে দাও বিছানার সাথে।

মহাশবাসন অভ্যাস করতে করতে ক্রমশঃ বোধ হবে--- যেন, শরীর নেই-- মন নেই, জগৎ সংসার কিছুই নেই, আছে শুধুমাত্র একটি চেতন সত্তা। --খুব আরামদায়ক বিশ্রামের মধ্যে ডুবে যাচ্ছো তুমি, তলিয়ে যাচ্ছো গভীর অন্ধকারের মধ্যে।

*শিথিল হওয়া বা শৈথিল্য লাভ হলো- বিষয়মুক্ত হওয়ার এক অতি সহজ উপায়। শিথিল হওয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়মুক্ত হয়ে, অতি সহজেই 'ট্রান্স'-এর মধ্যে ডুবে গিয়ে আকাঙ্খিত বিষয়ের সাথে যোগ ঘটানোই সুষুপ্তি-যোগ ও যোগনিদ্রার উদ্দেশ্য।

কিছুদিন অভ্যাস করলেই তুমি তোমার শরীর ও মনের এক শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে। আস্তে আস্তে অনুভব করতে পারবে, তোমার মানসিক উন্নতি ও শারীরিক সুস্থতা। প্রথমদিকে প্রতিদিন একবার করে অভ্যাস করবে। পরে দু-একদিন অন্তর দুপুরে বা রাতে তোমার সুবিধামতো যে কোনো সময় অভ্যাস করবে। বিশ্রামের সময়ই হলো উপযুক্ত সময়। যখন কোনোরূপ বহির্মূখীনতা থাকবে না, থাকবে না খিদে-তৃষ্ণা বা কোনো কাজের তাড়া। ২৫-৩০ দিন বা তারও বেশী দিন অভ্যাসের পর, যখন দেখবে, তুমি খুব ভালোভাবে 'রিল্যাক্সড়' বা শিথিল হতে পারছো, তখন 'মহা-যোগনিদ্রা' অভ্যাস করতে শুরু করবে। এই সময় কেউ যাতে কিছুমাত্র বিরক্ত বা স্পর্শ না করে, তারজন্য পূর্বেই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। মনেরেখ, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এখন, যারা বেশ কিছুদিন অভ্যাস করেও বিশেষ 'রিল্যাক্সড় হতে পারছো না, বুঝতে হবে। কোনো না কোনো বিশেষ অসুখে ভুগছো, অথবা জন্মগত কোন স্নায়বিক ত্রুটি আছে। সেক্ষেত্রে, এই অসুবিধা কাটানোর জন্য

হোমিওপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে দেখতে পারো। এছাড়া, 'হঠযোগ' এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক চিকিৎসার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। এখানে আমি কয়েকটি প্রাথমিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করছি— ১) ভরপেট ভাত খেলে শরীর আপনা থেকেই কিছুটা শিথিল হয়ে যায়। এই সময় 'শবাসন' অভ্যাস করে দেখতে পারো। ২) সকাল-বিকাল দু-বেলা আসন ও ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের পরে শবাসন অভ্যাস করা যেতে পারে। ৩) যাদের ভালো ঘুম হয় না, তারা হোমিওপ্যাথির সাহায্য নিতে পারো। এছাড়া, সুশুনি শাক, জটামাংসী ভেজানো দু-চামচ জল, 'প্যাসিফ্লোরা -মাদারটিঞ্চার', 'রাউলফিয়া সাপেন্টিনা -মাদারটিঞ্চার', -এগুলি চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবহার করে দেখতে পারো। তবে এলোপ্যাথিক 'সিডেটিভ' বা 'ট্রাঙ্কুইলাইজার' বা ঘুমের ওষুধ অথবা কোনো 'ড্রাগ' নিয়ে শবাসন অভ্যাস করবে না। বিশেষ কোনো স্নায়বিক বা মানসিক অসুস্থতা থাকলে চিকিৎসকের অনুমতি পরামর্শ এবং বিশেষজ্ঞ মনস্তত্ববিদ-এর উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে মহা-শবাসন ও মহা-যোগনিদ্রা অভ্যাস করা কর্তব্য।

সবশেষে আরও কিছু জরুরী কথা, -এই অডিও সিডি-গুলির অপব্যবহার যেন কোনোমতেই না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। আত্মবিকাশ--- ধ্যান, যোগ প্রভৃতি সাধনার বিষয়। অকারণে- অসময়ে পূর্বনির্দেশিত ব্যবস্থা ছাড়া, এই সিডি চালানো নিষেধ। এতে নিজেরই ক্ষতি হবে। মন খুব সূক্ষ্ম জিনিস, তা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের কাছে, হাল্কা পরিবেশে নিজেকে জাহির করার জন্য অথবা নিছক কারো কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য এর ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ। বিশেষ প্রয়োজনে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি ও শিক্ষা আছে যার, তেমন ব্যক্তিকেই পূর্বে এই নির্দেশিকা পাঠ করতে দিয়ে তারপর পূর্ব-নির্দেশিত পরিবেশে তাকে শোনানো যেতে পারে।

সাধারণভাবে, পূর্ব-নির্দেশিত ব্যবস্থা ছাড়াই এই সিডির ব্যঞ্জনাপূর্ণ ব্যবহারিক কার্যকর সাজেশন গুলি শুনলে, কোনো ফল লাভ হবে না, কোনো ক্রিয়াই অনুভূত হবে না। সিডির প্র্যাকটিকাল অংশ শোনা এবং কাউকে শোনানোর পূর্বে এই প্রবন্ধ পাঠ করা অত্যাবশ্যক, তবে কাউকে বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে জানিয়ে তারপরে তাকে শোনানো যেতে পারে।

এই 'সিডি' 'কপি' করে অপরকে দেওয়া শুধুমাত্র আইনত: অপরাধই নয়, এর ফলে আধ্যাত্মিক বা মানসিক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। উপকার পেলে প্রচার করতে আপত্তি নেই। আগ্রহীগণকে সরাসরি 'মহা-আত্মবিকাশ কেন্দ্র'-এর সাথে যোগাযোগ করতে বলবে। আমাদের ওয়েবসাইটেও আসতে পারো। প্রচারের সময় কখনোই ফেনিয়ে-ফাপিয়ে কিছু বলবে না। যা সত্য তা-ই বলবে। মহাআত্মবিকাশ কার্যক্রমে যে সমস্ত যোগ-প্রক্রিয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে, প্রাচীন যোগশাস্ত্রে উল্লেখিত দুরুহ বিধি-নিয়ম-পদ্ধতির সাথে এর অনেকাংশেই মিল নেই। 'মহামানস মন্ডলের' যোগসাধনা- প্রচলিত যোগ-প্রক্রিয়া থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র।

আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধ'রে, অনেক গবেষনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে, সহজ-সরলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে- এই 'মহা-আত্মবিকাশ-যোগ কার্যক্রম'।

আত্মবিকাশ- আত্মজ্ঞান, আত্মচেতনার বিকাশ, আত্মশক্তির বিকাশ। -যার দ্বারা আত্মিক এবং জাগতিক বিষয়-বস্তু ও ঘটনাগুলিকে আরও ভালোভাবে আরও বেশী করে অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় এবং তাদের মধ্যেকার তথ্য ও তত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান জন্মায়। -যার মধ্য দিয়ে জাগতিক বিষয়-বস্তু - ঘটনাগুলির উপর এবং নিজের উপর ক্রমশ নিয়ন্ত্রণলাভে সক্ষম হয়ে ওঠে মানুষ। নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, নিজেকে জানা, নিজের অতীতকে জানা, ভবিষ্যত লক্ষ্যকে জানার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলতে সক্ষম হয় সে তখন।

জগৎকে আরও বেশী আরও ভালভাবে ভোগ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে সে, একজন প্রকৃত সফল ও সৌভাগ্যবান মানুষ হয়ে উঠতে পারে সে মহা-আত্মবিকাশ-যোগ-এর মধ্য দিয়ে।

ফ্রি অডিও ফাইল-এর জন্য এই লিঙ্ক ফলো করো—
https://drive.google.com/file/d/1mIHZvuFL23O9MVrnM4DpkBvW0mYdiLFr/view

## মন-আমি যোগ

'মন-আমি-যোগ' হলো অবচেতন মনের সঙ্গে সচেতন মনের যোগ সাধন। আমাদের মধ্যে সক্রিয় দুটি মন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করার সাথে সাথে, অবচেতন মনের উপর ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ লাভ করো।

অবসর সময়ে চোখ বুঁজে শুয়ে বা বসে, মন দিয়ে শোনো এবং বিবরণ অনুসারে কল্পনা করো।
ফ্রি অডিও ফাইল-এর জন্য এই লিঙ্ক ফলো করো—
https://drive.google.com/file/d/1mIHZvuFL23O9MVrnM4DpkBvW0mYdiLFr/view

## ।। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ধ্যান ।।

### সংগীতের মাধ্যমে 'মহামনন' ধ্যান

'সঙ্গীত সহযোগে ধ্যান' হলো একটা খুব সহজ এবং ফলপ্রসূ ধ্যান পদ্ধতি। প্রথমে গানটি কাগজে লিখে নাও। তারপর--- আমার সঙ্গে অথবা রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটিকে কন্ঠস্থ করে নাও। তারপর নিজেই গাইতে থাকো। কয়েকজন মিলে সংঘবদ্ধ হয়েও, এই ধ্যান অভ্যাস করতে পারো। ধ্যান-সংগীত গাওয়ার সময় হেলেদুলে--- মাথা দুলিয়ে, হাত তুলে, অথবা হাতে তালি দিয়ে--- মাতোয়ারা হয়ে গান গাইতে থাকো।

গানটি কে বারবার **(repeatedly)** গাওয়ার সাথে সাথে--- ক্রমশ লয় বা গতি বাড়িয়ে দাও। অর্থাৎ ক্রমশ দ্রুতগতিতে গান গাইতে থাকো। কিছুক্ষণ গাওয়ার পরে, যখন দেখবে বেশ ঘোরলাগা মতো অবস্থা হয়ে এসেছে, তখন গান গাওয়া বন্ধ করে চোখ বুঁজে স্ব-বোধে স্থিত হয়ে, ধ্যানের গভীরে ডুবে যাও। সমস্ত ফোকাস থাকবে মস্তিষ্কের ঠিক মাঝখানে। আস্তে আস্তে এক চিন্তাশূন্য অবস্থায় চলে যাও তুমি। যতক্ষণ ভালো লাগবে ধানের মধ্যে ডুবে থাকো।

এর বহুবিস্তৃত সুফল বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান অভ্যাস করতে করতে, ধ্যান-যোগী নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে এর বহুবিধ উপকারিতা।

**।। মহামনন আত্মবিকাশ সঙ্গীত ।।**
~মহর্ষি মহামানস

জাগো ওঠো--- জাগো ওঠো, জাগো মোহ মুক্ত হও।
জাগো মন--- হও সচেতন, এখনো কেনো ঘুমাও।
জানো চেনো বোঝো নিজেরে, দ্রুত বিকশিত হও।।

জাগো ওঠো--- অন্তরামি, জাগ্রত সক্রিয় হও।
স্ব-বোধে স্থিত হয়ে, 'মহামনন' যুক্ত হও।।

বিকাশমান চেতনা পথে, সচেতন হয়ে এগিয়ে যাও।
আর যা-ই হওনা তুমি, সবার আগে মানুষ হও।।

জাগো ওঠো--- হে মহাপথিক, সর্বাঙ্গীণ সুস্থ হও।
মানবধর্মের পথ ধরে তুমি স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন হও।।

মহামনন ।। স্ব-অভিভাভন গীতি
~মহর্ষি মহামানস

আমি জাগ্রত- আমি সক্রিয়, আমি সচেতন মোহমুক্ত।
আমি নির্মল--- পবিত্র, আমি সুন্দর--- আমি সুস্থ।।

আমি কে তা' আমি জানি, আমি সত্যানুসন্ধানী।
আমি দীপ্ত--- বিকশিত, আমি সকল বাঁধন মুক্ত।।

আমি পূর্ণ-- আমি স্বাধীন, আমি স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন।
আমি নিজেরে হারায়ে খুঁজি, আমি জেনেছি সৃষ্টিতত্ব।।

(আমি) প্রশান্ত-- সন্তুষ্ট, নই কখনোই আমি রুষ্ট।
নেই অজ্ঞান-অন্ধত্ব, আমি প্রজ্ঞান-আলোক প্রাপ্ত।।

* এই গান দুটি খাতায় লিখে নিন। ধ্যান শিক্ষার ক্লাসে এই গানের মাধ্যমে ধ্যান শেখানো হবে।

এ' পর্যন্ত যাকিছু জেনেছো~ যাকিছু অনুশীলন করেছো, সবই ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য, পরিপক্ক হওয়ার জন্য করেছো। ফল পাকলেই যেমন টুপ করে খসে পড়ে, তেমনি পরিপক্ক হলে তুমিও টুপ করে ধ্যানের গভীরে ডুবে যেতে পারবে। প্রস্তুতি পর্বগুলিকে ধাপে ধাপে আরেকবার মনে করিয়ে দিই।

প্রথম পদক্ষেপ~
১৫ থেকে ৩০ দিন 'সুষুপ্তি যোগ' অভ্যাস করতে হবে। ধ্যান-যোগ-এ সফল হতে হলে যথেষ্ট রিল্যাক্সেবিলিটি বা শিথিল হওয়ার ক্ষমতা থাকা দরকার। ভালো রিল্যাক্সড় হতে পারলে তবেই প্রত্যাশা মতো উন্নতি লাভ হবে এবং সাফল্য পাওয়া যাবে। ক্লাসে 'সুষুপ্তি যোগ' শেখানো হবে এছাড়া ওয়েবসাইট থেকে সুষুপ্তি যোগ -এর উপর রচনা পড়তে হবে। এর পাশাপাশি প্রাণযোগ অভ্যাস করতে হবে প্রতিদিন। প্রাণযোগ ক্লাসে শেখানো হবে। এছাড়া, ওয়েবসাইটে প্রাণযোগের উপর রচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ~
১৫ দিন 'মন-আমি যোগ' অভ্যাস করতে হবে। ক্লাসে 'মন-আমি যোগ' শেখানো হবে। এছাড়া অডিও ফাইলের মাধ্যমে অথবা ভিডিওর মাধ্যমে অভ্যাস করা যাবে। এর পাশাপাশি প্রাণযোগ অভ্যাস করো।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, প্রচলিত যোগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগ প্রক্রিয়াগুলির কিছু পার্থক্য রয়েছে। আমাদের এই যোগ প্রক্রিয়াগুলি যুক্তিসঙ্গত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-মনোবিজ্ঞান সহ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, সময়োপযোগী এক বিশেষ যোগ প্রক্রিয়া। যা সর্বসাধারণের উপযোগী অত্যন্ত ফলপ্রদ যোগ পদ্ধতি।

তৃতীয় পদক্ষেপ~
সুষুপ্তি যোগ, মন-আমি যোগ এবং প্রাণযোগ অভ্যাস করার পর, এবার ধানের জন্য বসতে হবে। এরমধ্যেও কিছু প্রক্রিয়া আছে যা ধ্যান নয়, ধ্যানের প্রস্তুতি বিশেষ। প্রথমে হাত-পা, চোখ-মুখ, ঘাড়-গলা ধুয়ে নাও, অথবা স্নান করেও নিতে পারো। নির্দিষ্ট স্থানে~ যেখানে কোনো বাঁধাবিঘ্ন প্রতিকূলতা নেই, কোন দূষণ নেই, এমন একটি সুন্দর স্থানে~ ধ্যানের জন্য নির্দিষ্ট আরামদায়ক আসনে বসতে হবে তোমাকে। এই সময় কেউ যাতে তোমাকে বিরক্ত না করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে মশারী টাঙিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এসময় কোথাও যাওয়া বা কোন কাজের তাড়া থাকলে চলবে না। মোবাইল ফোন বন্ধ রাখতে হবে। এবার, মহামনন ধ্যান এর জন্য ধাপে ধাপে প্রস্তুত হও।

প্রথম পর্ব~
৫ থেকে ১০ মিনিট প্রাণযোগ।

দ্বিতীয় পর্ব~
সঙ্গীত সহযোগে ধ্যান। ক্লাসে শেখানো হয়েছে। সঙ্গীত শেষে, স্ব-বোধে স্থিত হয়ে বিশ্রামে থাকো ২--৩ মিনিট।

তৃতীয় পর্ব~
ক্রন্দন যোগ। চোখ বুজে বা তাকিয়ে, শিথিল হয়ে বসে প্রায় ৫ থেকে ১০ মিনিট কাঁদতে থাকো। পাওয়ার জন্য কাঁদো। না পাওয়ার বেদনায় কাঁদো। দুঃখ-কষ্ট লজ্জা-অপমান;যন্ত্রণা~ যা তুমি না চেয়েও পেয়েছো, তার জন্য কাঁদো। অজ্ঞানতা~ চেতনাহীনতা~ অন্ধত্বের কারণে এতদিন যাবৎ অন্ধকার পাঁকে ঘুরপাক খেয়ে মরছো তুমি, তার জন্য কাঁদো। আলোর জন্য~ চেতনার জন্য~ মুক্তির জন্য কাঁদো। আকুল হয়ে কাঁদো। তোমার ভিতরে যে এত কান্না জমে আছে~ তুমি নিজেই জানো না। কেঁদে কেঁদে অন্তরের সমস্ত কালীমা~ কলুষ~ গ্লানি ধুয়ে মুছে দাও।

মনে রেখো, ধ্যানের প্রস্তুতি হিসেবে যা কিছু করছো~ তা' প্রায় সবই, মনের মধ্যে নানা বিষয় অবদমন করা থেকে সৃষ্ট~ পাষাণ দেওয়াল এবং আবর্জনাকে বহির্মুক্ত করার জন্য, মনকে নির্মল পবিত্র এবং খালি করার জন্য করছো। ক্রন্দন শেষে চোখ না খুলে শিথিল হয়ে, স্ব-বোধে স্থিত হয়ে ২ মিনিট বিশ্রাম করো। এখন অন্তর চেতনা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে তোমার।

চতুর্থ পর্ব~
পূর্বের শিথিল অবস্থাতেই~ আরামদায়কভাবে, চোখ বুজে~ ভিতর ও বাহিরে সম্পূর্ণ মৌন হয়ে, স্ববোধ-এর চেতন -প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকো। প্রথম দিকে 'মন-আমি-যোগ' -এর মতো কিছুক্ষণ মনের খেলা চলতে পারে, আবার নাও পারে। কারণ মন~ এতক্ষণে অনেক নির্মল~ প্রশান্ত এবং গ্লানি মুক্ত হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। মন যা বলে, যা করে করুক, তুমি ভিতর ও বাহিরে একটা কথাও বলবে না। কোন কথা নয়~ ভাষা নয়। শুধু সজাগ~ সচেতন~ আত্মসচেতন হয়ে, আত্মবোধে স্থিত হয়ে, নিরাসক্ত~ নির্বিকার হয়ে, এক অব্যক্ত আনন্দ~ ভালোবাসা~ প্রেমে আপ্লুত হয়ে বসে থাকো।

কোন বিষয়েই আগ্রহী হবে না, শব্দ~ আলো~ শূন্য~ মূর্তি~ যা-ই আসুক তোমার মনের সামনে, একেবারে উৎসুক~ কৌতুহলী হবেনা। একাত্ম হয়ে পড়বে না কোন বিষয়ের সাথে।

ক্রমশ তোমার সমস্ত সত্তা স্বতস্ফূর্ত প্রেম~ ভালোবাসায় ভরে উঠবে। তুমি এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠবে। স্ব-কেন্দ্রে পৌছাবার প্রতিটি ধাপে~ নানা অনুভূতি আসতে পারে, তুমি কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না।

এক নির্মল মানস-সাগরে তুমি বিরাজ করছো। মনের খেলা অচিরেই বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে সতর্ক ও সজাগ থাকো, মন যেন কোনো ছুঁতোয়~ কোনো ছলনায় আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারে।

এখন, 'আমি' আছে, আমিত্ব আছে, কিন্তু এই 'আমি' সেই 'আমি' নয়। যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এক বা একাধিক নাম, ঠিকানা, নানা অলঙ্কার, নানা বিশেষণ। মনের অর্থাৎ শিশু মনের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই ওসব ঝরাপাতার মতো ঝরে পড়ে গেছে। না, কোন বিচার নয়, কোন সিদ্ধান্ত নয়। স্ববোধে অবস্থান করো।

এখন স্ববোধ আছে। কিন্তু স্বগৃহে~ স্বস্থানে~ আমির কেন্দ্রে পৌঁছাওনি এখনো। তোমার লক্ষ্য~ তোমার গন্তব্য ওটাই। তা' বলে চেতন কেন্দ্রমুখী হয়ো না। শিথিল~ রিল্যাক্সড় থাকো। কোন চাপ সৃষ্টি করো না। যেমন আছো~ তেমনি থাকো।

তোমার চেতন-সত্তা একটা বেলুনের মতো ফুলে ফেঁপে প্রসারিত হয়ে~ বহির্মুখী হয়ে আছে। বহির্জগতের রঙ-রূপ-রস প্রভৃতি উপভোগ করার জন্য~ সে নিজের কেন্দ্র থেকে বিস্তৃত হয়ে চতুর্দিকে উন্মুখ হয়ে ছড়িয়ে আছে। আছে চাপের মধ্যে। এবার সেই ফোলানো বেলুনটাকে যদি তার কেন্দ্রাভিমুখী চাপ দাও, তাহলে চাপ আরও বেড়ে যাবে। লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। এভাবে কোনোক্রমে অন্তরে গেলেও, সেখানে কিছু বা কাউকে পাবে না। সে বিক্ষিপ্ত থাকায়~ চাপগ্রস্ত এবং স্ফীত থাকায়, ওভাবে ঘরে ফেরা সম্ভব হবে না। অনেক সাধকের ক্ষেত্রেই এইরূপ ভ্রান্তি ঘটে। তাই যেমন আছো~ যেখানে আছো, চুপ করে নিঃশব্দে সজাগ হয়ে থাকো।

ক্রমশ আমির পরিবর্তন ঘটছে। দেখো, আস্তে আস্তে আমিত্বের বেলুনটা একটু একটু করে চুপসে যাচ্ছে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ঘরমুখী হচ্ছে~ স্ব-কেন্দ্রমুখী হচ্ছে সে এবার।

এই ঘরে ফেরার বিভিন্ন স্তরে বা বিভিন্ন স্টেজে, বিভিন্ন রঙ-রূপ-রসের দৃশ্যাবলীর সাক্ষাৎ হতে পারে। তাদের কোনটির প্রতি যদি আগ্রহী হয়েছো, তো~ ঘরে ফেরার আশা ওখানেই শেষ। তাই প্রলুব্ধ না হয়ে, অধৈর্য্য না হয়ে, ছলনায় না ভুলে, শুধু দেখতে দেখতে ঘরে ফিরে চলো। চলো নিজ নিকেতনে। রেলগাড়ির জানালা পথে দৃশ্যাবলী দেখার মত~ সবই দেখছো, ভালোও লাগছে, কিন্তু মুল টান আছে~ ঘর পানে। অন্য কোনো কিছুতেই তেমন টান অনুভব করছো না।

চলো~ চলো~। এভাবেই একটু একটু কোরে ডুবতে থাকো। আস্তে আস্তে আমির বেলুনটা একটু একটু কোরে চুপসে যাচ্ছে। তুমিও ডুবে যাচ্ছো আমির অভ্যন্তরে। বহুদিন হলো নিজের ঘর বা কেন্দ্র ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছো। তাই ফিরতে একটু সময় তো লাগবেই। ধৈর্য হারালে ঘরে ফেরা হবে না। একটু ধৈর্য ধরো।

এখানেই অনেক সাধক অসফল হয়ে ফিরে আসে। অথবা কোনো কিছুতে প্রলুব্ধ হয়ে~ অন্য স্টেশনে নেমে গিয়ে, অন্য কিছু দেখে বা নিয়ে ফিরে আসে। অনেকে এই অজানা পথে~ অজানা উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে গিয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। চিন্তা নেই। তোমার ভোগ যেহেতু এখনো শেষ হয়নি, যেহেতু তোমাকে এখনো অনেক পথ পার হতে হবে, তাই চেতন কেন্দ্রে লীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই তোমার।

তোমার মধ্যে এই 'প্রি-প্রোগ্রাম' করে রাখা আছে, "তুমি ঘরে ফিরে যাচ্ছো, সেখান থেকে আত্ম-সম্পদ নিয়ে ফিরে এসে~ আরো ভালো ভাবে জীবনকে উপভোগ করবে। আরও বেশি বিকাশ লাভ করবে।" "আরো দ্রুতগতিতে চেতনা বিকাশের পথে ধরে এগিয়ে যাবার জন্য, রসদ সংগ্রহ করতে যাচ্ছ সেখানে। চেতন মনের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে, তুমি ঘরে ফিরে যাচ্ছো।"

মনেরেখো, প্রথমে তোমাকে পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে হবে। তারপর তোমাকে দেবতা হতে হবে। তারপরে সর্বোচ্চ চেতনা~ ঈশ্বরত্ব লাভ করবে তুমি। এখন, তুমি অন্তরের জ্ঞান-গুণ-চেতনা, ঐশ্বর্য-ক্ষমতা-শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ফিরে আসলে। যেমন ফিরে এসেছে সুষুপ্তি যোগ-এর ক্ষেত্রে। এগিয়ে যাও।

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছো~ মনের কার্যকলাপ, কিংবা শূন্য বা জ্যোতি অথবা মূর্তি, অথবা আমিকে দেখতে পাচ্ছো, ততক্ষণ বুঝবে তোমার ঘরে ফেরা হয়নি। লক্ষ্যে পৌঁছাওনি।

'আমি' যতক্ষণ পর্যন্ত ফুলে-ফেঁপে থাকবে, ততক্ষণ 'আমি' এক অংশ থেকে আরেক অংশকে দেখলেও দেখতে পারে। আমির বেলুন যখন চুপসে~ শিথিল হয়ে~ সংকুচিত হয়ে, স্ব-কেন্দ্রে ফিরে আসবে, তখনই 'আমি' প্রকৃত 'আমিত্বে' স্থিত হবে। তখন আর নিজেকে নিজে দেখতে পাবে না। শুধু অনুভব~ আত্মানন্দ~ মহা আনন্দ অনুভব হবে তখন।

*প্রথম অবস্থায় 'মহামনন' ধ্যান অভ্যাস কালে, বেশি গভীরে না গিয়ে, ফিরে এসো ধীরে ধীরে একই পথ ধরে। প্রত্যেক সিটিং-এ একটু একটু করে গভীরতা বৃদ্ধি পাক। যাওয়া~ আসা~ সহজ সাবলীল~- আয়ত্বাধীন হয়ে উঠুক। এইভাবে অভ্যাস করতে করতে কিছু দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে তোমার লক্ষ্যে।

একমাত্র সঠিক মন-বিকাশমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি অর্জন করা সম্ভব!

## ভূমিকা

যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক মহর্ষি মহামানস কর্তৃক এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে ! মহর্ষি বলেন, একমাত্র সঠিক মনোবিকাশের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানববিকাশ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, এবং সেইসঙ্গে মহাধর্ম নামে মানববিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন।

মহর্ষি মহামানসের মানব মুক্তির বৈপ্লবিক মতবাদ~ 'মহাবাদ' এর মূল কথা হলো:
সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা~ অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির মূল কারণ হলো মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব, আর মানসিক অসুস্থতা। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, কুসংস্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-সন্ত্রাস, সবই তার থেকেই জন্ম নিয়েছে।

প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি একমাত্র তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি সর্বত্র একালের মহান মতবাদ~ 'মহাবাদ'-এর 'মহামনন' নামক মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। মনোবিকাশ মূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব বিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রিক সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধান হবে।

মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য প্রচলিত একাডেমিক (স্কুল-কলেজের) শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট নয়। তা' যদি হতো তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী মানবকেন্দ্রীক এতো সমস্যা-- এতো অশান্তি ও সঙ্কট সৃষ্টিই হতোনা। আজকের এই

কঠিন বিপর্যয়ের একমাত্র সমাধান করতে পারে মহর্ষি মহামানস প্রদর্শিত বিশুদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলন।

এই উদ্দেশ্যেই সদগুরু~ মহর্ষি মহামানস সত্যিকারের মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে 'মহামনন' নামে ধ্যান প্রশিক্ষণ সহ অপরিহার্য মনোবিকাশ মূলক শিক্ষা বা যথেষ্ট বিকশিত মানুষ তৈরির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন!

এর পাশাপাশি তিনি প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে 'মহাধর্ম' নামে মানবধর্ম ভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস মুক্ত, আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশ মূলক একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ধর্মের প্র্যাকটিস বা অনুশীলন পর্বই হলো 'মহামনন'।

মহর্ষি মহামানস প্রবর্তিত 'মহাধর্ম' ও 'মহামনন' আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম হলো প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক বিপ্লব!

মহর্ষি সত্যের সন্ধানে সারা দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা, এতো সমস্যার মূল কারণ হলো তাদের জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতা এবং শরীর ও মনের অসুস্থতা। এর থেকে মুক্তি দিতে পারলেই অধিকাংশ মানব কেন্দ্রীক সমস্যার সমাধান হবে। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে একটি চমৎকার মানববিকাশের শিক্ষা প্রণালী গড়ে তোলেন। তার নাম দেওয়া হয়--- মহামনন আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম।

এর পরেই তিনি হিমালয় থেকে নেমে এসে যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক এবং নিজস্ব মতবাদ-- 'মহাবাদ' ভিত্তিক মানববিকাশের শিক্ষা দান শুরু করে দেন।

মহর্ষি বলেন, প্রকৃত মানববিকাশ ও বিশ্বশান্তি তখনই অর্জিত হবে, যখন 'মহামনন' -এর সঠিক আত্মবিকাশের শিক্ষা সারা বিশ্বে অনুশীলন করা হবে। আর, সত্যিকারের মানববিকাশ ঘটলে, তবেই অধিকাংশ সমস্যা ও অশান্তি দূর করে মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতিশীল বা মানবদরদী হলেই হবেনা। সমস্ত কুপ্রভাব ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে, সজাগ-সচেতন হয়ে আত্মবিকাশের পথ ধরে জ্ঞান ও চেতনায় যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

প্রথমে তিনি এই কলকাতাতেই 'মহামনন' আত্মবিকাশ কেন্দ্র' নামে একটি বিশ্বমানের মনোবিকাশ সহ ধ্যান শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছেন। মানববিকাশের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে মহর্ষি সকল সচেতন মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।।

সেই সঙ্গে তিনি সরকারের কাছেও আবেদন রাখছেন, আগামী প্রজন্মকে এই ভয়ানক কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে, তাদেরকে সুস্থ, জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ, যথেষ্ট বিকশিত মানুষ করে তুলতে সরকার যেন প্রতিটি স্কুলে তাঁর এই মনোবিকাশ মূলক শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন।

একজন যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে, শুধু জ্ঞান থাকলেই হবেনা, সেইসঙ্গে বুদ্ধিমত্তা~ কল্পনাশক্তি~ উদ্ভাবনী ক্ষমতারও বিশেষ প্রয়োজন। এই কল্পনা কোনো অলীক কল্পনা নয়, বাস্তবসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনাময় সুদূরপ্রসারী কল্পনা, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি। সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই কমবেশি রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটাতে হবে।

নিয়মিতভাবে মনোবিকাশের শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে চেতনা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে আসে, সেইসঙ্গে এগুলিরও বিকাশ ঘটতে থাকে ক্রমশ।

এবার এই অসাধারণ ম্যান-মেকিং শিক্ষার পদ্ধতি, গঠন বা কাঠামো এবং পাঠক্রম সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবো।

প্রথমেই যেটা বলা প্রয়োজন তা হলো
একালের মহান মতবাদ 'মহাবাদ' অর্থাৎ 'মহাইজম' এর উপর ভিত্তি করেই 'মহামনন' নামে এই অতুলনীয় শিক্ষা পদ্ধতি ও তার পাঠক্রম তৈরি হয়েছে।

'মহাইজম'এর মূল কথা হলো, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মানুষের যথেষ্ট মনবিকাশ ঘটাতে পারলে একমাত্র তবেই প্রকৃত মানববিকাশ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। তাই সর্বসাধারণের মন-বিকাশ ঘটানোই হোক আমাদের প্রথম কর্তব্য।

মূলত মানব মনের বিকাশের উপায়, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মহাবাদ বা মহাইজম। তারসাথে প্রয়োজন অনুযায়ী রয়েছে মানব জীবনের ও মহাজাগতিক জীবনের বহু রহস্য উন্মোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

'মহাবাদ' বা 'মহাইজম' একটি বৃহদাকারের গ্রন্থ। এখানে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো।

'মহাইজম" এর অতি সারসংক্ষেপ নিয়ে অ্যামাজন থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি গ্রন্থ, নাম 'The absolute wisdom of the millennium'. এই গ্রন্থ থেকেও আমরা মহাইজম সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবো।

এছাড়াও আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম থেকেও 'মহাবাদ' বা 'মহাইজম' সম্পর্কে অনেক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবো।

'মহামনন' শিক্ষাক্রম মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। একটি হলো থিওরিটিক্যাল অংশ এবং অপরটি হলো প্র্যাকটিক্যাল অংশ।

মুক্তমনের আত্মবিকাশকামী সচেতন মানুষ এই মহান উদ্যোগের সাথে যুক্ত হতে চাইলে, তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ~সম্পাদক

If you are interested to know more, please do a Google search: Maharshi MahaManas / MahaManan / MahaDharma / मानवधर्म ही महाधर्म / মানবধর্মই মহাধর্ম

# মহামনন

মন-বিকাশমূলক শিক্ষাক্রম

প্রকৃত মানব বিকাশ এবং বিশ্ব শান্তি অর্জনে অপরিহার্য একটি চমৎকার এবং অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চলেছি আজ !

একটু সজাগ দৃষ্টিতে চারপাশে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, গোটা মানব জাতি এক ভয়ানক সংকট ও কঠিন অসুস্থতার মধ্য দিয়ে কোনক্রমে এগিয়ে চলেছে। আর যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে এই দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা, শোক সমস্যা এবং দারিদ্র্যের তীব্রতা।

সারা বিশ্বে মানুষের দ্বারা সংঘটিত অন্যায়, দুর্নীতি, নিপীড়ন, ধর্ষণ, প্রতারণা, সহিংসতা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ইত্যাদি অমানবিক কাজ আজ পর্যন্ত কেউ থামাতে পারেনি। ধর্ম, রাজতন্ত্র বা রাজনীতি, প্রশাসন বা কোনো শক্তিশালী ব্যবস্থা বা সংস্থা এখনো মানবজাতির এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি।

অধিকাংশ মানবসৃষ্ট সমস্যার মূল কারণ হল চেতনা ও জ্ঞানের অভাব। অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধ-ভক্তি, কুসংস্কার এবং মানসিক অসুস্থতা, সমস্তই এর থেকে উৎপন্ন হয়।

এর একমাত্র সমাধান হল, প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক পথে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার এবং মানসিক বিকাশ লাভের জন্য মৌলিক মানুষ গড়ার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

একই সঙ্গে যুক্তিবাদী ও মানসিকভাবে বিকশিত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উন্নয়নের মান অনুযায়ী বিশেষ সনদ বা সার্টিফিকেট দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটগুলো মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হলে, মন-বিকাশের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি মনকে জানতে ও বিকশিত করতে সক্ষম হয় এবং যুক্তিবাদী হতে শেখে এবং তা অনুশীলন করে, তবেই তারা ধীরে ধীরে অন্ধ-ভক্তি, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।

একই সাথে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ প্রবণ শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত ক'রে, আচরণগত ত্রুটির তদন্ত ক'রে যথাযথ শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। তবেই শুভ পরিবর্তন আসবে।

দেহ ও মনের সুস্থতা ছাড়া প্রকৃত মন-বিকাশ ও মানববিকাশ সম্ভব নয়। এর জন্য, এর পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল বিভাগ গঠন করতে হবে।

বিভিন্ন এলাকায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মন-উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ক'রে, সকলকে মন-বিকাশ শিক্ষা ও অনুশীলনের সুবিধা ব্যাখ্যা ক'রে, তাদের এই শিক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে 'মহামনন'

মন-বিকাশ পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। 'মহামনন' হল প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষা~ মন-বিকাশের শিক্ষার একটি চমৎকার - অতুলনীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। তবে সময়ের সাথে সাথে এই শিক্ষা পদ্ধতির আরও উন্নতি ঘটবে।

মানব উন্নয়নের এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

'মহামনন' হলো প্রকৃত মানব বিকাশ ও বিশ্ব শান্তির জন্য প্রকৃত মন বিকাশের এক অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃত শিক্ষাই একমাত্র সমাধান। 'মহামনন' হল সত্যিকারের শিক্ষা যা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত মানুষ হতে সরাসরি সাহায্য করে। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের ধীরে ধীরে যথেষ্ট সচেতন ও জ্ঞানী ক'রে তোলে। এছাড়াও এটি আমাদের বেশিরভাগ সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম ক'রে তোলে। তাই মানব উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা।
আমি আপনাকে মানব বিকাশ এবং বিশ্বশান্তির একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, যা বিশ্বব্যাপী সঠিক ও সার্বিক মন-বিকাশের জন্য অপরিহার্য একটি চমৎকার-অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

'মহামনন কেন্দ্র' হল একটি চমৎকার~ সত্যিকারের মন-বিকাশ (মনোবিকাশ শিক্ষাক্রম) এবং মানব বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্র। মানুষ গড়ার কর্মশালা। প্রথমে আমরা এই বাংলাতেই 'মহামনন কেন্দ্র' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের মন-বিকাশ ও ধ্যান শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাই।

আমরা মনে করি, প্রকৃত মানব বিকাশের মাধ্যমেই মানবজাতি তথা দেশের উন্নয়ন সম্ভব, আমরা এও মনে করি, প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক একাডেমিক (স্কুল-কলেজ ইত্যাদি) শিক্ষা মানুষের প্রকৃত বিকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। তার জন্য আমাদের এমন একটি অপ্রথাগত (অপ্রাতিষ্ঠানিক) মৌলিক মানব বিকাশমূলক শিক্ষা প্রয়োজন যা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করবে।

এটা প্রত্যেক সচেতন মানুষেরই জানা আছে, মানব সমাজের অধিকাংশ সমস্যা-অশান্তি ও অপরাধের কারণ হলো জ্ঞান ও চেতনার অভাব এবং মানসিক অসুস্থতা। এবং এটি স্ব-(মন) বিকাশ শিক্ষার অভাবের কারণেই ঘটছে। তাই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
ব্যক্তি এককের বা ইউনিটের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশ ও সমগ্র মানব জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর সেই লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে 'মহামনন' কার্যক্রম।

'মহামনন' মন-বিকাশের শিক্ষা হল বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূর করার বৈজ্ঞানিক উপায়। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও চেতনার অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারণ।

স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প সচেতনতা সম্পন্ন একজন দরিদ্র মানুষকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করলে হয়তো সে সাময়িকভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ নাও ঘটতে পারে।

বংশগতভাবে বা অন্যথায় প্রচুর সম্পদের অধিকারী একজন ধনী ব্যক্তির যদি যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাব থাকে, তবে শীঘ্রই সে তার সমস্ত সম্পদ হারাতে পারে এবং দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, যদি না সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে। তবে জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ এবং সেইমতো কাজ সম্পাদনের জন্যেও কিছু জ্ঞান

থাকা জরুরি। ক্রমাগত অর্থ এবং সম্পদ উপার্জন এবং তাদের রক্ষা করার জন্য একজনের যথেষ্ট জ্ঞান এবং চেতনা থাকা প্রয়োজন।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক মুক্তি পেলেই যে মানব উন্নয়ন হবে তা নয়।

অর্থনৈতিক উন্নতির (economic development) ফলে মানুষের জীবন সাময়িকভাবে আরামদায়ক হতে পারে, মানব সম্পদ ও মানব সভ্যতার আপাত উন্নতি ঘটতে পারে, প্রচলিত (ডিগ্রি লাভের) শিক্ষায় মানুষ উচ্চশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তাতে মানুষের মনের বিকাশ ঘটবে না। আর সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না হলে মানুষ একসময় তার সমস্ত সম্পদ হারাবে এবং আবার দারিদ্রে পতিত হবে। এমনকি সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়েও যেতে পারে।

মানুষের বিকাশ মানেই আমরা বুঝি মানুষের মনের বিকাশ। চেতনা বা সচেতন মনের বিকাশ।

যদি মানুষের মন যথেষ্ট বিকশিত না হয়, তাকে বাইরের থেকে যতই চটকদার দেখাকনা কেন, মানুষ সেই অন্ধকারেই থাকবে অতীতে যেখানে সে ছিল।

মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা হলো সবচাইতে বড় সমস্যা। অজ্ঞান জনিত অন্ধত্ব থেকে যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আসে, সেগুলোকে দূর করে আমরা যদি মানুষকে প্রকৃত মন-বিকাশমূলক মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি, যদি আমরা তাদের সঠিকভাবে মন-বিকাশের ব্যবহারিক পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দিতে পারি। তাহলেই মানুষের বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

মানুষের (মনের) বিকাশ না ঘটলে বাকি সব বাহ্যিক উন্নয়ন হবে বানরের গলায় মুক্তার মালার মতো। আর মানুষের বিকাশ ঘটলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হতে থাকবে স্বাভাবিকভাবেই।

এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্য থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে মানুষকে সচেতন ও সচেতন করার পাশাপাশি জীবনের অপরিহার্য মৌলিক শিক্ষার শিক্ষিত করে তোলে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবজাতির বহু সমস্যা ও সঙ্কটের মূল কারণ হলো আমাদের অন্ধবিশ্বাস।
আমাদের অধিকাংশ সমস্যা দুঃখ কষ্ট দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো অজ্ঞানতা জনিত অন্ধত্ব, কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাস। শুধু দারিদ্র্যমুক্ত নয়, মানবাধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন অধিকাংশ মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনা থাকবে।

প্রচলিত ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাসহ প্রচলিত কোনো ব্যবস্থাই মানুষের এই মূলগত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নয়।

এই প্রসঙ্গে, আমি বলতে চাই যে সাম্যবাদ (communism) এই সমস্যার সমাধান নয়। অনেকে বলেন, মানব সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এর সমাধান হবে। কিন্তু এটাই আসল সত্য নয়।

সাম্যবাদ তখনই সফল হতে পারে যখন সমগ্র মানব জাতির জ্ঞান ও চেতনা যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে প্রায় সমতা অর্জন করবে। আরোপিত সাম্যবাদ একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা মাত্র। সেক্ষেত্রে সুবিধাবাদী নেতৃত্ব শ্রেণীর লোকেরাই লাভবান হবে। সাম্যবাদের পথে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হবে না। কমিউনিজম হলো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

কোনো কৃত্রিম ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা কখনোই সফল হতে পারে না। মানুষের জন্য ভালো হতে পারে না।

তাই, অলীক কমিউনিজম নয়, এর জন্য প্রয়োজন 'মানবধর্ম' ভিত্তিক 'মহাধর্ম', এবং এটি আধুনিক সময়ের মহান মতবাদ: 'মহাবাদ'। যা মানুষকে যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হতে সাহায্য করে। একমাত্র উন্নত মানুষই পারে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এর ওপর কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা চাপানোর প্রয়োজন নেই।

মনুষ্য সৃষ্ট আজকের এই চরম সংকট থেকে পরিত্রাণের পেতে মনোবিকাশের ও মানব-বিকাশের ধর্ম ~ 'মহাধর্ম'-ই হলো একমাত্র উপায়। এই ধর্ম প্রচলিত ধর্মের মতো মিথ্যাশ্রয়ী ধর্ম নয়। এটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় মন-বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানব বিকাশের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। 'মহামনন' হলো এই ধর্মের অনুশীলন।

আমাদের স্লোগান~ **'মানবধর্মই মহাধর্ম'  'मानवधर्म ही महाधर्म'**

আমরা আমাদের জীবনকে আরও সুন্দরভাবে উপভোগ করতে চাই~ জীবনে সফল হতে চাই~ সুখী, সমৃদ্ধশালী-শান্তিময়, আনন্দময়, সুন্দর, সুস্থ জীবন পেতে চাই। আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। আমাদের পার্থিব বিকাশের সাথে সাথে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, জ্ঞানে, গুণে, আচরণে, প্রকৃত শিক্ষায়, সক্ষমতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

যদি আপনার চাওয়া একই হয়, আপনি যদি একটি সুখী-উন্নত, স্বাস্থ্যকর, সুন্দর জীবন উপভোগ করতে চান, তবে আপনি তা অর্জন করতে পারেন 'মহামনন' শিক্ষা সিলেবাসের এই মহান মন-বিকাশমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে। এমনকি আপনার প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি, 'মহামনন'  মন-বিকাশ শিক্ষাক্রমসহ  'মহামনন-যোগ' পদ্ধতি নিয়মিত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশের সাথে সাথে আপনার পরীক্ষার রেজাল্টও অনেক ভালো হবে।

যুগান্তকারী এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপ দিতে যদি বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন, তবেই মানবকেন্দ্রিক অধিকাংশ সমস্যা সহ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে প্রকৃত মানব বিকাশ সম্ভব হবে।

অগ্রবর্তী সচেতন মানুষের কাছে একটি সময়োপযোগী আবেদন:

একটি চিরাকাঙ্ক্ষিত দূষণ ও দুর্নীতি মুক্ত উন্নত পৃথিবী তৈরি করতে,  আমাদের এই মানবজীবনকে ধন্য করে তুলতে, নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলতে, আমাদের সমাজ থেকে অমানবিক কার্যকলাপ এবং দারিদ্র্য দূর করতে, আমাদের কাছে আজ  সত্যিকারের মানব উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য চমৎকার ও অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। নিজের এবং বৃহত্তর স্বার্থে একে সাদরে গ্রহণ করুন।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার স্রষ্টা হলেন~ মহর্ষি মহামানস ওরফে সুমেরু রে। আমরা বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি সত্যিকারের মানব উন্নয়নমূলক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

আমাদের সত্যিকারের মানব উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আমাদের সমমনা ব্যক্তিদের প্রয়োজন। আপনি যদি এই প্রোগ্রামে আগ্রহী হন, তাহলে এটি সম্ভব করতে আপনার সাহায্যের হাত প্রসারিত করুন এবং এই মহান উদ্যোগে অংশগ্রহণ করুন। 'মহামনন' শুধু এটি প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষা~। জনগণ একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

'যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হওয়ার আহ্বান' কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে আমাদের সামনে কোনো শিক্ষাকেন্দ্র, কোনো পথ বা পদ্ধতি নেই। এখন সেই পথ দেখিয়েছেন এ' যুগের একজন ভারতীয় মহান ঋষি~ মহর্ষি মহামানস।

মানব বিকাশের এই উৎকৃষ্ট শিক্ষা (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) এতই সুন্দর যে কোনো স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যদি তা পায়, সেই শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল অনেক ভালো হবে। সেই সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর আচরণেও অনেক উন্নতি ঘটবে।

'মহামনন' শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ কোর্স নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্ম বা মনের বিকাশ ঘটে। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, অনেক মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিক সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে তারা আত্মশুদ্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধি সহ প্রকৃত আত্ম-বিকাশের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। এছাড়া যারা অপরাধের দিকে ঝুঁকছে তারা এই শিক্ষাসহ 'মহামনন'-এর বিশেষ কোর্সের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারে এবং বিকশিত আত্মায় পরিণত হতে পারে। একটি শান্তিপূর্ণ-উন্নত সমাজ /দেশ গড়ে তোলার জন্য, 'মহামনন' হল সকলের জন্য চমৎকার অতুলনীয় ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

মহান ঋষি~ মহর্ষি মহামানসের প্রদর্শিত পথের মাধ্যমে আপনার জীবনকে উজ্জ্বল এবং আরও প্রস্ফুটিত করে তুলুন, আপনার জীবনে একটি অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক শুভ পরিবর্তন নিয়ে আসুন।

'মহামনন' ('মহা আত্ম-বিকাশ-যোগ') শিক্ষামূলক কর্মসূচি শুধুমাত্র আত্ম-বিকাশ বা মন-বিকাশের তাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞান, বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, আধুনিক মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান এবং মহামানসের উদ্ভাবিত আরও অনেক পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত, যুক্তিসঙ্গত আধ্যাত্মিকতা, 'মহামানস-যোগ' এবং
মহর্ষি মহামানসের নতুন উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, এবং বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষা এবং প্রয়োজনে তার ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়।

'মহামনন'~ 'মহা আত্ম-বিকাশ যোগ শিক্ষা হল একটি সহজ সরল এবং সহজবোধ্য কার্যকর পাঠ্যক্রম সামগ্রিক মন-বিকাশ বা আত্ম-বিকাশের সাথে মৌলিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহ বিশুদ্ধ (যুক্তিসঙ্গত) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা।

যথেষ্ট সুস্থতা ছাড়া প্রকৃত মন-বিকাশ সম্ভব নয়। সে জন্য 'মানসিক চিকিৎসা' 'মহামনন' শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যে দেহ ও মনের সংমিশ্রণ একজন নিজেকে মানুষ বলে গর্ব বোধ করে, সে যদি সেই দেহ ও মন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। সে হলো ঊনমানুষ বা অসম্পূর্ণ মানুষ। 'মহামনন'-এর মৌলিক শিক্ষা

একজনকে সর্বক্ষেত্রে একজন উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করে। যে শিক্ষা অনুসরণ ও অনুশীলন করে (ব্যবহারিক~ প্রয়োগ পদ্ধতি সহ) একজন ব্যক্তি সবদিক থেকে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারে, তা হল 'মহামনন'।

শিকাগো~ আমেরিকার একটি জার্নালে এর উপর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।
'The only way of human development and peace' International Journal of Teacher Education and Teaching (Chicago, USA)
Volume 1 Issue 2 July 2021, Page No. 19.
https://ijtetchicago.com/previous-issues/

হোয়াটস অ্যাপ: 9733999674

আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্কস্ : https://mahakama.wix.com/meditation

https://mahadharma.wix.com/book

ইউটিউব ভিডিও লিঙ্কস্ :

https://youtu.be/zie7eCyI4jk
https://youtu.be/vrh_MXW79AU
https://youtu.be/7izxE3cFxJ4
https://youtu.be/KSC10gwqJ7w
https://youtu.be/hCy2K5vaCE0
https://youtu.be/keZHFcBzlh4
https://youtu.be/keZHFcBzlh4
https://youtu.be/QxmRBEIMzyQ
https://youtu.be/kGKei5u1zXA
https://youtu.be/mmp2RJU3_Lg